পঞ্চপুত্তলী

পঙ্কপুত্তলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

প্রচ্ছদশিল্পী : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৩

মূল্য চার টাকা

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

উমার করকমলে

তারাশঙ্কর

টালা পার্ক

শ্রাবণ—১৩৬৩

(লাভপুর, বীরভূম)

প্রথম পর্ব

এক
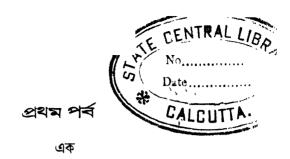
মলিনের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল মেয়ের কাছে। মলিনের মা পঙ্কজিনী। মেয়ে মনোরমা ; পঙ্কজিনীর যে গাঁয়ে বাস সেখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে সে থাকে। একখানি বাজার গ্রাম বা শহর—যাই বলা যাক, সেই শহরের এক প্রান্তে দেহ ব্যবসায়িনী পল্লীর মধ্যে থাকে সে। সেও তাদের একজন। মায়ের কান্না শুনে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। কি হল ?

মলিন কোথায় পালিয়ে গেছে। তের চৌদ্দ বছরের নিতান্ত মুখ চোরা ভীতু ছেলে। ভয় তার ভূত প্রেত সাপ খোপকে নয়, ভয় তার মানুষকে। কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারে না ; বাধ্য হয়ে বলতে হলে মাটির দিকে চোখ রেখে এমন মৃদুস্বরে কথা বলে যে, সে কথার স্বর শোনা গেলেও শব্দ শোনা যায় না। এই মানুষের রাজ্যে সে ছেলে কোথায় হারাল ?

পঙ্কজিনী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল, আমি বুঝেছি রে—আমি সেইদিনই বুঝেছিলাম—

চোখে মুখে তার অপরিসীম বিরক্তি ফুটে উঠল। এই সন্ধ্যার মুখ। সবে সন্ধ্যার আনন্দ-সন্ধানীরা পথে দেখা দিয়েছে। আসবে তারা দু দণ্ড আনন্দ করতে, কান্না শুনলে তারা আসবে কেন। বিরক্তিভরে সে বললে—সন্ধ্যেবেলা থেকে কাঁদিস নে বাপু। কান্না শুনলে লোকে কেউ ঢুকবে না। ভাববে মরেছে কেউ।

মা পঙ্কজিনী বললে—তাই সত্যি রে। তাই সত্যি! আমি জানি ; ওই লড়িয়ার জল তাকে টেনেছে। সেখানকার মূর্তি—

বাধা দিয়ে মনোরমা বললে—আরও কিছু। মলিন সাঁতার জানে, জলে ডুববে কেন? সে সেই কারিগরের বাড়ী গিয়েছে আমি বললাম, তুই দেখিস। কিন্তু কাঁদিসনে।

মনোরমা জানে, এই বয়সেই জেনেছে জীবন সহজে যায় না। যতক্ষণ শক্তি থাকে প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে জীবন সংগ্রাম করে। তারা দুই ভাই বোন ছেলে বয়সে অনেক সাঁতার কেটেছে পুকুরে। মলিন অবলীলাক্রমে দীঘি পার হত দু তিন বার। সে বেশ একটু শক্ত সুরেই কথাগুলি বলে গেল। পঙ্কজিনী চুপ করলে না, কিন্তু কণ্ঠস্বর মৃদু ক'রে গুণগুণ করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।—ওই লড়িয়াই তাকে টানলে রে! রাক্ষসী লড়িয়া রে! রাক্ষসী।

* * * *

প্রবাদ তাই বটে। লড়িয়া দীঘি বহুকালের অভিশপ্ত দীঘি। রাক্ষসী।

কতকালের শুকনো মজা দীঘি 'লড়িয়া'। বিস্তীর্ণ দীঘি ছিল এককালে। দূর অতীত কালে নাকি এক রাজার উদ্যানের সরোবর ছিল। এখানে তখন এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তখন এই সরোবরে মহিষীরা স্নান করতেন; ময়ূরপঙ্ক্তি নাওয়ে বিহার করতেন; দুধের মত শুভ্রবর্ণ-রাজহাঁসেরা ঝাঁকবন্দী হয়ে সাঁতার দিয়ে বেড়াত; চারিপাশে ফুটত অজস্র লাল পদ্ম। এই রাজা ধ্বংস হয়েছিলেন তুর্কীদের আক্রমণে। যুদ্ধের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সরোবরে মহিষীরা ঝাঁপ খেয়ে মরেন। এবং জল না কি তাতেই বিষাক্ত হয়ে যায়। এক ফকীর নবাবকে এই সরোবর ব্যবহার করতে নিষেধ

করেন। ফলে নবাবেরা এ দীঘির কোন যত্ন নেন নি। তারপর নবাবেরা ফকীর হন। রাজ্য জমিদারী হস্তান্তরী হয়। দীঘিটা পড়েই থাকে। ক্রমে ক্রমে মজে এসে সেটা একটা ঘাসের জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। মানুষের বুক পর্যন্ত উঁচু ঘাস, ঘন চাপ বেঁধে জন্মাত। এমন ঘন যে, বারোমাস স্থানীয় মুসলমান গৃহস্থদের পাঁচ সাতটা দু-হাত আড়াই হাত উঁচু ঘোড়া সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ওর ভিতরে ঢুকে ঘাস খেয়ে চ'রে বেড়াত তবু দেখা যেত না। ঠিক মাঝখানটায় দৈর্ঘে প্রস্থে বিশ হাত পনের হাত পরিমিত জায়গায় খানিকটা জল থাকত এবং সেখানে জন্মাত বড় বড় মাগুর আর কই। কত শত বৎসর পর সেই মজা দীঘি কাটিয়ে দেবীগ্রামের অমৃতবাবু অথৈ-জল সরোবরে পরিণত করবার সংকল্প করলেন। অনেক দিন থেকেই ওটা তাঁর কেনা ছিল, কিন্তু নানান প্রবাদ ও সংস্কারের জন্য কাটাতে সাহস করেন নি। সাহস হল স্বপ্ন দেখে। পর পর কয়েকদিনই স্বপ্ন দেখলেন মজা দীঘিটা সরোবরে পরিণত হয়ে কাল জলে টলমল করছে।

অমৃত বাবুর তখন চরম উন্নতির অবস্থা। এখানকার গৃহস্থ লোকের বার্ষিক আয় হাজার টাকা হ'লেই বড়লোক বলে গণ্য হয়। কালটা উনিশ শো তের চৌদ্দ সাল, প্রথম মহাযুদ্ধেরও অব্যবহিত পূর্বে, দেশে তখন ধানের মন দশ আনা বারো আনা, চাল টাকায় পনের ষোল সের, কাপড়ের জোড়া পাঁচসিকে দেড় টাকা। কলির অশ্বমেধ দুর্গাপূজা—সেও একশো দেড়শো টাকা খরচে হয়। টানাটানির পূজা নয়; রীতিমত বাদ্যভাণ্ড সহ ষোড়শোপচারে ভোগ দিয়ে, বিসর্জনের দিন বারুদের বাজী পুড়িয়ে পূজা করা যেত। লোকে তাই অমৃতবাবুর

আসল আয় অনুমান করতে না পেরে বলত—লক্ষপতি অমৃতবাবু। কিন্তু অমৃতবাবুর টাকা অনেক কয় লক্ষ এবং বার্ষিক আয়ই লক্ষ টাকার কাছাকাছি। অবস্থায় যখন উন্নতি থাকে মানুষের, লক্ষ্মীর কৃপায় তখন তার সাহসও বাড়ে। স্বপ্নে ভরসা পেয়ে অমৃতবাবু দীঘিটা কাটালেন। কাটতে গিয়ে উঠল এক পাথরের ভগ্ন দেবমূর্তি। দেবমূর্তি নয় দেবীমূর্তি। মুখের আধখানা ভাঙা, হাত ভাঙা, পা ভাঙা, শুধু আছে বুক থেকে কোমরের অংশটা। নিঃসন্দেহে লোকে অনুমান করলে যে, এই মূর্তিটাই সেই হিন্দু-রাজার উপাস্য দেবী। পৌত্তলিকতা-বিরোধী মুসলমানেরা সেটা ভেঙে এই দীঘিতে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মূর্তিটি কোন্ দেবীর এ নির্ণয় কেউ করতে পারলে না। অমৃতবাবু ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মূর্তিটি নিজের ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ভগ্ন দেবীমূর্তি—কোন্ দেবী তার নির্ণয় নাই—এটিকে নিয়ে কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। কেউ বললেন মিউজিয়ামে দিয়ে দিতে; কেউ বললেন গঙ্গায় বিসর্জন দিতে; কেউ বললেন—পাঁচটা দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ওটিকে ওই সব মন্দিরের বারান্দায় রেখে দিন। থাক একপাশে। কেউ বললেন—গ্রামের ষষ্ঠীতলায় পাঠিয়ে দিন। বাংলা দেশে গ্রামের ষষ্ঠীতলা ভাঙা মূর্তির আড়ং। কিন্তু অমৃতবাবুর মন কোনটাতেই সায় দিল না। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর ঠাকুরবাড়ীতে মহালক্ষ্মী পূজা হচ্ছে। সে মূর্তি উঠেছে ওই লড়িয়া দীঘি থেকে। সকালবেলা তিনি ঘোষণা করলেন—এটি মহালক্ষ্মীর মূর্তি, তিনি মহালক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করবেন। ভাস্কর এনে নতুন বিগ্রহ তৈরী করাবেন—তার পাশে এটিও থাকবে। কিন্তু স্বজন বন্ধু এমন কি

অমৃতবাবুর স্ত্রী পর্যন্ত বললেন—না। তা হয় না। হঠ ক'রে কিছু করতে নাই। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বললেন—মহালক্ষ্মী এক মতে হলেন রাধা। অন্য মতে—তিনি মহাকালী। তবে আপনি যে মূর্তি দেখছেন—সে হ'ল কমলে কামিনীর মূর্তি। পদ্মের উপর বসে আছেন—হাতীতে শুঁড়ে ঘড়া ধ'রে জল তুলে চান করাচ্ছে। তা আমরা বলি, প্রথম, চার বৎসরের সংকল্প ক'রে, মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরী করিয়ে পূজা করুন, তারপর যদি সহ্য হয়, তবে শ্বেতপাথরের মূর্তি গড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন!

তাই হ'ল। স্থির হল কোজাগরী পূর্ণিমায় হবে কমলে কামিনীর পূজা।

অমৃতবাবু কৃষ্ণনগর থেকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ কারিগরকে আনালেন। মূর্তি নির্মাণ করবেন তিনি। কাটোয়া থেকে গাড়ী ক'রে চার গাড়ী গঙ্গা-মৃত্তিকাও আনালেন। আয়োজনের আর বাকী রাখলেন না। ওদিকে 'লড়িয়া' দীঘি কাটানো হয়ে অথৈ জলে ভরে উঠল, নতুন নাম হল কালীদহ। কালীদহেই মা কমলে-কামিনীরূপে বাস করতেন। ওই দীঘি থেকেই ঘট আসবে, ওই দীঘিতেই মায়ের নিরঞ্জন হবে।

কৃষ্ণনগরের কারিগর, সাধারণ প্রতিমা-গড়িয়ে মিস্ত্রী শ্রেণীর লোক নন। বিখ্যাত লোক, রীতিমত ভদ্রমানুষ। অমৃতবাবু নিজে এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে ফরাসের উপর বসেন, তাঁকেও সেই ফরাসের উপর বসালেন। বললেন—শুদ্ধাচারে প্রতিমা গড়তে হবে। তার জন্যে আমি গরদ আনিয়ে রেখেছি। ধরুন।

তাঁর থাকবার স্থান ক'রে দিলেন নাটমন্দিরের সামনে যে একসারি পাকা ঘর আছে তারই একখানি ঘরে। কৃষ্ণনগরের

শিল্পীরও সব দেখে শুনে ভারী ভাল লাগল। অমৃতবাবুকে ভাল লাগল, তাঁর ভক্তি ভাল লাগল, দেবকীর্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। যেমন দেবমন্দির তেমনি নাট-অঙ্গন; চমৎকার। কৃষ্ণনগরের পুণ্যশ্লোক মহারাজাদের বিশাল কারুকার্যময় নাট-মন্দির তিনি দেখেছেন; আরও বড় বড় রাজা মহারাজার নাটমন্দির তাঁর দেখা আছে। সে সবের সঙ্গে তুলনা হয় না, করাও উচিৎ নয়। তবে অমৃতবাবুর দেবকীর্তির মত কীর্তি রাজা মহারাজা বাদ দিয়ে বড় বেশী নাই। আনন্দের সঙ্গে ভার নিলেন তিনি। ছুতোর ডাকিয়ে কাঠামো তৈরী ক'রে প্রথম মাটি শেষ ক'রে কৃষ্ণনগর গিয়ে আরও তুজন শিষ্য নিয়ে ফিরলেন তুমাটি করবার জন্য। শুধু তুমাটি নয়, একেবারে রঙ শেষ ক'রে তিনি ফিরবেন। সঙ্গে হরেক রকম সরঞ্জাম। কাঠের, বাখারীর নানান আকারের মাটির মূর্তি পালিশের যন্ত্র, কত রকমের কাঠের ছাঁচ, মুখের ছাঁচ, একটা বাক্সে শুধু রঙ তুলি এবং ছোট ছোট রঙ গুলবার পাত্র। কয়েকটা শিশিতে তার্পিণ, গঁদ, তুঁত, এবং আরও কত কি।

আরম্ভ করলেন তুমাটির কাজ; কবন্ধের মত অসম্পূর্ণ মূর্তি লেপনে-লেপনে, হাতে অঙ্গুলী সংযোজনে, মুখ বসানোয় সম্পূর্ণ হতে লাগল। শিষ্য তুজন মাটি লাগায়, তিনি তার উপর ওই সব যন্ত্রের কোনটি হাতে নিয়ে চালিয়ে যান মূর্তির উপর, বাঁকা টানে বাখারীর ছুরির মত যন্ত্রটি টেনে দেন, প্রতিমার অবয়ব নিটোল নিখুঁত রূপ ও সুষমায় ভরে উঠে, বলি রেখাগুলি পর্যন্ত পরের পর দেখা দেয়; সে নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি খানিকটা কাজ করেন—তারপর খানিকটা পিছু হটে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নানা

ভঙ্গিতে দেখেন—আবার এগিয়ে কাছে এসে হাতের ছুরি দিয়ে খুঁত সংশোধন করেন। মৃদু স্বরে গুণ গুণ করেন—

"চাঁদ নিঙাড়ি কেবা অমিয়া ছানিল রে—
তাহে মাজিল গোরামুখ।"

কখনও কবিকঙ্কন চণ্ডীর বর্ণনা আপন মনে আবৃত্তি করেন। এর মধ্যেই সে বর্ণনাও তিনি কণ্ঠস্থ করে নিয়েছেন।

বিকশিত পদ্মদলের উপর বসে আছেন মহালক্ষ্মী, দুই পাশে দুই শ্বেত হস্তী, তারা শুঁড় তুলে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরা দুই সোনার কলসীর জলে মাকে স্নান করাচ্ছে।

রাজহংস-রব জিনি চরণ নুপূর ধ্বনি
দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ দর্প হরে বেষ্টিত যাবক করে
অঙ্গুলি চম্পক-পরকাশে॥
অধর বিম্বক-বন্ধু বদন শরদ-ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর-ফোঁটা
তনু-রুচি ভুবন-মোহন॥
রামা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্বদেশ তার।

সকালে বিকেলে ছেলেদের ভীড় জমে, গ্রামের ছেলেরা চারিপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ করা দেখে। অপরিসীম বিস্ময় তাদের চোখে। কৌতূহলের আর শেষ নাই। লোভেরও অন্ত নাই। বাখারী ও কাঠের যন্ত্রপাতিগুলি অত্যন্ত সাবধানে রাখতে

হয়। কে যে কখন আত্মসাৎ করবে তার ঠিক নাই। ছেলেদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে অমৃতবাবু একজন কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে বলে দিয়েছেন। সকাল থেকে সে বসে থাকে আর হাঁকে—সরে এস সব, সরে এস। ওহে ছোকরা! ও ছেলে! যাও সব এখান থেকে।

কারিগর হাসেন। ঠাকুর ওদেরই, পূজো ওদেরই। প্রতিমাতে প্রথম মাটি দেবার দিন থেকে বিসর্জনের ক্ষণ পর্যন্ত ওরা তনুমন সমর্পণ করে বসে থাকে। বলেন—থাকো। থাকো। একেবারে যেতে হবে না, দূরে দাঁড়িয়ে দেখ।

ন-টা বাজতেই ওরা সব চলে যায়। ইস্কুল ইস্কুল। যে দু চারটি তখনও থাকে তাদের বেশীর ভাগ ছোট ছোট মেয়ে। ওরা বেশী অগ্রসর হয় না।

বারোটা বাজলেই কারিগর কাজ বন্ধ করেন। কর্মচারিটিও চলে যায়। ছেলেরাও কেউ থাকে না। কারিগর স্নান করেন; স্নান উপাসনা সেরে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করেন। ঠাকুরবাড়ীও ভোগের পর বন্ধ হয়। আবার কাজ আরম্ভ হয় চারটের সময়, চলে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। কারিগর নিয়মিত ওঠেন আড়াইটের সময়। উঠে মুখ হাত ধুয়ে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেন। হাতে থাকে খানিকটা শুক্‌নো মিহি কাপড়, তাই দিয়ে মধ্যে মধ্যে অঙ্গমার্জনা করে দেন প্রতিমার। এটি ওঁর সারা জীবনের অভ্যাস। শিষ্যরা তখনও ঘুমোয়। ঠাকুরবাড়ীও নিস্তব্ধ।

দু মাটির সময় দুপুরের এই সময়টিতেই প্রথম দিনেই তাঁর নজরে পড়ল মলিনের মায়ের মলিন; দেখলেন—জনহীন খাঁ খাঁ করা ঠাকুর-বাড়ীতে ওই প্রতিমার সামনে বসে আছে দশ এগার বছরের একটি

ছেলে, সুন্দর ছেলে। গৌরবর্ণ বললে ঠিক বলা হয় না, গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত ; নাক বাঁশীর মত ; চোখ দুটি ছোট, কিন্তু আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। কিন্তু কোথায় কি আছে—যার জন্য মন ভরে না। সর্বাঙ্গে যেন একটা শ্রীহীনতা। ঠিক মজা দীঘির পঙ্কতল থেকে পাওয়া ওই পাথরের দেবমূর্তিটির মত অনেক মার্জনা করার পরও মূর্তিটির সর্বাঙ্গে যেমন একটা পাঁকের আভাস ফুটে রয়েছে ঠিক যেন তেমনি। বেশভূষাও ঠিক তেমনি মলিন অপরিচ্ছন্ন।

কিন্তু ছেলেটি আশ্চর্য রকমের শান্ত ; অদ্ভুত স্তব্ধতা সর্ব অবয়বে, নড়ে না, চোখে পলক পড়ে না ; স্থির হয়ে বসে আছে। শুধু দেখছে।

কৃষ্ণনগরের কারিগর পাল মশায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বললেন—কি খোকা, ঠাকুর দেখতে এসেছ ? ছেলেটি কথা বললে না, সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে জানালে,—হ্যাঁ।

দেবী প্রতিমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রতিমা দেখতে দেখতে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—ইস্কুল যাও নি ? কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, দেখলেন, উত্তর সে দিচ্ছে। ঘাড় নেড়েই জানাচ্ছে—না।

—কি নাম তোমার ?

—মলিন। ছেলেটি অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিয়েছিল।

—মলিন ? চমৎকার মিল তো তোমার সঙ্গে ! মলিন কি ?

এবার সে বললে—মলীন্দ দাস !

ও। মণীন্দ্র। মণীন্দ্র থেকে মলীন্দ, তার থেকে মলিন। তা ভাল হয়েছে। চমৎকার মিলেছে ওর অবস্থার সঙ্গে। বিস্মিত

হলেন না কারিগর। কোন দরিদ্র এবং সাধনভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা বৈদ্যঘরের ছেলে। মণীন্দ্রকে বলে মলীন্দ। তা' থেকে হয়েছে মলিন ; তবে ওর মলিনতার আবরণের মধ্যে সত্যকারের মণিত্ব বোধ হয় নেই ; আসলে বোধ হয় কাচ ; বেলোয়ারী হলেও হতে পারে।

প্রথম শরতের রোদ তিনটেতেও ঝাঁ ঝাঁ করছে।

নাটমন্দিরের বড় বড় গোল থামগুলির মাথায় অসংখ্য পায়রার বাস ; তারা স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কোঁ-কোঁ শব্দ ক'রে মিলিত গুঞ্জনের সাড়া তুলেছে, কিন্তু বাইরের বায়ুমণ্ডলে এখনও পাখা মেলে বেরুচ্ছে না। অন্তরে বাহিরে মলিন ছেলেটি কিন্তু এই রৌদ্রেই এসেছে। বাড়ীতে কি আগলাবার কেউ নেই, না, পালিয়ে এসেছে! কিন্তু খুব দুরন্ত বলে তো মনে হয় না। মুখখানা দেখে—। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি। হ্যাঁ—অত্যন্ত শান্ত মুখ। স্থির দৃষ্টিতে মূর্তিটি দেখছে সেই দৃষ্টির মধ্যে একটা কি আছে! কৌতূহলী হয়ে তিনি আরও পরিচয় জানবার চেষ্টা করলেন। মানুষের স্বরূপ জানবার পক্ষে পরিচয় হল প্রতিমার পিছনের চাল চিত্র। প্রশ্ন করলেন।

—কে কে আছে তোমার?

—মা। দিদি।

—বাবা?

ঘাড় নাড়লে ছেলেটি—না।

—নেই? তাই। তা ইস্কুলে যাও না কেন?

মাটির উপর একটা কাঠি দিয়ে কতকগুলি দাগ টানতে টানতে,

বারকয়েক এদিকে ওদিকে অকারণে ঘাড় নেড়ে ছুলিয়ে বললে—ইস্কুলে পড়ি না আমি।

—কেন ?

এবার তার ঘাড় নাড়া ঘন হয়ে উঠল। হাসলেন পাল, পড়ার কথা বললেই ছেলেরা চঞ্চল হবে! ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে ছেলেটি বললে—পড়ি না—! বলেই সে উঠে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন উঠেও তাকে দেখতে পেলেন—সে দিন ছেলেটি সেই ছায়াছন্ন ঠাঁইটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটু হেসে তিনিও প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে মগ্ন হয়ে গেলেন। মনে তিনি ধ্যান মন্ত্র আবৃত্তি করছিলেন—"পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বাভরণভূষিতাং ॥"

তাঁর মগ্নতা ভঙ্গ হল ঠাকুরবাড়ীর পূজারী এবং পাচকদের হাঁকে ডাকে। এই সময়টাতেই ছুপুরের ঘুম সেরে তারা ওঠে। চারটের পর উঠে নিত্যই এমনই একটা হাঁক ডাক সুরু করে। ছিন্ন-সূত্র কথা, হাঁক, এদিক ওদিক সেদিক থেকে—সন্ধ্যার আকাশের তারার ফুটে ওঠার মত উঠতে থাকে।—গোপেশ! ঝি মাগী বাসনগুলো মেজে গিয়েছে, তোল!

তারপর খানিকটা স্তব্ধতা ; তারপর হুকা টানার শব্দ। তারপর গুণগুণানি গান। তারপরই অকস্মাৎ উদাস স্বরে কেউ ডেকে ওঠে—গোবিন্দ হে! জয় গোবিন্দ!

তারপরই হাঁক ওঠে—চায়ের জল হয়ে গেল ঠাকুর! সবাইকে ডাক। নইলে আমার নাম-দোষ নাই। হ্যাঁ।

—ওঠ হে! ওঠ হে! ওঠ হে!

এমনি ধারা হাঁক-ডাক অকস্মাৎ একসময় কলরবে পরিণত হয়।

নিত্যই এই ধারা। আজও সেই কলরব উঠল। কলরবে কারিগরের একাগ্রতা ভেঙে গেল ; প্রতিমা থেকে দৃষ্টি ফিরল তাঁর গামছায় মুখ মুছে, টুল খানার উপর বসে এক টিপ নস্য নিলেন। অকস্মাৎ মনে পড়ল ছেলেটির কথা। কই ? নাই তো !

কখন ঘুম ভেঙে উঠে সে চলে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর মনে কোন তরঙ্গের সৃষ্টি হ'ল না। আবার তিনি নিজের কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন।

তৃতীয় দিনে ছেলেটার বিচিত্র পরিচয় পেলেন কারিগর। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অসময়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল একটা গোলমালের শব্দে। ঠাকুরবাড়ীর ফটকের তাঁর ঘরটি, বন্ধ দরজাটির ঠিক ওপাশেই, কেউ—বোধহয় অমৃতবাবুর বাড়ীর কোন চাপরাশী দারোয়ান উচ্চ কণ্ঠে কাউকে তাড়না করছে—মারে থাপ্পড়, হারামজাদেকে দাঁত তোড় যায় ! চোরী করনে আয়া ? হিঁয়া চোরী ? বদমাস, চোট্টা,—। এরপর কতকগুলি গালাগালি ! চোর যে, তার মা-ভগ্নীর উল্লেখ ক'রে গালাগাল !

কয়েকটি সমবেত কণ্ঠর হাস্যধ্বনি উঠল এতে। ওই শুনেই তিনি উঠতে গিয়েও আর উঠলেন না। উঠলে যদি তাঁর উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না ক'রেই এই ধরণের অশ্রাব্য অশ্লীল উক্তি করে তবে যে সে লজ্জা হবে তাঁর। থাক। কিন্তু সেও হল না। উঠতেই হল তাঁকে। শুনতে পেলেন, ঠাকুরবাড়ীর পাচক হরিহর বলছে—কালাপাহাড়ের রক্ত আছে হে বেটার গায়ে। শেষকালে ঠাকুর চুরি ? আর কি চুরি করেছিস ? ডাক হে, কারিগর মশায়কে ডাক, তিনি সব মিল-জুল ক'রে দেখুন ! তাঁর যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা দেখুন।

সুতরাং উঠতে হল তাঁকে। গলার সাড়া দিয়ে তিনি উঠে

দরজা খুলে বাইরে এলেন। দেখলেন ঠাকুরবাড়ীর পাচক পূজক এবং একজন দারোয়ানের বেষ্টনীর মধ্যে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেটি। তার বাঁ কানটা লাল হয়ে উঠেছে, গালে চড়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। ছেলেটার রং সুগৌর, চড়ের চিহ্ন বড্ড বেশী লাল দেখাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য! ছেলেটা কাঁদছে না, শুধু অস্থিরের মত দুলছে আর ঘাড় নাড়ছে। তাঁকে দেখেই পাচক হরিহর বললে—এই যে কারিগর মশায় উঠেছেন। এই দেখুন, হারামজাদা ছেলের কাণ্ড দেখুন! এই সব চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল।

দারোয়ানের হাত থেকে ভাঙা মূর্তির একটা টুকরো নিয়ে সে তাঁর সামনে ধরলে। আর খানিকটা গঙ্গামাটি। ওই, পুষ্করিণীতে পাওয়া বহু টুকরো হয়ে ভাঙা মূর্তিটির একটা টুকরো। নেহাৎ ছোট নয়। এবং ওই টুকরোর মধ্যেই মাথা থেকে প্রায় পায়ের কাছ পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি মূর্তি রয়েছে। মূল মূর্তির মাথার দিকে শূন্যচারিণী মাল্যবাহিকা দিব্যাঙ্গনার মূর্তি। এগুলি একজায়গায় জড়ো ক'রে রাখা আছে। এতে প্রয়োজন নেই। মূল মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধও নেই, কিন্তু ফেলেও দেওয়া হয় নি। দারোয়ান বললে—ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণ দিকের পাঁচীলের ওপাশেই রাস্তার ধারের পুকুরটায় নেমেছিল সে মুখ হাত ধুতে। হঠাৎ ঠাকুরবাড়ীর ভিতর পাঁচীল পার হয়ে পথের উপর ধপ্ ক'রে কি যেন এসে পড়ল। শব্দ শুনেই সে ছুটে উঠে আসে। প্রথম পড়েছিল গঙ্গা মাটির ঢেলাটা। তারপর প্রায় তার সামনেই সশব্দে এসে পড়ল এই মূর্তিটা। সে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল—কে রে? কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতেই দুখানা হাত পাঁচীলের মাথা

ধরে বের হতে দেখে আর চীৎকার না করে হাতের মালিকের প্রতীক্ষায় পাঁচীলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটা পাঁচীল পার হয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়তেই খপ ক'রে গলা টিপে ধ'রে পাকড়াও করেছে।

কারিগর বিস্মিত খুব হলেন না। পুতুল ওদের লোভের বস্তুই বটে। মাটিও তাই। ওই দিয়ে অপটু হাতে কিছু গড়তে চেষ্টা করবে। আদিকাল থেকেই সব ছেলে এই করে আসছে; সৃষ্টি করে স্রষ্টা হওয়ার সাধ মানুষের যে চিরন্তন। একটু হাসলেন, তিনি বললেন—রেখে দাও ওটা যেখানে ছিল। বরং টুকরোগুলো সামনে থেকে সরিয়ে কোথাও ভাল করে রেখে দাও যদি রাখতে চাও। ওগুলো তো কোন কাজে লাগবে না। আর ওকে ছেড়ে দাও। ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! ফটক বন্ধ। বেটা পাঁচীল ডিঙিয়ে এসে পাঁচীল ডিঙিয়ে পালাচ্ছিল। বেটা ছেলেমানুষ! বলে উঠল অনন্ত পূজারী।

তাইতো! এ কথাটাতো একদিনও মনে ওঠেনি তাঁর। দুপুরে তো ফটক বন্ধই থাকে। তা হলে ও তো রোজই পাঁচীল ডিঙিয়েই এসেছে গিয়েছে! অনন্ত পূজারী বলেই গেল, ওর গুণ তো জানেন না! আগে আপনার প্রতিমা দেখুন। প্রতিমার গায়ে কোন কারিগরি করেছে কিনা সেটা দেখুন।

মানে? চমকে উঠলেন কারিগর যোগেশ পাল।

অনন্ত বললে, ও বেটার স্বভাব হল কাঠকয়লা নয় খড়ি না-হয় খোলাম কুচির ডগা দিয়ে যেখানে সেখানে আঁক জোঁক কাটা। বাঁধা ঘাটের রাণায়, দেওয়ালে, গাছের বাকলে, যেখানে হোক, জায়গা পেলেই হল। চূনকাম করা দেওয়াল পেলে তো

রক্ষে নাই। ছবি এঁকে দেবে। আজকাল আবার প্রতিমার গায়ে কারিগরি করতে আরম্ভ করেছে। এই গতবারে জগদ্ধাত্রী পূজোর আগে কারিগর প্রতিমে রঙ করে চলে গিয়েছে, রাত পোহালে পূজো, বেটা কখন এসে তার ওপরে চিত্তিবিচিত্তি ক'রে দিয়েছিল। জগদ্ধাত্রী প্রতিমের তুই পাশে তুই সখি থাকে চামর হাতে, তাদের কপালে কালি দিয়ে বেটা চুলের বাহার করে দিয়েছিল। আজকাল সব পাতা কেটে চুল বাঁধা হয়েছে না, তাই করে দিয়েছিল। বাবুদের ঝি দেখে চেঁচামেচি করে, বেটা হাতে নাতে ধরা পরে। তখন আবার কারিগর ডেকে, কালী চেঁচে রঙ তুলে, নতুন রঙ করে তবে রক্ষে। ওকে বিশ্বাস নাই।

সত্যই বিশ্বাস নাই। ছেলেদের স্বভাব তাই বটে। যোগেশ পাল দ্রুতপদে গিয়ে প্রতিমার আবরণটি খুলে ফেললেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলেন ; কোন কারিগরির চিহ্ন দেখতে না-পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, না। সে সব কিছু করেনি। দাও, ওকে এবারের মত ছেড়ে দাও। আর ও এসব করবে না। কি-হে, করবে ?

বিচিত্র ছেলে। কথা বলে না, সেই তেমনি ভাবে দোলে আর অর্থহীন ভাবে ঘাড় নাড়ে। এটি চাঞ্চল্যের লক্ষণ সে যোগেশ পাল বুঝলেন। কিন্তু দৃষ্টিটা স্থির কেন ? পলক পড়ে না কেন ? মাটির দিকেও চেয়ে নেই, সেইটেই আশ্চর্য ঠেকল তাঁর কাছে ! এতো সহজ ক্ষমতা নয় !

হরিহর বললে—কই কোন কথা ওকে বলান দেখি, দেখি! কিছুতেই 'রা' কাড়বে না।

হেসে পাল বললেন—দাও, ছেড়ে দাও। আমি বলছি ও আর করবে না। কিন্তু কাদের ছেলে ? রোজই দেখি ভর্তি তুপুরে

এসে বসে থাকে। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। এ দিকে তো দেখে মনে হয় খুব শান্ত

দুই

অনন্ত পরিচয় দিলে। কারিগর কাজ করছিলেন। অনন্ত ব'সে বলে যাচ্ছিল। তাঁর শিষ্যরা কেউ তখনও জাগে নি।

পঙ্কজিনীর ছেলে—নাম ওর মলিন। পঙ্কজিনীর রূপের মধ্যে উচ্চবর্ণের আভাস আছে, কিন্তু চরিত্রের বর্ণ কালি-মাখা। সূর্যের উত্তাপে প্রখর রৌদ্রে দেহের বর্ণ পুড়ে তামাটে হয়। প্রবৃত্তির আগুনে পুড়ে, স্বভাবের বিষের জ্বালায়, অন্তরের বর্ণ নীল হয়ে যায়। পঙ্কজিনী আসলে কি জাতের মেয়ে তা কেউ জানে না। পঙ্কজিনী নিজে বলে, অদেষ্ট বাবা, অদেষ্ট। জাত তো ভালই ছিলাম, কিন্তু সে সব ঘুচে মুছে গিয়েছে, এখন বোষ্টোম। বলতে বলতেই বলে—'বামুন বাবা, বামুন'। কণ্ঠস্বর মৃদু ক'রে বলে—'অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে পালিয়ে গেলাম একজনার সঙ্গে। নিয়ে বোষ্টোম হলাম।' মেয়েটা আশ্চর্য বোকা—অথবা-নিতান্তই লাজ লজ্জাহীনা। এখানে এসেছে আজ দশ এগার বছর আগে। সেবার দেশে হয়েছিল অজন্মা। অন্নকষ্টে হা-হা-কার উঠেছিল। অমৃত বাবু খুলেছিলেন অন্নসত্র। দেশ দেশান্তরের অভাবীর দল এসে জুটেছিল অন্নের প্রত্যাশায়। তাদের মধ্যেই ছিল পঙ্কজিনী। সঙ্গে ছিল হাত ধরে একটি মেয়ে একটি ছেলে আর কোলে আর একটি, বছর দেড়েক বছর দুয়ের ওই মলিন। মেয়েটার নাম মনো আর অন্য ছেলেটার নাম ফনে। মেয়েটা

বছর আষ্টেকের, ফনে পাঁচ ছ বছরের। দুটো-ই দেখতে পেঁচার মত। ছোট জাতের ছাপ তাদের সর্ব অবয়বে। কিন্তু কোলের ছেলেটা যেন পদ্মফুল। পঙ্কজিনীর চেহারা ভাল, শ্রী ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তার সঙ্গেও মলিনের চেহারার কোন মিল নেই। সে সময়ে পঙ্কজিনীর শ্রীর সঙ্গে যৌবন ছিল। বয়স আর কত হবে তখন? ত্রিশের নীচেই, ছাব্বিশ সাতাশ।

অনন্ত বললে—বুঝতে পারেন কারিগর মশায়, এ দুটো থাকলে দয়া মায়া একটুকু বেশী পায় সংসারে। ভাল মন্দ কিছু বিচার না-করেই বলছি, সংসারে শ্রীর একটা টান আছে। সেই টানে মন টানে। সেই টানে দয়া মায়া একটু বেশী পায়। আবার পুরুষের চেয়ে বেশী পায় মেয়ে-ছেলেতে। যুবতী মেয়ে, ছিরি আছে, কোলে কাঁখে দু তিনটে ছেলে মেয়ে। আহা, দাও ওকে আশ্রয়! অমৃতবাবুর গিন্নী-ঠাকরুণ, ওকে দেখে, বোষ্টোমের মেয়ে শুনে ঠাকুরবাড়ীতেই বাসনমাজার কাজ দিলেন। বললেন ওই কথা, আহা! এখন, থাকলেই পাঁচজনে পাঁচটা পরিচয় জিজ্ঞেসা করে! করেছিলও পাঁচ জন, আমিও করেছিলাম। তাতেই বলেছিল ওই জাতের কথা। বাড়ীর কথা বলতে বলতে বলেছিল—নেকনে যার বেধবা হবার যোগ থাকে, তার দু-বার বিয়ে করলে কি হবে? না-কি গো ঠাকুর মশায়? আমি বললাম—হ্যাঁ, তা বটে। পঙ্কজিনী বললে—এ-ই! দেখেন না, প্রথমে বিধবা হলাম ষোল বছরে। বুকের জ্বালা—পাগল করে দিলে; সেই জ্বালায় জাত বাছলাম না, কুল বাছলাম না, শ্বশুরবাড়ীর কৃষাণের সঙ্গে মজলাম। একদিন রাত্রে ছোট জাত লোকটার সঙ্গেই চলে এলাম। লোকটা সদল বদল

মানুষ, এই বুকের ছাতি, আমার কপালে টিকল না। বছর ছয়েক পরে ধড়ফড় ক'রে মরে গেল। মনে মনে হিসেব করে বললে, ওই ফনে ত্যাখন আমার কোলে—বছর দ্যাড়েকের, সবে হাঁটছে, আর মনো ত্যাখন বছর চারেকের মতন। একজনাকে কাঁধে একজনাকে কোলে করে গাঁজা খেয়ে মুনষে নাচছিল। উঠোনে ছিল কাঁচের টুকরো, সেই তাতেই বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্‌লটা কেটে গেল, তাও বেশী নয় 'এতুটুকুন', ছটাক-খানেকও হবে না রক্ত পড়ল। বললাম—দূব্বো ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে লাও; সে বললে—দেৎ। পঙ্কজিনী চোখ মুছে হেসে বললে—সবই নেকন। তা ছাড়া কি বলব বলুন! ঠাকুরমশায়, আর কি! সেই ছুতোসে আঙ্‌লটা রাত্তিরে টাটিয়ে উঠল, তার সঙ্গে জ্বর। বাস, সনজে বেলা হতে হতে আঙ্‌লটা এই চ্যাঙমাছের মাথার মত মোটা হয়ে ফুলল, হাটু পর্যন্ত থোল নিয়ে জ্বর বেড়ে অঙ্গের তাপ হল আগুনের মত। ধান দিলে যেন খই হয়ে যাবে এমনি। আর কি বলে একেবারে ধনুকের মত বেঁকে গেল। তাতেই মরে গেল। যেন মাথা কাছড়ে মরে গেল! চার বছরের মেয়ে দেড় বছরের ছেলে নিয়ে আতান্তরে ভাসলাম। মলিন হতভাগা তখন হয় নাই, পেটে। ওঃ সে যে কি আতান্তর কি বলব! তাও বছর তিনেক কেটেছে কোন রকমে। এবার আকাড়াতে চারিদিক অন্ধকার। পালিয়ে এলাম।

অনন্ত বললে—বছর দেড়েকের এই ছেলেটা ঘাটের মাথায় বসে ধুলোমাটী নিয়ে খেলা করত, তখন ভ্যাবা ছিল। কাঁদত না। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকত। কারিগর মশায়, আমি সব শুনে ওই ছোঁড়ার মতই ভ্যাবা হ'য়ে গেলাম। শুধালাম, এ ছেলেটার বয়স

তা' হ'লে কত ? চার বছর ? তা' পঙ্কজিনীর তাতেও হুঁস নাই। বললে—তাই হয় ঠাকুর মশায়। এই তো বছর ছাড়েক হল! বুঝুন ব্যাপার! শুধু আমাকে নয়, সবারই কাছেই এই গল্প করেছে। ধরাও পড়েছে! তাতেও লজ্জা পায় না। এ সেই ছেলে! বেটার বুদ্ধি স্থদ্ধি আছে। পড়লে পড়া হ'ত। কিন্তু পাঠশালায় নিলেও না ওই জন্যে, ও বেটাও হাঁটলে না ও-পথে। বলে—আর সব ছেলেরা যা-তা বলে। যা তা মানে বুঝছেন তো ? ওরই মায়ের দেওয়া ওই জন্ম সনের হিসেব। বাপের নাম! হাজার হলেও বুদ্ধি হয়েছে তো ? তারপর এই দশা। একা একা ঘুরে বেড়াবে, দিন নাই, দুপুর নাই, রাত নাই, ভয় নাই, ডর নাই, ত্রিভুবন জরীপ করে বেড়াচ্ছে। আর ওই বাতিক—যেখানে সেখানে আঁকাজোঁক কাটবে। চাকর খানসামার কাজ করবে না। আমাদের বাবুর গেষ্ট হাউসে সায়েব স্থবো আসে, সেখানে জাতটাতের তো বিচার নাই, একটুকুন ঝকমকে হলেই হ'ল। ছোঁড়াকে ডেকে লাগানো হয়েছিল, তা সেখান থেকে পালিয়ে গেল—এঁটো কে ঘুচোবে ?

হেসে অনন্ত বললে—ওর দাদা পাঁচ সাত বাড়ীতে জল তুলে দেয়, ওর মা চার পাঁচ বাড়ীর বাসন মাজে, বাঁটনা বাঁটে। দিদিটা ওর চলে গিয়েছে, এই রেল জংসনের শহরে একেবারে নাম লিখিয়ে বেশ্যা হয়েছে। মা দাদা এখানেই থাকে। ছেলেটা এখানে দু-দিন খায়, দু'দিন দিদির কাছে চলে যায়। আর এই কাজ।

হঠাৎ অনন্ত বলে উঠল—বুঝতে পারবেন না কত বড় বজ্জাত। এখুনি বলছিলাম আমি যে বেটার দেহে কালাপাহাড়ের রক্ত আছে। এ যদি মিছে হয় তো কি বলি আমি কারিগর মশায়।

বেটার যত রোখ ওই ঠাকুর দেবতার ওপর। বুঝেছেন, প্রতিমা বিসর্জনের সময় বেটা তক্কে-তক্কে থাকে। প্রতিমাটিও জলে নামাবে এ বেটাও জলে নামবে ; প্রতিমাও জলে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে বেটাও ডুববে ; ডুবে মুণ্ডু ভেঙে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে। ওর মায়ের বাড়ীতে আমি গিয়েছি কারিগর মশায়। পঙ্কজিনী লোক ভাল নয়। মানে এখানে এসেও স্বভাব ওর পাল্টায় নাই। বুঝেছেন !

মুখে পিচ্ কেটে অনন্ত আক্ষেপ ক'রে বললে—কি আর বলব ? সত্যকথা ! পঙ্কজিনীর স্বপক্ষে বলবার কথা কিছু নাই। দারিদ্র্যের তাড়নায় পেটের জ্বালায় যে মেয়ে ভিখারিণী হ'য়ে এল, সে মুষ্টিভিক্ষার বদলে মানুষের দয়ায় অন্নপাত্র পেলে। সহজ জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েও সুস্থ মনে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে না। পঙ্কজিনী প্রথম যখন গাঁয়ে এল ভিখিরী হয়ে তখন বয়সেই যৌবন ছিল কিন্তু দেহে ছিল না। না খেয়ে শীর্ণতার সীমা পার হয়ে সে একরকম শুকিয়ে গিয়েছিল ; শুধু মুখের মধ্যে একটা মিষ্টি ছাপ ছিল। ঠাকুর বাড়ীতে গিন্নীমা চাকরী দিলেন। বাসন-টাসন মাজবে, নাটমন্দির ঝাঁট দেবে ; মাইনে পাবে দু টাকা। কাপড় পাবে ; খেতে পাবে ; আর ছেলে তিনটে পাতের ভাত পাবে। এবং পাশেই বাবুদের একটা মাটীর বাড়ী আছে, সেখানে থাকবে। মাস দুয়েক যেতে-না-যেতে তার দেহে জোয়ার এল, যৌবন ফিরল ! অনন্ত বললে—শরীর সারল, তেলে জলে বাহার খুলল, চুলে চিরুণী দিয়ে কপালে ফোঁটা কেটে পঙ্কজিনী বাহারের উপর চেকনাই বাড়ালে। রকম সকম দেখে জবাব হয়ে গেল। পঙ্কজিনী তাতে ভয় পেলে না। গাঁয়ের বাজারের একটেরে ঘর ভাড়া

করলে। তিন-চার বাড়ীতে বাসন মাজা বাঁটনা বাঁটার কাজ নিলে। মনো মেয়েটার বয়স আট ন বছর, তাকেও এক বাড়ীতে বাচ্চা ছেলে কোলে ধরবার কাজ দিলে। সব জোগাড় হয়ে গেল। যারা পঙ্কজিনীর বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা যেত তারাই জোগাড় ক'রে দিলে। সে রীতকরণ পঙ্কজিনীর, লোকে বলে, এখনও আছে। মেয়েটা যুবতী হয়ে নাম-লেখানো বেশ্যা হয়েছে, চলে গিয়েছে বাড়ী থেকে, তার দায়ও পঙ্কজিনীর। সে-ই মেয়েকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে। বুঝছেন না, পঙ্কজিনীর বাড়ী গেলে দুর্নাম হয়। তা—তবুও আমি মাঝে সাজে—দিনের বেলা ওপথ দিয়ে যেতে হলে—আধদণ্ডও দাঁড়িয়ে যাই। উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা-টথা ব'লে চলে আসি। উঠোন থেকেই নজরে পড়ে—ঘরের ভেতর পেরেকে পেরেকে ওই সব মুখ সাজানো আছে।

কারিগর বললেন—বিচিত্র ছেলে তো! এ দিকে মুখ দেখে এমন শান্ত মনে হয়।

—হ্যাঁ। তা' শান্তও বটে। তা বটে। আবার বজ্জাতও বটে। বোধ করি সংশয় জাগে অনন্ত ঠাকুরের মনে। বিচিত্র চরিত্র মলিনের—দুই প্রান্তের দুই বিপরীত রীতচরিত্রের দুটি লাল নীল আলোর মত জ্বলে ওঠে তার মনশ্চক্ষুর সামনে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তা শান্ত না হয়ে করবে কি বলুন। কথা বলবে কোন মুখে? সে জ্ঞান তো হয়েছে বেটার! ওই লজ্জাতেই তো ইস্কুল গেল না। জাতের কথা বাপের কথা জিজ্ঞাসা করে যে সব। তা ভদ্দনোকের ছেলের পাঠশালাতে না নিক, এখানে নাইট ইস্কুল আছে, সেখানেও যায় না বেটা।

কারিগর মশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন—তিনিও হয়তো এর উত্তর খুঁজছিলেন। ছেলেটি শান্ত না মন্দ? উত্তর পেলেন না—তবু বললেন—

—তা হোক, ওকে আজ ছেড়ে দাও।

সেদিন তাকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

কয়েক দিন পর। সেদিন প্রতিমায় রঙ দিচ্ছিলেন কৃষ্ণনগরের কারিগর। হঠাৎ ছেলেদের গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

ছেলেরা চীৎকার করছিল, ওই। ওই! ওই যে! ওই উঁকি মারছে!

—কি?

—মলিন। হারামজাদা মলিন। ওই গাছে চ'ড়ে ব'সে-ব'সে দেখছে।

—ওই তো! ওই যে!

তাইতো! ঠাকুরবাড়ীর পাঁচীলের ওপাশে একটা সুদীর্ঘ-শীর্ষ অর্জুন গাছের উপরে ঘন পল্লবের মধ্যে ছেলেটা বসে রয়েছে। ধরা প'ড়ে স'রে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কারিগরের সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ ক'রে উঠল। যদি পড়ে যায়!

—মার ঢেলা। একটি ছেলে একটা গঙ্গামাটির টুক্‌রো কুড়িয়ে নিলে।

—না। তার হাত চেপে ধরলেন কারিগর। তারপর এগিয়ে গেলেন পাঁচীলের ধারে। ধীর উচ্চ কণ্ঠে বললেন—নাম। আস্তে নাম। আস্তে। নইলে পড়ে যাবে। আস্তে।

একটি ছেলে বললে, ও পড়বে না। খুব গাছে চড়তে পারে। কাঠবিড়ালীর মত খর খর ক'রে উঠে যায়।

তাই বটে। অবলীলাক্রমে নেমে পড়ল ছেলেটি। অনেকটা নেমে খানিকটা উঁচু থেকে ধপ ক'রে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে; কারিগর দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঠাকুরবাড়ী থেকে। ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কই? তিনি ওকে ডাকতে এসেছেন। কি অদম্য তৃষ্ণা! আহা-হা!

কিন্তু গৌরবর্ণ শীর্ণ-দেহ ছেলেটি তখন বিপরীত মুখে চলেছে।

ওই চলে যাচ্ছে, পথ ধরে নয়, অপথে, একটা পুকুরের পাড়ের কচু বনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল কচু বনের মধ্যে। মনের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করলেন তিনি।

ফিরে এসে অনন্তকে বললেন—ওকে একবার ডাকতে পারেন ঠাকুর মশাই?

অনন্ত ঘাড় নেড়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলে—না, আজ্ঞে না। ও বড় পাজী ছেলে। তারপর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—মিছে দুঃখ করছেন আপনি। ওর দুঃখ টুঃখ হয় না। ডাকবেন, আদর ক'রে দেখতে দেবেন কাছে বসে, ও কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু মন্দ করে পালাবে তাতে একচুল সন্দেহ নাই। আমি ডেকে তখন বাবুদের কাছে দায়ী হব। আপনাকে বলছি আমি, এখানকার কোন কারিগর ওকে ঠাঁই দেয় না। বেটা ওই যন্তর নিয়ে পালায়। রঙ তুলি চুরি করে। সব চেয়ে মুস্কিল বেটার কারিগরি বিদ্যে। বেটা আবার নিজে পুতুল তৈরী করে কি না!

—পুতুল তৈরী করে?

—হ্যাঁ। ওই আল্লাদী পুতুল, এটা ওটা তা বেশ তৈরী করে।

—কই সে কথা তো বলেন নি সেদিন ?

হেসে অনন্ত বললে, তার আর কি বলব ? তৈরী করে, ছোটজাতের ছেলেদের দেয়। বাজে পুতুল। এই টিপটিপ গড়ন।

ঠিক এই সময়েই তাঁর শিষ্য এসে ডাকলে। রঙ তৈরী ; চক্ষুদান করতে হবে। চোখ আঁকতে হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরলেন কারিগর এবং ভিতরে গিয়ে তুলি ধ'রে প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তেই আর সব কিছু ভুলে গেলেন তিনি।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে বেড়িয়ে ফিরবার পথে অনন্ত সঙ্গে ছিল, সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে—ওই দেখুন, ওই যে পুকুর পাড়ে, কোণটার উপর ঘরখানা। ওইখানা।

—কি ? কি ওখানা ?

—সেই মলিনের মায়ের ঘর।

—মলিন ? সেই ছেলেটি ? চলুন যাব। আছে ছেলেটি ?

—তার ঠিক নেই। সে যে কোথায় কখন থাকে—সে ভগবানও বলতে পারে না।

মলিন কিন্তু ছিল। ভগবানের ইচ্ছেতে বোধ হয় নয়, নিজের ইচ্ছেতেই ব'সে ব'সে আহ্লাদী পুতুলই তৈরী করছিল। সারি সারি সামনে সাজিয়ে রেখে, গড়ে যাচ্ছিল। কারিগর সকৌতুক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। এ যে বিচিত্র ছেলে। জাত কারিগর। তারপর একটি পুতুল হাতে তুলে নিয়ে দেখে বললেন—তুমি পুতুল তো বেশ তৈরী কর! কই তা তো বলনি ?

মলিন অবাক হয়ে গেল। কৃষ্ণনগরের কারিগর মশায় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! বলছেন, তুমি তো বেশ পুতুল তৈরী কর! সে কাজ বন্ধ করে সেই অভ্যাসমত ঘাড় দোলাতে লাগল।

—তাই তো। খোঁপাটি তো বেশ করেছ! নাক মুখও বেশ হয়েছে। কিন্তু—। বুকটা যে বড্ড ভারী করেছ!

মলিনের হাতে তার নিজের তৈরী একটি পাতলা বাখারীর ছুরি ছিল, সেটি হাতে নিয়ে তিনি খানিকটা চেঁচে ঠিক ক'রে দিয়ে বললেন—এইবার দেখ তো!

ওপাশে ব'সে ছিল মলিনের দাদা ফণী। একটি স্থূল বুদ্ধি স্থূল চেহারার ছেলে। আশ্চর্য! কোন মিল নেই মলিনের সঙ্গে! সে হাঁ করে শুনছিল কথাগুলি। পঙ্কজিনী বাড়ীতে ছিল না। সে গিয়েছিল শহরে—যেখানে মেয়ে মনোরমা থাকে। এবার ফণী এসে পাশে দাঁড়িয়ে বড় বড় দাঁত বের ক'রে বললে—দিন রাত দিন রাত ঐ করছে। কাজ না কাম না!

—করুক। করুক। আর কি করেছ? দেখি! এটা কি? হাতী-ঘোড়া-গরু! এটা কি? বাঘ; এটা সিংহ! হাত তো অপটু নয়!

—ওটা ওর চিড়িয়াখানা!

—চিড়িয়াখানা! তাই তো! একটা ছোট্ট চৌকো জায়গায়—কাঠি দিয়ে ছোট ছোট ঘেরা করে সাজিয়ে রেখেছে মাটির জীবজন্তু।

—সব চেয়ে ভাল করেছে এই দেখুন।

ফনে বের ক'রে নিয়ে এল একটা মাটির ব্রাকেট! আবক্ষ একটি নারীমূর্তি মাথায় ক'রে ধরে রেখেছে মাটির আধার।

রঙ পর্যন্ত দিয়েছে। অবাক হলেন কারিগর। ছেলের হাতে গড়া মেয়েটি কটাক্ষময়ী। কটাক্ষের ভাবটুকু চোখে সে বেশ ফুটিয়েছে। একটি স্তন অর্ধাবৃত, স্তনবৃন্তের চারিপাশে রক্তিম কৃষ্ণাভা এবং কালো বৃন্তবিন্দুটি স্পষ্ট ক'রতে ভুল করে নি! সেই বিন্দুটির বর্ণ সন্নিবেশ দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—

—কি দেখে করলে?

—কালোর ঘেরের মধ্যে রঙটা মানান হবে ব'লে দিয়েছি। ব'লেই থেমে গেল মলিন। এই তার প্রথম কথা।

ফনে বললে—দিদি একটা কিনেছে, তাই দেখেছে।

হঠাৎ কারিগর বললেন—তুমি যাবে আমার সঙ্গে? কৃষ্ণনগর? তোমাকে শেখাব আমি।

মলিন উত্তর দিলে না, সে উঠে ঘরের ভিতরে চলে গিয়ে বেরিয়ে এল দুটি ছোট মুখ নিয়ে। বিস্মিত হলেন কারিগর। একটি কৃষ্ণ-নগরের তাঁরই ওখানকার তৈরী পুতুলের মুণ্ড, আর একটি মলিনের হাতের তৈরী। রঙ খারাপ, জিনিষটা ছাঁচের নয়, ছেলেমানুষের হাতের তৈরী—তবু সাদৃশ্য এনেছে। বেশ সাদৃশ্য এনেছে!

—আপনার জানালার পাশে পেয়েছিলাম এটা কুড়িয়ে।

কারিগর যখন এখানে আসেন তখন কিছু পুতুল এনেছিলেন অমৃতবাবুকে দেবার জন্য। এটা ভেঙে গিয়েছিল তাই ফেলে দিয়েছিলেন। ছেলেটি কুড়িয়ে এনে নকল করেছে।

—তুমি যাও তো আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—যাব আমি।

—কাল সকালে তুমি যেয়ো, কেউ কিছু বলবে না, আমি বলে দোব।

—না। ওখানে—।

—কেউ কিচ্ছু বলবে না। আমি বাবুদের বলে দেব।

—না। ওখানে আমি যাই না।

—যাও না? কারিগর যোগেশ পাল না হেসে পারলেন না।

সঙ্গে সঙ্গেই মলিন বলে উঠল—সে তিন দিন গিয়েছিলাম দুপ'র বেলায়, সবাই ঘুমোত তখন, পাঁচীল পার হয়ে গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা বলব ব'লে গিয়েছিলাম। আর খানিক গঙ্গা মাটি—

—আর ভাঙাঠাকুর। অনন্তঠাকুর হেসে কুট কাটলে।

—সে প'ড়ে ছিল। আর ওটা তো ঠাকুর নয়, পরী, তাই নিয়েছিলাম। ওখানে আমি যাব না।

হঠাৎ ছেলেটা রূঢ় হয়ে উঠল। ওর চরিত্রে এটা অপ্রত্যাশিত, হয় তো অশোভন, তাই বেশী কটু মনে হল। ওর ছোট চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল, বললে—ওরা আমাকে যা-তা বলে। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে! বলতে বলতে যেন ক্ষেপে গেল সেই শান্ত নিরীহ ছেলেটি। একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে সেটাকে মাটির উপর ছুঁড়ে মেরে আ-আ শব্দে একটা অবরুদ্ধ জান্তব চীৎকার করে উঠল। যারা তাকে বিঁধিয়ে কথা বলে—তাদের আঘাত করতে না পেরেই যে ওর সেই বিক্ষোভ তা কিন্তু প্রকাশ হ'তে বাকী রইল না।

অনন্ত ঠাকুর মুহূর্তে লাফ মেরে ওদের বাড়ী থেকে রাস্তায় পড়ল।—আরে বাপরে! দিনে দিনে বেটার বিষ দাঁত গজাচ্ছে। আরে বাপরে!

শিল্পী যোগেশ পাল তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—না-না-না। ওখানে যেতে হবে না তোমায়। আর আমি বারণ ক'রে দোব, ওরা তোমাকে বাইরেও কিছু বলবে না।

ছেলেটা বিচিত্র। তাঁর কথা যেন সে শুনতেই পায় নি। একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। কি ভাবছে, তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল—না, ওখানে আমি যাব না। আপনার সঙ্গে কেষ্টনগর নিয়ে চলুন আমাকে।

- আচ্ছা। তাই হবে। যোগেশ পাল হেসে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন কথা দুটি।

—কে গো? কে বটেন? রামজয় বাবু নাকি? কবে এলেন? তবে যে বলে এবার পূজায় বাবু মশায় আসবেন না! আমি তো ভেবে মরি। বলি, আমার কি হবে? যার ভাগ্যে যা জুটুক ছেঁড়া-খোঁড়া, আমার মলিন-চাঁদের জামা না-হলে কি করে চলবে? আমি অভাগিনী কোথায় কি পাব? ওর চোখের জল আমার সয় না মশায়। ও যে পঙ্কজিনীর পরাণ-পুতুল।

পঙ্কজিনীর কণ্ঠস্বর। মনোর ওখান থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে বাড়ীর সামনে এসে যোগেশ পালকে পিছন দিক থেকে রামজয়বাবু ভ্রম করে সরস আনন্দে কথা কটি বলতে বলতে সে বাড়ী ঢুকল।

যোগেশ পাল বুঝতে পারেন নি প্রথমটা। ভেবেছিলেন নিতান্তই পথের কথার ধ্বনি, পথের কোন মানুষ পথের কোন প্রিয়জনকে বলছে। কিন্তু মলিনের এবং পঙ্কজিনীর নাম দুটি শুনে বুঝলেন কথার লক্ষ্য তিনি যিনি এই বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। চঞ্চল এবং বিব্রত হলেন তিনি। ওদিকে ঠাকুর

পালিয়েছে। কি বিপদ! পঙ্কজিনীর বাক্‌ভঙ্গি তাঁর কাছে আনন্দজনক নয়, ভীতিপ্রদ অস্বস্তিকর।

সেই মুহূর্তেই পঙ্কজিনী এসে সামনে দাঁড়াল। সে দাঁড়ানোর ভঙ্গির একটি বিশেষ রূপ ছিল। একটু বেঁকে ঘাড়টি হেলিয়ে সে দাঁড়াল, মুখে একটু হাসি, চোখে প্রসন্ন সরস দৃষ্টি; আত্মীয়ভাব চেয়েও একটু গাঢ় অন্তরঙ্গতার একটি হিল্লোল সে যেন ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তেই অপরিচিত মানুষ দেখে, মাথার ঘোমটা টেনে সহজ এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখের সে দৃষ্টি মুখের সে হাসি সবই চকিতে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল সঙ্কুচিত কুণ্ঠার ভঙ্গি! তারপরই বললে, আমি চিনতে পারি নি বাবু। কিন্তু আপনি কে বটেন?

তেমনি সঙ্কুচিত অধীরতায় ঘাড় তুলিয়ে মলিন এক পা এগিয়ে এসে বললে—উনি কারিগর মশায়। কেষ্টনগর থেকে লক্ষ্মীপ্রতিমা গড়তে এসেছেন।

মুহূর্তে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পঙ্কজিনীর। কাঁখের পুঁটলিটি ছেলের হাতে দিয়ে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে বললে—আসুন, আসুন! আসুন! তা বসতেও দিস নি তোরা? কই, মোড়াটা কই। ও ফণি!

—না। বসব না আমি। আমি গিয়েছিলাম তোমাদের গ্রাম-দেবতাকে প্রণাম করতে। পথে ঠাকুর বললে, এই মলিনের বাড়ী। মলিন পুতুল গড়ে। তাই দেখতে এসেছিলাম।

—পুতুল না ছাই বাবা, মাটির ডেলা সব। মাটিতে কাদাতে আর হাতে দিন রাত বসে আছে। কাজ না কম্ম না, ওই বাতিক।

বলতে কিছু পারি না, আমার কোলের ছেলে। ওকে গর্ভে নিয়েই বিধবা হয়েছিলাম।

আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু পাল বাধা দিয়ে বললেন—না-না। ছেলের হাত তোমার ভাল। শেখালে আরও ভাল হবে। ও থেকেই ও করে খেতে পারবে।

—তা যে শিখবে না বাবু। কোন কারিগরের কাছে যাবে না। কারিগর কেন প্রভু, কোন মানুষজনের সঙ্গেই ওর কারবার নাই। বাঁয়ে বাঁয়ে ফিরবে, এখান সেখান; লোক দেখলে পালাবে। বড় মুখচোরা। তার ওপর দুখিনীর সন্তান, দশ জনে শতেক কথা বলে। তা' আমি বলি বলুক। বলতে দে। আমাকে বলে না? সারাজীবন বলছে। খানিক সত্য, খানিক মিথ্যে। তা বলুক।

যোগেশ পালের বিস্ময়েরও সীমা ছিল না, বিব্রতবোধের অস্বস্তিরও অন্ত ছিল না। বুঝতে পারছিলেন না এ মেয়ে কি মেয়ে! ঠাকুর বলেছিল—খানিকটা বোকা! তাই কি? অথবা—?

মলিন এবার মায়ের কথায় বাধা দিয়ে বললে—আমি কারিগর মশায়ের সঙ্গে যাব।

চমকে উঠল পঙ্কজিনী—কার সঙ্গে?

—কারিগর মশায়ের সঙ্গে কেষ্টনগর। উনি বলেছেন।

—উনি বলেছেন? কলের পুতুলের মতই কথা কটি উচ্চারণ করলে পঙ্কজিনী।

যোগেশ পাল বললেন—তোমার ছেলের যা আগ্রহ দেখছি তাতে ওর হবে। বেচারী দুপুরবেলা পাঁচীল ডিঙিয়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। চাপরাশিরা ধ'রে অপমান করেছিল, তাতেও ওর মন মানে নি, অর্জুন গাছে চড়ে দেখেছে। লোকে ঢেলা মেরেছে—

—কারা ? কারা ? কোন অলপ্পেয়েরা ? কই আমাকে তো বলিস নাই মলিন ?

এক মুহূর্তে পঙ্কজিনী যেন সাপিনীর রূপ ধ'রে সামনে দাঁড়িয়েছে। সাপিনী নয়, বাঘিনী, সাপিনীর সন্তান-স্নেহ নেই, বাঘিনীর মত হিংস্র হয়ে উঠেছে পঙ্কজিনী।

পাল বললেন—থাক সে সব কথা। ওকে আমি নিয়ে যাব। মানুষ ক'রে দেব।

—না। চীৎকার ক'রে উঠল পঙ্কজিনী।—না-না, ওসব বুদ্ধি দেবেন না আপনি। না। দুখিনীর ধন আমার—! না। এগিয়ে এল সে পালের দিকে। পাল পিছিয়ে গেলেন দু পা। বললেন—

—বেশ! বেশ! নিয়ে যাব না আমি। আচ্ছা! বলেই চলে এলেন তিনি। আর দাঁড়াতে চাইলেন না। আসতে আসতেই পিছনে শুনলেন কঠিন কিন্তু মৃদু কণ্ঠের কথা— না। আমি যাব।

তারপরই শুনলেন—ছাড়। ছাড়। ছাড়।

বারেকের জন্য পিছন ফিরে দেখলেন—মলিনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে পঙ্কজিনী।

তিন

পঙ্কজিনীর অনেক দুঃখের ধন। অনেক লাঞ্ছনা তার ওই মলিনের জন্যে। ওকে ছাড়তে সে পারবে না।

মলিনকেই বলছিল পঙ্কজিনী।

—যম চাইতে এলে তোমাকে আমি দোব না। আমি পেটে ধরেছি, অনেক কলঙ্ক সয়েছি; আমি থাকতে তোমার

উপর যমের অধিকার নাই! জোর ক'রে নিয়ে গেলে পিছু পিছু যাব আমি। খবরদার, ও মতলব তুমি করো না। আমি বারণ ক'রে দিলাম। আমি বারণ ক'রে দিলাম। আমি তা হ'লে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

—কেন মিছে বকছিস মা। ও-ও গিয়েছে, তুইও মরেছিস। ফনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই মাঝখানে কথা না-বলে সে আর থাকতে পারলে না।

মলিন চুপ করে বসে আছে। ঘরের চালের দিকে চেয়ে রয়েছে; আশ্চর্য ছেলে, মানুষের মুখের দিকে চায় না।

পঙ্কজিনী সে-কালে-নতুন-আমদানী একটা নকল ডিট্‌জ্‌ মার্কা লণ্ঠনের আলো জ্বেলে বসল পান সাজতে। একরাশি পান সাজবে, সে সারাদিনে অনেক পান খায়। পানগুলি সে মনোর ওখান থেকে এনেছে। একটা পান গুটিয়ে খিলি মুড়ে মুখে গুঁজে চিবুতে চিবুতে বললে —কথা বলিস না যে?

ফনের কথা সে গ্রাহ্যই করে না। ওটা আবার মানুষ! প্রশ্ন তার মলিনকে।

মলিন বললে —কি বলব?

—বলবি, যাবি না।

উত্তর দিলে না মলিন।

পঙ্কজিনী বললে -আগে আমি মরি, তারপর যেখানে খুসী যাস।

মলিন একবার ফিরে তাকালে মায়ের দিকে। তার ভুরু দুটি আশ্চর্য ভঙ্গিতে কুঁচকে উঠেছে এবং মোটা ভুরু দুটির নিচে ছোট চোখ দুটির দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছে।

—এমন ক'রে তাকাচ্ছিস যে? ইচ্ছে হচ্ছে, এখুনি মেরে ফেলে দি আপদকে?

দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেকে সে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। বিচিত্র সে টেনে নেওয়ার ভঙ্গি এবং তেমনি আবেগ সে আকর্ষণে। তারপর হেসে বললে—তা হলেও রেহাই পাবে ভাবছ? ভূত হয়ে ঘুরব তোমার পিছু পিছু। হ্যাঁ। তার কণ্ঠস্বরে একবিন্দু পরিহাস ছিল না; দৃঢ়প্রত্যয়ে রণরণ করছিল। ভূত হতে পারাটা পঙ্কজিনীর কাছে আদৌ কোন সমস্যার কথা নয়। আত্মহত্যা করলেই ভূত হ'তে পারবে সে।

—ছাড়়। ভূতকে আমি ভয় করি না।

—তা জানি। তোর মত নচ্ছার বদমাস আমি আর দেখি নাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাব না। আমাকে ছেড়ে দাও।

—ঠিক তো? আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর!

—করছি। যাব না, যাব না, যাব না।

মুহূর্তে আহ্লাদে গদগদ হয়ে গেল পঙ্কজিনী। ছেলের মুখে বার-বার চুম খেতে লাগল—সোনারে, মনিরে, সাতরাজার ধন মানিক রে! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আসবার সময় মনোরমা মিষ্টি দিয়েছে গোটা চারেক। বলেছে, ফনে একটা, তুই একটা, মলিনের দুটো। কিন্তু পথে আসবার সময় সে নিজেই দুটো খেয়ে ফেলেছে, দুটো এনেছে—একটা ফনে একটা মলিন খাবে। কথাটা এই গণ্ডগোলে তার মনে ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মলিনকে ছেড়ে উঠে গামছার খুঁট খুলে শালপাতার ঠোঙায় মোড়া মিষ্টি দুটি বের করে মলিনের হাতে দিয়ে বললে,—নে, খা।

—কি?

—মিষ্টি। মনো দিয়েছে। ফনেকে আধখানা দে।

—আমি আধখানা? ফনে আপত্তি জানালে।

—বুড়ো মদ্দ, ভাইকে হিংসে দেখ। নে, যা দিচ্ছে তাই খা।

মলিন আধখানার চেয়েও কম অংশ দিলে ফনেকে এবং চোখ বুঁজে নির্বিকার হয়ে চিবুতে লাগল।

পঙ্কজিনী বললে—মনো তোকে যেতে বলেছে। পূজোর জামা কিনে দেবে। গায়ে দিইয়ে একেবারে ফিটফাট দেখে কিনবে। বলে, তা নইলে যে ঢুলিদারের মত লাগবে। আর পদ্ম আঁকতে হবে দোরের পাশে। এবার আবার ওদের বাড়ীতে চূণকাম হয়ে গেল। সব ধব ধব করছে। পদ্ম, ফুল, লতা নইলে শোভা হবে কেন? অনেক মেয়ে তোকে দিয়ে আঁকাবে বলছে। মনো বলেছে পয়সা লাগবে। রাজী হয়েছে সব। কালই যাস।

—তাই যাব।

পরের দিন তাই গেল সে। দেবীগ্রাম থেকে মনোর ছোট শহরটি ক্রোশ তিনেক দূর। রেলে ভাড়া তিন আনা। মলিন কিন্তু হেঁটেই যায়। অভ্যাসমত মন্থরগতিতে আপন মনে দুলতে দুলতে চলে। চলতে চলতে বসে, কোন গাছের তলায় বা কোন সাঁকোর মাথায়। গাছের বাকলে ছুরি দিয়ে কেটে ছবি আঁকে। সাঁকোর মাথায় পলেস্তারার ফাটলগুলি খোলাম কুচির দাগ টেনে জুড়ে জুড়ে অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার রেখাঙ্কনে পরিণত করে। আবার চলে। এক বেলার পথ চলতে গোটা দিনটাই তার কেটে যায়। কিন্তু তাতে তার ক্লান্তিও নাই বিরক্তিও নাই কখনও। সন্ধ্যায় মনোর বাড়ী পৌঁছে দেখে মনো তখন সাজগোছ করছে। চুপ করে মলিন

বাইরের বারান্দায় এক পাশে বসে পড়ে। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ ডাকে—আছ না কি ? মনো সুন্দরী !

হাসি পায় মলিনের। মনো—আবার সুন্দরী !

কেউ ডাকে—মনুয়া !

এই সব বিচিত্র সম্বোধন এবং কণ্ঠস্বরের গদগদ ভাব শুনে কখনও হাসি পায় মলিনের, কখনও বা রাগ হয়। হঠাৎ এক একসময় ইচ্ছে হয় নখ দাঁত বের ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই লোকটার উপর।

সেদিন মনোর বাড়ীতে যেতেই মনো বললে—এসেছিস !

ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে মলিন বললে—মা যে বললে, পদ্ম আঁকতে হবে।

—হ্যাঁ। আরও মেয়েরা আঁকাবে। এবার যদি পয়সা না নিয়ে আঁকবি তো দেখাব তোকে। চার পয়সা একটি ফুল। লতাপাতা দিতে হলে দু আনা !

—সে তুমি বলো।

—বলব। কিন্তু ওরা ডাকবে মিষ্টিমুখ ক'রে—দাওনা ভাই মলিন, আমার দোরে এঁকে—আর তুই চলে যাবি—তা হবে না।

মলিন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। তারপর বললে—খেতে দাও দুটো। ভাত আছে ও বেলার ?

—সকালে বেরিয়েছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কি করিস তুই রাস্তায় ? গাছতলায় শুয়ে ঘুমোস, না ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁটিস ? মনোর অবাক লাগে মলিনের এই ধরণটায়। বিরক্তও হয়। কণ্ঠস্বরে সে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

মলিনের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশ্বসংসারের কারও কোন বিরক্তিতে বা নিন্দায় ওর কিছু যায় আসে না। ওসবগুলি সহ্য করবার উপযোগী একটা কঠিন আবরণ তৈরী করে নিয়েছে সে এই অল্প কয়টা বছরের মধ্যে। নিরাসক্ত ভাবেই সে বললে—এই দেখতে দেখতে আসি। ভাল লাগলে বসি। বসে বসে দেখি আবার হাঁটি।

মনো অবশ্য তার উত্তর শুনবার জন্য অপেক্ষাই করে নি; সন্ধ্যার মুখে এই সময়টার প্রতিটি মুহূর্ত তার মূল্যবান; মন তার এ সময়ে অহরহ বাহির দরজায় কারুর ডাক অথবা পদশব্দের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। সে ঘরে ঢুকেছিল মলিনের জন্য ভাত বাড়তে, ভাত বেড়ে থালাটা ওর সামনে নামিয়ে দিলে—নে খা। মাঠের মাছ রান্না করেছি খুব ঝাল দিয়ে। দেখ খেয়ে।

খেতে খেতে মলিন বললে—কমলেকামিনী পূজো দেখতে যাবে না?

—কমলেকামিনী না লক্ষ্মী?

—ওই একই। যে কমলেকামিনী সেই লক্ষ্মী। আমি শুনেছি।

—মা গো! এত জানিস তুই? মনো সত্যই কথা কটি অহংকার ক'রে বললে। মলিনের সম্পর্কে এই অহংকার তার অকপট। কিন্তু মনোর অহংকারে মলিনের আনন্দ হয় না। সে ওসব কথা বাদ দিয়ে সোজা কথা এবং মোটা কথা শুরু করলে।

—খুব ধূম হবে শুনেছি! কলকাতা থেকে যাত্রা আসবে, খুব ভাল পিতিমে হয়েছে; এমন কখনও দেখ নাই।

—খুব ভাল? দেখেছিস?

—হুঁ। কারিগর মশায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের বাড়ী এসেছিল আমার পুতুল দেখতে!

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। বললে—ভাল হাত। আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে সঙ্গে। বললে—শেখাবে।

—যাবি তুই ?

—যাব। তাতেই এসেছি তোমার কাছে। গোটা পাঁচেক টাকা তুমি দাও। বিদেশে যাব।

—মায়ের কাছে নে। মায়ের টাকা আছে।

—দেবে না। সোজা বলেছে তোমার যাওয়া হবে না।

—তবে ?

—আমি পালাব।

—পালাবি ?

—হুঁ। কি হবে বাড়ীতে থেকে ? কি সুন্দর যে গড়ে কারিগর! শেখাবে বলেছে। যাব না ? যেতে না দিলে পালিয়ে যাব।

—বেশ। এখানে পদ্ম এঁকে কত পাস দেখ। তার বাদে পাঁচ টাকা পুরিয়ে দেব আমি।

এই সময়টিতেই বাইরে থেকে সেই ডাক এল,—মনো আছ ? মনোরমা ?

—যাই!

মুহূর্তে মনোরমা উঠে চলে গেল। এইটুকুতেই যেন অনেক দূরে চলে গেল। এত দূর চলে গেল যে ডাকলেও আর শুনতে পাবে না। তা যাক, কিন্তু জল দিয়ে গেল না। জল আবার ঘরের ভেতর। ভাতের গ্রাস বুকে আটকাচ্ছে। হাত গুটিয়ে উঠে পড়ল মলিন। থালাখানা নিয়ে খানিকটা দূরের পুকুরে গিয়ে নামল। সেখানেই আঁজলা ভ'রে জল খেয়ে থালাখানা ধুয়ে এনে

বারান্দার একপাশে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল। কোন স্বপ্ন পর্যন্ত দেখলে না।

দিদি মনোরমার ঘরে এবং তার প্রতিবেশীদের ঘরে পদ্ম এঁকে নতুন জামা এবং পাঁচ টাকার একখানা নোট কাছায় বেঁধে মলিন বাড়ী ফিরল তিন দিন পর। এসে, ঘরে পা দিয়েই শুনলে, কাল সকালের ট্রেণেই কারিগর চলে যাবেন। ফনে বললে। সে শুনে এসেছে।

মলিন ভুরু কুঁচকে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে কি? তিনি যে বলেছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ফনের দিকে চেয়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—কারিকর মশায়···আর আসে নাই?

—না।

—কোন খবর পাঠায় নাই?

—না।

চুপ ক'রে রইল মলিন। ভুলতে লাগল ঘন ঘন।

ফণী বললে—নিয়ে যাবে না তোকে, আর কি!

—ঠাকুর এসেছিল? মা বলেছে বুঝি? নিয়ে যেতে বারণ করেছে?

—না। কাল থেকে মা দখিন পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে পুজোর কাজে লেগেছে। মুড়ি ভাজছে। পাট কাম করছে। সেইখেনেই সে দিন-রাত। সে বলবে কখন?

আর কোন কথা বললে না মলিন। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা গড়িয়ে হাতে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখতে মাখতে বেরিয়ে চলে গেল। অকারণে অনেক রাত্রি পর্যন্ত অমৃতবাবুর ঠাকুর বাড়ীর চারি পাশে ঘুরলে, একবার অর্জুন

গাছটায় উঠল, দেখলে প্রতিমা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অপরূপ প্রতিমা! চালচিত্রের মাথায় মালা নিয়ে তিনটি—দুপাশে দুটি, মাঝখানে একটি মালা ধারিণী পরী! আহা-হা! অবাক বিস্ময়ে সে গাছের ডালে বসে রইল। পোকা মাকড়ের কামড় সহ্য করেই বসে রইল। বর্ষায় অসংখ্য পোকা মাকড় জন্মেছে। শীত পর্যন্ত থাকবে। গাছে তাদের বাসা। কেউ বা কিছু গাছে উঠলেই ওরা দলবেঁধে এসে ছেঁকে ধরে। ধরুক। মলিন ওসব সইতে পারে। ওই জন্যেই সে কেরোসিন মেখে এসেছে। ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত রাত বসে থাকে। ওই যে কারিগর মশায়। কারিগর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একখানা চাদর এনে ঢাকা দিয়ে দিলেন প্রতিমার উপর। তখন নেমে এল মলিন। বাড়ী ফিরে নীরবেই শুয়ে পড়ল।

ফনে বললে—দেখা হল?

উত্তর দিলে না মলিন।

—খাবি না?

—খাব। দে।

—ওঃ! দে! বাবু মশায় আমার! ওই বেড়ে রেখেছি, নিয়ে খা।

নিঃশব্দেই উঠে খেয়ে শুয়ে পড়ল মলিন। উঠল ভোরবেলা। গিয়ে হাজির হল স্টেশনে।

কারিগর এলেন অনেক পরে। আসতেই মলিন গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল। নীরবে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল। কারিগর তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—এসেছ?

মৃদুস্বরে মলিন বললে—হ্যাঁ।

—শেখ। ভাল ক'রে শেখ। এখানে তো কারিগর আছে সব। তাদেরই কারুর কাছে এখন শেখ।

—আপনি বলেছিলেন, নিয়ে যাবেন। আমি যাব।

যোগেশ পাল তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর দৃষ্টি তুলে চুপ ক'রে রইলেন। ভাবছিলেন তিনি। অনেক কথা লোকে তাঁকে এই ছেলেটি সম্বন্ধে বলেছে। তিনি ভাবছেন। তাঁর শিষ্যরাও শুনেছে। এরপর—।

—আমার ভাড়া আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সকরুণ একটু হেসে যোগেশ পাল বললেন—তার জন্য নয়। অন্য কথা। এখন তো বাড়ী যাচ্ছি না আমি। আরও কয়েক জায়গাতেই যাব আমি। প্রতিমা আছে। সামনে পূজো। পূজো শেষ হোক। লক্ষ্মী পূজোর সময় তো আমি আসব আবার। সেই সময়। সেই সময় তোমায় নিয়ে যাব।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল মলিন। নড়ল না। বুকের ভিতর একটা প্রচণ্ড বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছে, তাকে অধীর ক'রে তুলেছে ; নিতান্ত শিশুর মত চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে. না—যাব. না—না—আমি যাব। আমি যাব।

কিন্তু যাওয়া হ'ল না। ট্রেনে চেপে চলে গেলেন কারিগর। মলিন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তেমনি দুলতে দুলতে ফিরে এল।

তারপর পূজো চলে গেল! অমৃতবাবুর বাড়ীতে মহাসমারোহে লক্ষ্মী পূজা হয়ে গেল। লক্ষ্মী পূজার বিসর্জনের দিন প্রতিমার ঠিক

পাশে পাশেই ছিল সে। লক্ষ্য ছিল, সেই চালচিত্রের মাথায় মধ্যবর্তিনী অপরূপ ছোট্ট পরীটির দিকে। প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপও সে দিয়েছিল। বাবুদের চাপরাসীরা দেখেছে। চাপরাসীরা লাঠী চালিয়েছিল। জলের উপর কি মাথার উপর তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু মলিন আর বাড়ী ফেরে নি। তাকে কেউ দেখেও নি। মৃতদেহও ভেসে ওঠে নি। তা না উঠুক। পঙ্কজিনী বুঝেছে—সে ওই লটিয়া—এখনকার কালীদহ, ওই রাক্ষসী দীঘির তলায় সে মুখ গুঁজে পুঁতে গিয়েছে। কমলেকামিনীর হাতী শুঁড়ে ধ'রে তাকে পুঁতে দিয়েছে। অথবা সেই তুর্কী আমলের ঝাঁপ খেয়ে ডুবে-মরা রাজকন্যে রাজরাণীর প্রেতাত্মারা তাকে ধরে রেখেছে।

মনো বললে—কাঁদিস নে বাপু। মলিন সাঁতার জানে, জলে ডোবে নি। সে সেই কারিগরের বাড়ী গিয়েছে।

কান্না মনোর ভাল লাগে না। এ সময় তার ঘরে আসবে আনন্দ-সন্ধানীরা। কান্না শুনলে আসবে কেন? পঙ্কজিনীও চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পর সে উঠল। বেরিয়ে এসে দেবীগ্রামের পথ ধরলে। ক্রোশ তিনেক পথ অন্ধকারের মধ্যে মৃদুস্বরে একটানা বিলাপ করতে করতে ফিরে এল। মলিনরে। মলিন! বাপরে! সোনা রে!

পরদিন সকালে এসে দাঁড়াল কালীদহের বাঁধা-ঘাটে। বর্ষার জলে কালীদহ থৈ থৈ করছে। নতুন কাটানো দীঘি, গোটা দীঘিটায় কোথাও কোন জলজ উদ্ভিদ জন্মায় নি এখনও। জল এখনও কালো হয় নি; মাটির রঙের সংমিশ্রণে ঘোলাটে হয়ে আছে। মাটি নিকানো বিস্তীর্ণ-অঙ্গনের মত দেখাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন—এ

পাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কিছু ভাসছে না। দু চার গাছি খড়কুটো ভাসতেও দেখা যাচ্ছে না জলের মধ্যে। কই? সে কই?

—পঙ্কজিনী? অনন্ত ঠাকুর ফুল তুলে ফিরছিল; পঙ্কজিনীকে দেখে সে দাঁড়াল।

—ঠাকুর মশায়? মলিন আমার জলের তলায় হারিয়ে গেল গো!

—না। ডুবলে ম'রে ভেসে উঠত পঙ্কজিনী। সে সেই কারিগর মশায়ের ওখানে গিয়েছে। আমি ওবেলা তোর বাড়ী যাব' পোষ্টকার্ড কিনে রাখিস একখানা, জোড়া পোষ্টকার্ড। চিঠি লিখে দোব তাঁকে। তিন চার দিনেই দেখবি নিশ্চয় খবর পাবি—'কোন ভাবনা করিবা না। মলিন এখানেই আসিয়াছে। ভালই আছে।'

তিন চার দিনেই খবর এল। যোগেশ পাল মশায় লিখলেন—'ঠাকুর মহাশয়, পত্র পাইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। মলিন তো এখানে আসে নাই। এখানে পৌঁছুছিলে অবশ্যই আমার বাড়ী পঁহুছিত। নাম করিলে যে কোন লোক দেখাইয়া দিত। তথাপি পুলিশ আপিসেও খোঁজ করিলাম, তাহারা হারানো লোক জমা রাখে, বিনা টিকিটের যাত্রী হইলে ধরিয়া রাখে। সেখানেও কোন খোঁজ পাইলাম না। অন্যত্র খোঁজ করিবেন। সে নিশ্চয়ই এখানে আসে নাই।'

—তা-হলে? মলিন হারিয়ে গেল!

চলে গেল। হতভাগা চলে গেল। হারিয়ে গেল! পঙ্কজিনী হাত বাড়িয়ে বসে রইল মাটীর পুতুলের মত।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

'হারানো বা হারিয়ে যাওয়া হল পৃথিবীর একটা নিয়ম। সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাওয়া, নতুন আসা চলে সমানে। হারানো বা হারিয়ে যাওয়া মানুষ কদাচিৎ ফিরে আসে। মরলে জীয়োয় আর হারালে ফিরে পায় সংসারে কে? যার মহাপুণ্য মহাভাগ্য, সে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মহারাণী শৈব্যা মৃত রোহিতাশ্বকে ফিরে পেয়েছিলেন মহাদানের পুণ্যে। সতী সাবিত্রী সত্যবানকে ফিরে পেয়েছিলেন মহাব্রতের তপশ্চারণের পুণ্যে। সে কি ওই পঙ্কজিনীর ওই কর্মে, ওই ভাগ্যে হয়?'

যোগেশ পাল পত্র লিখবার সময় এই কথাই ভেবেছিলেন এবং চোখের জলও ফেলেছিলেন। সে ফোঁটার চিহ্নটি পোষ্টকার্ডখানির মধ্যে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও ভেবেছিলেন···'আর নিজে যারা হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসে তারা হয় মহাপুণ্যাত্মা নয় অতি হতভাগ্য। গৌতম আসেন বুদ্ধ হয়ে, ধ্রুব ফিরে আসেন ধ্রুবলোকের অধিশ্বর হয়ে আর কৃষ্ণনগরের সংসারত্যাগী নিরুদ্দেশ রামেশ্বর দশ বছর পর শবসাধনার আসন ছেড়ে ভ্রষ্ট হয়ে জটে পাগলা হয়ে ফিরে আসে।'

সে আজ চার বছর আগের কথা। চার বছরে নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে বোষ্টমদের সেই আশ্চর্য শান্ত, আশ্চর্য দুর্দান্ত ছেলেটি। এবারও দেবীগ্রামে মহালক্ষ্মী গড়তে গিয়েছিলেন যোগেশ পাল।

একদিনের জন্য গিয়েছিলেন। রঙের সময়। আজকাল তাঁর ছেলেই কাজ করে, তিনি বাড়ীতে বসে মুখ গড়ে দেন; আর রঙের সময় একদিনের জন্য গিয়ে ওই মুখখানিই রঙ করে দিয়ে আসেন। বিশেষ ক'রে চোখ তিনটি আঁকবার জন্য যান। প্রতিবারই মলিন পঙ্কজিনীর কথা ওঠে। অনন্ত ঠাকুরই তোলে। এবার ঠাকুর কথাটা তুললে না; পালই তুললেন—কই এবার তো সেই ছেলেটার কথা বললেন না। মলিন? ফিরেছে না কি? অনন্ত হেসে বললে—ওদের সব ধুয়ে মুছে গিয়েছে। কি বলব?

—ধুয়ে মুছে গিয়েছে? মলিন—

—না সে সেই গিয়েছে আর ফেরে নি। যখন ফেরে নি তখন সেও গেছে। এখানে ওর মা মরেছে, দিদি সেই বেশ্যা হয়েছিল, সেও মরেছে—

—বলেন কি?

—হ্যাঁ। খালাস পেয়েছে। ছেলেটার শোকটা বড্ড লেগেছিল হতভাগীর। কেঁদে কেঁদে বেড়াত, সে তো দেখেছেন।

—হ্যাঁ। গতবারও তো এসেছিল, 'বাবা, সে যায় নাই আপনার ওখানে?'

এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনন্ত বললে—তার ওপর মেয়েটা খুন হয়ে গেল। আর সইতে পারলে না।

—খুন?

—হ্যাঁ। রাত্রে কারা ঘরে এসেছিল, মদটদ খাইয়ে বেহুঁস করে গলা টিপে মেরে যা ছিল নিয়ে পালিয়ে যায়। ও কর্মের যা ফল··· তাই আর কি!

—নারায়ণ, নারায়ণ। নারায়ণ স্মরণ ক'রেছিলেন যোগেশ পাল।

—সে ছেলেটাও, বুঝলেন না, হয় রেলে কাটা প'ড়ে, নয় নদী-নালায় ডুবে, নয় সাপে খোপে খেয়ে অটালেই মরেছে।

অবিশ্বাস করেন নি যোগেশ পাল। কি আছে অবিশ্বাসের ?

—থাকতে থাকল ওই ফনেটা। খেটে খুটে খায়, নিরীহ লোক।

অনন্ত ঠাকুর বকবক করে পঙ্কজিনীদের পুরানো কথা পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছিল। যোগেশ পাল বাধা দিয়েছিলেন। তাঁর সহ্য হয় নি।

—ও সব কথা থাক ঠাকুর মশাই, অন্য কথা বলুন। তারপর এবারকার পূজোর ব্যবস্থা কি রকম বলুন! চার বছরের সংকল্প তো এবারেই শেষ। না-কি, বরাবরই হবে ?

—শুনছি, ধাতু মূর্তি হবে। নিত্যপূজা! এখনও ঠিক নাই। তবে অবিশ্যি কত্তা যদি রোগশয্যে থেকে ওঠেন তবেই। না-হলে যা চলছে তাই চলবে।

—কত্তা ভাল হয়ে উঠুন। মায়ের নিত্যপূজাই কায়েম হোক। আপনাদের মাইনে বাড়ুক। চলুন—এবারেই মায়ের মুখ আমি শেষবারের মত রঙ ক'রে দিই।

*　　　*　　　*

দেবীগ্রাম থেকেই ফিরছিলেন যোগেশ পাল। ছোট লাইনে কাটোয়া পর্যন্ত এসে ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনের গাড়ী ধ'রে নবদ্বীপে নামবেন, ওখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে ট্রেন ধরে যাবেন বাড়ী কৃষ্ণনগর। নবদ্বীপে মহাপ্রভুকে দর্শন বন্দন সেরে যাবেন। বহুকাল আসেন নি নবদ্বীপ। ভুবন পাল মশায়ের সঙ্গেও দেখা ক'রে যাবেন। বৃদ্ধ এককালের বড় কারিগর সমাজের প্রবীণ ব্যক্তি। এখনও চলতি ভাল।

ভুবন পালের বাড়ীর সামনে নেমেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ও কে? অতি পরিচিত—যেন অতি পরিচিত।

প্রতিমা বা মূর্তি দেখে সচরাচর কেউ তার খড়ের কাঠামোর কি একমেটে দুমেটে অবস্থার রূপ কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু কারিগর পারে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঙে ঢাকা খুঁতগুলি চোখে পড়ে। একে দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

একটি আঠারো উনিশ বছরের সুঠাম সুরূপ তরুণ। কাঁচা সোনার মত রঙ, মার্জনায় উজ্জ্বল, বাঁশীর মত নাক, চোখ দুটি ছোট—কিন্তু উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ, মাথায় বড় বড় চুল; পরণে পরিচ্ছন্ন পোষাক। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র অস্থির চাঞ্চল্যে সে শুধু দুলছে। দুই গালে নিষ্ঠুর চড়ের দাগ রক্তমুখী হয়ে ফুটে রয়েছে, মাথার চুলগুলি সজোরে আকর্ষণে বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে নাক চোখ মুখের উপর এসে পড়েছে। তার আশে পাশে কয়েকজন লোক, বিশেষ ক'রে ভুবন পালের ছেলে রাগে প্রায় আত্মহারা হয়ে তাকে শাসন করছে।

—বল বলছি, বল? কেন করলি?

ঈষৎ একটু বেঁকে, যুদ্ধোদ্যত হয়ে, সে মাথা হেঁট করে যেমন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছিল তেমনি দুলতে লাগল। কোন উত্তর দিলে না।

এই অবস্থায় যোগেশ পালকে দেখে—ভুবন পালের ছেলে একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল। এই রাগের মধ্যে মাননীয় অতিথি-কুটুম্বকে সম্বর্দ্ধনা করতে হবে। যোগেশ পালের প্রতি সম্ভ্রম সমাজে অকৃত্রিম। নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা ক'রে ভুবন পালের ছেলে জোর ক'রে হাসতে চাইলে, বললে—আপনি! আসুন আসুন! পরক্ষণেই

লোকজনদের দিকে ফিরে বললে—নিয়ে যা ওটাকে, বেঁধে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দে।

নাকে-চোখে-মুখে-পড়া লম্বা চুলগুলি মাথা ঝাঁকি দিয়ে পিছনে ফেলতে গিয়ে ছেলেটির দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, যোগেশ পালের দিকে তাকিয়ে সে যেন পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তে আত্মসম্বণ ক'রে সে বললে—চল, কোথা যেতে হবে চল!

যোগেশ পাল বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। দাঁড়াও তো। এবং দ্রুত তার সামনে এসে বললেন—মলিন!

—কে? কি বলছেন আপনি? কে মলিন? ফিরে দাঁড়াল ছেলেটি। চোখে মুখে অপমান ও ক্ষোভের সঙ্গে বিচিত্র বিস্ময় ফুটে উঠল। সে বিস্ময় রূঢ় এবং উদ্ধত।

—তুমি মলিন নও? মলিন দাস?

—মলিন দাস? কে মলিন দাস?

—দেবীগ্রামের পঙ্কজিনী দাসীর ছেলে।

—দেবীগ্রাম? পঙ্কজিনী দাসী? না। আমি জানিনা কোথায় দেবীগ্রাম। কে পঙ্কজিনী দাসী আমি চিনি না।

—পঙ্কজিনী, তোমার মা মরেছে। তোমার দিদি খুন হয়েছে। মলিন যদি হও তুমি তবে শুনে নাও। না হও যদি তবে শুনো না।

মা মরেছে! দিদি খুন হয়েছে! উদ্ধত উগ্র মলিন আকস্মিক আঘাতে পাথর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর তার যেন চেতনা ফিরল, মৃদু, অতি মৃদুস্বরে শোনা কথা ক'টি পুনরাবৃত্তি করলে—মা মরেছে? দিদি খুন হয়েছে? মর্মান্তিক বেদনায় অভিভূত হয়ে প্রকারান্তরে এবার সে স্বীকার করলে যে, সে মলিনই বটে।

সংবাদটা এমন নিষ্ঠুর এবং মর্মান্তিক যে সব লোক ক'টিই এক মুহূর্তে অভিভূত হয়ে পড়ল। না হয়ে পারে না। ভুবন পালের ছেলেও মিনিটখানেক স্তম্ভিতের মত চুপ ক'রে থেকে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, বললে—দে, ওকে ছেড়ে দে। যাঃ তুই চলে যা। যা শুনলাম তারপর আর তোকে মার-ধোর করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু নবদ্বীপে যদি আর তোকে দেখতে পাই তবে তোর মাথা মুড়িয়ে কপালে উল্কি দিয়ে লিখে দোব তোর কীর্তি! শয়তান কোথাকার! নাম পর্যন্ত ভাঁড়িয়েছিস। যা বেরো! বেরো! বেরো!

আমার স্যুটকেসটা

—দাও হে এনে দাও।

যোগেশ পাল নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন অপেক্ষা করে। যাক, ও চলে যাক—তারপর জিজ্ঞাসা করবেন। এখন প্রশ্ন করলে হয়তো আবার রাগটা বেড়ে উঠবে, জ্বলে উঠবে ফুঁ দিয়ে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের মত।

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে মলিন চলে গেল। যোগেশ পালের মনে পড়ল—ওর আর একদিনের চলে যাওয়ার কথা। দেবীগ্রামে একদিন অর্জুন গাছ থেকে নেমে ঠিক এই ভঙ্গিতেই মাথাটি দোলাতে দোলাতে চলে গিয়েছিল কচু বনের ভিতর দিয়ে। আজকের চলার ভঙ্গিটিও ঠিক তেমনি। সেই মলিন। ছেলেটা কাঁদে না। এত নিষ্ঠুর ভাবে মার খেয়েছে তবুও কাঁদল না। একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওই পথে এগিয়ে গিয়ে পাবে গঙ্গার ঘাট। গঙ্গার তীরভূমির আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ চলবে ছেলেটা।

এতক্ষণে যোগেশ পাল প্রশ্ন করলেন—কি করেছিল ?

—এত লোকের সামনে সে বলার নয়। বলতে পারবো না। আসুন, ভিতরে আসুন। কিন্তু ওকে আপনি চিনলেন কি ক'রে ? কি নাম বললেন ? মলিন ? এখানে নাম বলেছিল—অতুল ঘোষ : বাপ-মা-মরা কায়স্তের ছেলে।

—না। ওর নাম মলিন দাস। জাতে—। জাত ওর নেই, তবে বোষ্টোম বলেই চলত। বর্দ্ধমান জেলায় দেবীগ্রাম বলে একখানা বড় গ্রাম আছে। সেখানে অমৃতবাবু মস্ত ধনী লোক। তাঁর বাড়িতে কোজাগরীতে কমলেকামিনী মূর্তির পূজো হয়। আমিই গড়ি। আজও সেখান থেকেই আসছি। ওর মা বোনের খবরটা এবারই শুনে এলাম। চার বছর ছেলেটা বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ।

ভুবন পালের ছেলে বললে—আমাদের এখানে, হ্যাঁ—তাই হবে, চারবছরই হবে, এসেছে। চারবছর আগে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে ভারী শান্ত ফুটফুটে তের চৌদ্দ বছরের ছেলেটা পথ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের মিস্ত্রিখানার দোরে দাঁড়িয়ে গেল। তখন কালীপ্রতিমার মরসুম। জগদ্ধাত্রী আর কার্তিক প্রতিমায় মাটি পড়ছে। গোষ্ঠাষ্টমীর গরু তৈরী হচ্ছে, রাখাল বালক হচ্ছে, ওদিকে রাসের সখী। সবাই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে রইল তো রইলই সারাদিন। বিকেল বেলা বুড়ো মিস্ত্রী রতনের চোখে পড়ল সেটা। সে ওকে জিজ্ঞাসা করলে—কে রে তুই ? সারা দিন দাঁড়িয়ে আছিস ? তখন ওই পরিচয় দিয়ে বলে—আমাকে চাকর রাখবে মিস্ত্রী ? আমি জল তুলব, মাটি মাখব। আমি একটু একটু এ সব কাজও জানি। মিষ্টি চেহারার ছেলেটার মুখচোরার মত কথা শুনে মিস্ত্রীর দয়াও হল ; আর মরসুমের সময় লোকও দরকার।

মিস্ত্রী আমাদের বললে—অনাথা ছেলে—ভাল ঘরের ছেলে—ভাল ছেলে বলেও মনে নিচ্ছে। থাক না। বাবা বললেন—থাক। দু তিন দিন পর মিস্ত্রী একটি পুতুল হাতে করে এল, বললে—কত্তা দেখুন তো কেমন? ছেলেমানুষের গড়া অবিশ্যি। বাবা বললেন—তাই তো হে, মন্দ নয় তো। কে গড়েছে? মিস্ত্রী বললে—ওই অতুল, নতুন ছেলেটা। ওকে রেখে দিন। ভাল কারিগর হবে। তা হয়েছিল; ছোঁড়ার পুতুলে হাত চমৎকার। আর মাথায় খেলেও অনেক রকম। এই দেখুন—

সামনেই তাকে একটি ছোট্ট কাঠের টুকরোর উপর মাটির গড়া একটি পুতুল; কয়েকটি পুতুল মিলিয়ে একটা ঘটনার ছবি। একটি তালগাছ, তার মাথায় একদিকে পাতার উপর একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকের পাতার উপর দুই পাখা সবিক্রমে বিস্তার করে হিংস্রভঙ্গিতে উদ্যত-চঞ্চু একটা শঙ্খচিল একটা পায়ের নখ বাড়িয়ে রয়েছে, মাঝখানে পাখীর বাসা, বাসায় কয়েকটি ডিম। যুদ্ধোদ্যত শঙ্খচিলের ভঙ্গিটি আশ্চর্য; পাখায়, নখে, ঠোঁটে তার সে কি বিক্রম, চোখের দৃষ্টিতে সে কি হিংস্র ক্রোধ! ওদিকে তেমনি সাপটার গ্রীবাভঙ্গি এবং চোখের দৃষ্টিও সমান সুন্দর। দেহটা বেঁকিয়ে ফণা তুলে দাঁড়ানোর মধ্যে আশ্চর্য ললিত এবং ক্রূর বিক্রম।

আর একটা পুতুল দেখিয়ে পালের ছেলে বললে—এটাও ওর।

একটি মেয়ে স্নান ক'রে কাঁধে গামছা ফেলে কাঁকে কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যোগেশ পাল মুগ্ধ না-হয়ে পারলেন না। ছেলেটার হাত ভাল তা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু এত শিগ্‌গির—এই চার বছরে! কত

বয়স হবে ওর এখন ? সতের-আঠারো ? এর মধ্যে এত নিখুঁত হবে ভাবতে পারেন নি। কিন্তু করলে কি ?

প্রশ্ন করবার আগেই ভুবন পালের ছেলেই বললে—কিন্তু এত বড় পাষণ্ড, এমন—

কথায় বাধা পড়ল, বৃদ্ধ ভুবন পাল ঘরে ঢুকে বললেন—যোগেশ ! কখন এলে ?

বৃদ্ধকে প্রণাম ক'রে যোগেশ বললেন—এই তো। ওই ছেলেটাকে নিয়ে যখন কাণ্ড হচ্ছিল তখনই। সেই কথাই হচ্ছিল।

বৃদ্ধ বললেন—রাধামাধব হে ! জয় মহাপ্রভু ! পাপ ! যোগেশ, মহাপাপ এসে ঘরে ঢুকেছিল। জীবন, তুমি যাও এখান থেকে।

জীবন চলে গেল বৃদ্ধ বললেন—পাষণ্ড করেছে কি জান ?

নীরবে প্রতীক্ষা করে রইলেন যোগেশ পাল।

—একটি মূর্তি অববিত্র ক'রে দিয়েছে হতভাগা শয়তান। চমকে উঠলেন যোগেশ পাল।

কণ্ঠস্বর মৃদু করে বৃদ্ধ বললেন—সেই মূর্তিটি আমি নিজে হাতে গড়েছিলাম। নাম আর করব না, একজন সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত কন্যার মূর্তি। কৃষ্ণনগরের মহারাজার মূর্তি তোমরা গড়েছ, সেই দেখে তিনি আমাকে গড়ে দিতে বলেন। আমার পুরানো যজমানের বাড়ী। সেখানে প্রতিমা গড়ি। প্রতি বছরই যেতাম। মেয়েটিকে বহুবার দেখেছি। বছর কয়েক আগে হঠাৎ মারা গেল কন্যাটি। তার ফটো বড় করিয়ে, রঙীন করিয়েও আশ মিটল না তাঁর। আমাকে বললেন—পাল মশায়, আপনি গড়ে দিন। আমি গড়ে দিয়েছিলাম। কাচের কেসের মধ্যে যত্ন ক'রে তাঁর ঘরে রাখতেন।

ক' বছরে এবার খানিকটা বিবর্ণ হয়েছিল—তাই নতুন অঙ্গরাগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধ হয়েছি, সেখানে নিজে যেতে পারি না। অথচ আমার হাত নইলে তাঁর তৃপ্তি হবে না। পাঠিয়ে দিলেন এখানে। অঙ্গরাগ পরশু শেষ করলাম। ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে দেখলে, যেন ছোট ছেলে লাল রঙ দেখছে। ঘুরে ফিরে দশবার এল—আর দেখলে। কাল রাত্রে,—ছোঁড়া পাশের ঘরে শুত,—মাঝের দরজার খিল ছুরি দিয়ে খুলে ঘরে ঢোকে। শব্দে আমারই ঘুম ভেঙে যায়। মনে করেছিলাম চোর। উঠে জানালায় এসে দাঁড়াই। ওই জানালায়। ওখান থেকে সব দেখা যায় এ ঘরের। কি বলব যোগেশ! রঙে বাতাস লাগবার জন্য কাচের কেসটা খোলাই ছিল। দেখি ছোঁড়া দুই হাতে মূর্তিটার মুখ ধ'রে অপলক চোখে চেয়ে আছে, তারপর চুম্বন করলে। আমি চীৎকার করতে গিয়ে চীৎকার করলাম না। গিয়ে ডাকলাম জীবনকে। তাকে দেখালাম। চুপিচুপি লোকজন ডেকে যখন ঘরে গিয়ে ঢুকল জীবন—তখনও ওর ঘোর কাটে নি। সারারাত বাঁধা পড়েছিল। তারপর—।

যোগেশ পাল শুধু স্তম্ভিতই হলেন না, সর্বাঙ্গ তাঁর হিম হয়ে গেল।

ভুবন পাল বললেন—জান যোগেশ? হারামজাদা—পুতুল গড়তে ভালবাসত। প্রতিমাতে হাত দিতে চাইত না। বলত ও বড় বড়, তা ছাড়া কি রকম লাগে আমার।

॥ দুই ॥

মা মরে গেছে, দিদি মনো খুন হয়েছে।

বেশ হয়েছে। যাকগে। ভালো হয়েছে। দিদির জন্য দুঃখ একটু হচ্ছে, কিন্তু মায়ের জন্য—না, হচ্ছে না। মায়ের কথা মনে হলে দেহ তার কেঁপে ওঠে। মন বিষিয়ে ওঠে। নবদ্বীপে এসে অবধি সে সাধ্যসত্বে গোস্বামীপাড়া কি মায়াপুরের দিকে কখনও যায় নি। পর্বে-পার্বণে প্রায় লুকিয়ে থেকেছে। ভয়ে, ওই মায়ের ভয়ে। যদি তীর্থ দর্শনে আসে, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, ও রে আমার মলিন রে, সোনা রে, মানিক রে বলে দু হাত বাড়িয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে!

ভাবনা মাত্রই শরীর তার শিউরে উঠেছে, মন তার চমকে উঠেছে। আশ্চর্য—সে নিজেকে সামলাতে পারে নি, চীৎকার করে উঠেছে ধে-ৎ। অথবা দূর। অথবা আঃ!

ভুবন পালের কারখানায় একবার মনের খেয়ালে সে একটি বোষ্টুমী-পুতুল তৈরী করেছিল। একটু হেলে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে বোষ্টুমী, মাথায় চূড়া ক'রে চুল বাঁধা, চোখের দৃষ্টিতে একটু অন্তরঙ্গ বক্র ভাব, মুখে অল্প হাসি, নাকে রসকলি। সে পুতুলটি দেখে মিস্ত্রীশালার সবাই যেন এক মুহূর্তে রসিক হয়ে উঠেছিল। সে নিজে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—মা, তার মা। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল দিদির যৌবনের লাবণ্য। সব সেই! কারখানার মিস্ত্রীরা খুব তারিফ করেছিল। ছোঁড়ার দলেরা

তারিফের সঙ্গে নানান রসিকতা করেছিল ; একটা ছোকরা গুণগুণ করে অশ্লীল গান গেয়েছিল। একজন চুম খেয়েছিল পুতুলটার। স্থির হয়ে বসে সে দেখেছিল সব ; হঠাৎ এক সময় উঠে মূর্তিটাকে তুলে নিয়ে এই গলিপথ ধরেই এসে গঙ্গার জলে ঝপ করে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মিস্ত্রীরা, বিশেষ করে ছোট পাল-কর্তাকে বলেছিল পুতুলটার কথা। বলেছিল, ওর ছাঁচ ক'রে পুতুল ছাড়লে ভাল বিক্রী হবে। ছোট পাল তাকে বলেছিলেন, ওটা আবার করতে। কিন্তু সে করে নি। এক কথা ধরেছিল—না, ও আমার ভাল লাগে নি। সে আমি জলে ফেলে দিয়েছি।

এইবার সত্যি সত্যি জলে ডুবেছে। যাক। ছুটোই গিয়েছে, এবার সে নিশ্চিন্ত নিষ্পাপ !

দিদি লোকটা মন্দ ছিল না। তার ওপর ভালবাসাও নাই, রাগও নাই। আপনার নিয়ে ছিল, সব সম্বন্ধ ছিঁড়ে খুসী মত পথে দাঁড়িয়েছিল—বেশ করেছিল ! তা সেও গিয়েছে ভাল হয়েছে। ধুয়ে মুছে গেল তার সব পিছনটা। হঠাৎ আপন মনেই ঘাড় নাড়তে লাগল সে।—না। না ! না। গেল আর কোথায় ? নবদ্বীপে ভুবন পালের কারখানায় জমা হয়ে রইল।

বদমাইস বুড়ো, হারামজাদা তার ছেলেটা।

স্যুটকেস হাতে নিয়ে গঙ্গার ধার ধ'রে চলেছিল মলিন। গাল ছুটোয় এখনও চড়ের দাগ ফুটে রয়েছে। কানের জোড়টা জ্বলছে, বোধ হয় কেটে গিয়েছে কারও নখে। নিষ্ঠুর ভাবে তাকে নির্যাতন করেছে। তার আপশোষ হচ্ছে, সেও কাউকে একছুরি বসালে না কেন ?

মাটীর একটা পুতুল।

কোন বড় লোক যজমানের মেয়ের পুতুল, মেয়ে নয়। জ্যান্ত মেয়ের জাতকে তার জানা আছে। ওই মেয়ে যদি বেঁচে থাকত, তবে সে তার সন্ধানে যেত। বলত তোমাকে চাই। নইলে ভুবন আমার অন্ধকার। সে তাকে জিতে নিয়ে আসত। না পারলে হার মানলে প্রণাম করে চলে আসত। হার সে মানত না।

বুড়ো ভুবন পালের গল্প শুনে তার যেন নেশার ঘোর লেগেছিল। এই মূর্তিটায় রঙ করতে করতে ভুবন পালই মেয়েটার কথা বলেছিল। বলেছিল তাকেই। সে ছাড়া তো ওই ঘরে মূর্তি রঙের সময় আর কেউ ছিল না। পাল তাকেই ভার দিয়েছিল সরঞ্জাম জোগাবার। রঙ, তুলি, গঁদ, তুঁতে, জল মলিনই পাশে সাজিয়ে রাখছিল। আর শুনছিল। পাল বলেছিল—জানিস, সে প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী। প্রকাণ্ড নাট-মন্দির। থামগুলিতে পঙ্কের পালিশ, মাথায় মাথায় পঙ্কের নকসার কাজ। চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে মার্বেল বসানো। আমরা প্রতিমা গড়তে যেতাম। যেতাম সাধারণত রাত্রে। নবদ্বীপ থেকে এই বিকেলের গাড়ীতে যেতাম কিনা। পৌছুতাম বারোটা নাগাদ। সকাল বেলা উঠে কাজে হয়তো লেগেছি কি লাগব—এমন সময় তোড়ার ঝম ঝম শব্দ উঠতে লাগত। প্রথমে অন্দরের ভিতরে, তারপর চণ্ডীমণ্ডপের দিকের দোতালার বারান্দায়, তারপর সিঁড়িতে। যেন কল কল ঝর ঝর শব্দ করে পাহাড় থেকে নেমে আসছে জলকন্যে কিম্বা—ঝম ঝম শব্দ তুলে যেন নেমে আসছে দেবকন্যে। একেবারে চণ্ডীমণ্ডপের উপরে এসে থামত।

—কারিগর মশায়!

ভুবন পাল অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। আহা-হা। সে কি রূপ! সে কি কণ্ঠ! কি রঙ, কি মুখ। কি চোখ, কি নাক, কি ঠোঁট, কি চুল, কি হাসি, কি কথা ব'লে বোঝানো যায় না! এই যে এই মূর্তি, এ মাটি—মাটীর পুতুল! তার কাছে এ কিছু নয়, কিছু নয়! রূপে রসে শব্দে গন্ধে সে টলমল; হাসত খিলখিল করে—যেন জলতরঙ্গ বাজত। হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ত। চুল ছিল এক রাশি—সে চুল এসে পড়ত মুখের উপর। আবার ভিক্ষুক আসত, দুঃখী আসত, তাদের দেখে মুখখানি যে কি হয়ে উঠত! চোখ ছলছল করত। তখন সে ছেলে মানুষ—এই দশ এগার বছর বয়স। সন্ধ্যের সময় এসে ভুবন পালের কাছে বসত, বলত, ছেঁয়াবাজী (ছায়াবাজী) দেখান কারিগর মশায়। লণ্ঠনের আলোয় হাতে আঙুল মুড়ে মুদ্রা করে দেওয়ালে ছায়া ফেলত ভুবন পাল। বুড়ো আঙুল নিচে রেখে বাকী আঙুলগুলোকে উপরে জড়ো করে ধরলে—দেওয়ালে ছায়াতে কুমীর হ'ত। বুড়ো আঙুলটা নাড়লে মনে হত কুমীর মুখ নাড়ছে। বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল উঁচু করে বাকী তিনটে আঙুলকে—একটু বেঁকিয়ে সামনে মেলে ধরলে ছায়াতে হরিণ হ'ত। এমনি অনেক রকম হয়। দু হাতের ছায়া দুদিকে ফেলে—কসরৎ ক'রে—ছায়ার লড়াই দেখাত। সে কি খুসী! কি হাসি! বলত—আমাকে শিখিয়ে দিন। হাত এগিয়ে দিত। ভুবন পাল শেখাত। সে যেন ননী-মাখনের গড়া হাত। কি নরম!

সেই মেয়ে বড় হয়ে উঠল। পনেরো ষোল বছর বয়স হল। তখন আর ছুটে আসত না। বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে

দাঁড়াত। পরনে থাকত ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ী। রঙীন কাপড় সে পড়ত না। পড়লে পড়ত বেনারসী। কালাপেড়ে শাড়ীতে এমন মানাত তাকে যে মনে হ'ত লক্ষ্মী ঠাকরুণ। একটু ঝুঁকে ডেকে বলত—কাল রাত্রে এলেন? ভাল ছিলেন? বাড়ীর সব ভাল আছে? মনে হ'ত বেহালায় সুর বাজছে।

চক্ষু দান করতাম যখন তখন নেমে এসে পাশে দাঁড়াত। তখন পায়ে তোড়া পাঁয়জোর থাকত না। শব্দ হত না তো, তবু কাজ করতে করতেই আমি বুঝতে পারতাম। সুবাসিত তেলের মিষ্টি গন্ধ পেতাম। চোখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করতাম—এসেছ?

—হ্যাঁ।

বেশী কথা আর তখন কইত না। বড় হয়েছিল—লজ্জা হ'ত।

এক বছর আমার জ্বর হয়েছিল। প্রবল জ্বর; মাথা ধরায় ছটফট করছিলাম। জ্ঞান খুব ছিল না। হঠাৎ মনে হল—কপালে কি যেন ঠাণ্ডা মতন, জুড়িয়ে যাচ্ছে সব। চোখ মেলে চেয়ে দেখি—সে। মাথায় আমার অডিকলনের পটি দিয়ে দিচ্ছে। আমি আরামে বলেছিলাম—আঃ!

আমার কপালে হাতখানি রেখে বলেছিল—খুব কষ্ট হচ্ছে?

ওরে, এমন মেয়ে আর আমি দেখি নি।

শুনতে শুনতে রঙের পাত্র এগিয়ে দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল মলিনের। বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করে উঠছিল। কাল-বোশেখীর ঝড়ের আগে পশ্চিম আকাশে মেঘ যেমন ফুলে ফেঁপে উথল-পাথল করে—তেমনি সে উথল-পাথল। স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে সে ওই মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। ওই মাটীর মূর্তি যেন মুহূর্তে মুহূর্তে

তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠছিল। তার মধ্যে যেন ফুটে ফুটে উঠছিল কত পরিচিত পরম কামনার জন। তাদের দেখেও ঠিক এমনি ভাবে তার বুকে তোলপাড় ক'রে উঠত। সে প্রাণপণে নিজেকে স্তব্ধ করে রাখত। মুখ ফুটে বলতে পারত না কিছু। এ মূর্তির মধ্যে ভুবন পালের ওই রাজকন্যে জলকন্যের সঙ্গে তারা মিশে গিয়েছে। সে যেন এদের জন্য জন্মজন্মান্তর তপস্যা করে আসছে। পাচ্ছে না।

তার নিজের গ্রামের, ওই দেবীপুরের অমৃতবাবুর বাড়ীর ক'টি কিশোরী মেয়ে মূর্তিটার মধ্য থেকে উঁকি মারছিল যেন। তারাও এমনি। ঠিক এমনি। বছরে একদিন অরণ্য-ষষ্ঠীর দিন তারা ষষ্ঠীতলা আসত। যষ্ঠীতলা তাদের বাড়ীর পাশেই। সে-দিন সে রাস্তার ধাড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের চুলের মিষ্টি গন্ধ পেত।

কাজ শেষ হয়ে গেলেও সে সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই দেখেছিল। কতক্ষণ, তার হিসেব নেই। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। বুকের ভিতর সমানে সেই তোলপাড় চলেছিল। মূর্তিটা মাটির, সে-কথা ভুবন পালের মতই সে জানত। গোবর-মেশানো মাটির পচা গন্ধ তার নাকে লেগে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, সে গন্ধ কেমন ক'রে যেন অপরূপ মিষ্ট গন্ধে পরিণত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল---চুলের তেলের মিষ্ট গন্ধ। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল—মনে হয়েছিল, জ্বর হয়েছে তার।

বুড়ো ভুবন পালই হেসে বলেছিল—দূর থেকে ঠিক জীবন্ত মনে হচ্ছে?

ঘাড় নেড়ে সে জানিয়েছিল—হ্যাঁ।

—যা এখন। দরজা বন্ধ ক'রে দি। আমার চেয়েও তোর ভাল হাত হবে।

একটা টাকা তাকে দিয়ে ভুবন পাল বলেছিল—রঙ যা তুই গুলেছিলি এমন এক বুড়ো রতন ছাড়া কেউ পারে না। নে। মিষ্টি খাস।

মিষ্টি সে খায় নি!

খেয়েছিল মদ। মদ খেতে এর আগেই সে শিখেছিল। কিন্তু এমন তৃষ্ণার সঙ্গে কখনও এর আগে খায় নি। সন্ধ্যে থেকে গঙ্গার ধারে বসেছিল। বসে আর কিছু ভাবে নি, শুধু ভেবেছিল এই মূর্তিটিকে। ভুবন পালের বলা গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে মূর্তিটিকে জীবন্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখেছিল চোখের সামনে।

হঠাৎ মনে হয়েছিল, সে এক আশ্চর্য কথা মনে হয়েছিল।

অনেক সাধু আছে যারা পারে—সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিল সে। পোড়া-মা ঠাকুরতলায় মধ্যে মধ্যে এক পাগল আসে, লোকে বলে সে সিদ্ধ পুরুষ।

পোড়া-মা তলায় পাগল ছিল না। সে উন্মাদ হয়ে ফিরে এসেছিল। মদ খেয়েছিল, সেইজন্য সকালে ফেরে নি। দেরী ক'রে ফিরেছিল। সকলে ঘুমুলে ফটকটা ডিঙিয়ে ফেরার কৌশল শিখিয়ে দিতে হয় না, ওটা আপনিই মনে জোগায়। ডিঙোবার শক্তি থাকলেই জোগায়। জোগায় না বুড়োর আর ছেলের। না, জোগায় না ভীরুর। ছেলে বয়সেও সে অনেক ফটক অনেক পাঁচীল ডিঙিয়েছে। বুড়ো হলেও—না, বুড়ো সে হবে না কখনও। এ ফটক সে অনেকদিন আগে থেকেই ডিঙিয়ে ঢুকতে শিখেছে। রাত্রি ক'রে যেদিন বাড়ী ফিরেছে—সেই দিনই চিন্তা না ক'রেই

সটান উঠে পড়েছে রেলিং ধরে। এটা আবার বাধা! যাত্রা শুনে ফিরেছে। শান্তিপুরে রাস দেখে ফিরেছে। কেষ্টনগর সে যায় নি, ওই যোগেশ পালের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে যায় নি।

সেদিন ওই ফটক ডিঙোবার সময়ই তার মনে উদগ্র বাসনা জেগেছিল।

প্রথম বাসনা হয়েছিল—মূর্তিটা নিয়ে পালাবে। এমন একটা মূর্তি সে গড়তে পারে না তা নয়। পারে। কিন্তু সেটা নেহাতই হবে পুতুল, মাটীর মূর্তি। ভুবন পালের গড়া এই মূর্তিটা ঠিক যেন পুতুল নয়; মাটী নয়। এ যেন সেই; ভুবন পাল যার কথা বললে—সেই। এর মধ্যে আছে যেন তার গ্রামের বাবুদের বাড়ীর সেই মেয়েগুলি সবাই। তার চুলের মিষ্টি গন্ধ পেয়েছে সে ওই মূর্তিটা থেকে। এ সেই রাজার মেয়ে। বড়লোকের মেয়েরা সবাই একসঙ্গে। টগবগ ক'রে ফুটতে লেগেছিল তার বুকের রক্ত। নিজের ঘরে ঢুকে—কতক্ষণ তার মনে পড়ছে না—সে ঘরময় ঘুরেছিল, সে ঘুরেছিল, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। কিছুতেই থাকতে পারে নি। ওই পাশের ঘরে তার সব কামনার ধন; মাঝখানে এই বদ্ধ দুয়ার। সে তাকে ডাকছে, টানছে। দরজার খিলটা ছুরি দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে প্রথমেই জ্বেলেছিলো আলো।

না-হলে দেখবে কি ক'রে? না দেখলে সে চুলের গন্ধ পাবে কি করে? আসলে তো রঙের গন্ধ, বার্নিশের গন্ধ, কিন্তু মলিনের চোখের জাদুতে ও গন্ধ কেশতেলের গন্ধ হয়ে উঠবে। না দেখলে কথাই বা বলবে কি করে?

দেখতে দেখতে অতি সন্তর্পণে মুখখানি ধরে ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট দুটি রেখেছিল। যদি বেঁচে ওঠে তবে বুকে জড়িয়ে ধরবে।

জাগে নি। তবু সে খুসী! রাজার মেয়ে, তাকে সে পেয়েছে। হঠাৎ উঠল মানুষের সাড়া। কেউ তার ঘাড়ে টিপে ধরলে।

—কে?

ভুবনপালের ছেলে—তার সঙ্গে তারই সঙ্গীরা।

গঙ্গার কিনারা ধ'রে চলতে চলতে তার মনে হল—

মূর্তিটা ভেঙে দিয়ে আসতে পারলে খুসী হ'ত।

তাই দেবে হয়তো। তার উচ্ছিষ্ট পুতুল নিশ্চয় জলে ভাসিয়ে দেবে তারা। ভুবন পাল আবার গড়বে।

হয়তো উচ্ছিষ্টই খা রাখবে।

আপন মনেই হা-হা ক'রে হেসে উঠল সে।

চলো মুসাফের, গাঁঠরি তার নাই। শুধু স্যুটকেসটা। তুলি আছে, বাখারীর, কাঠের ছুরি আছে, মূর্তি-মাজার যন্ত্র আছে, ছাঁচ খোদাইয়ের যন্ত্র আছে, কটা জামা কাপড় আছে। একটা জামা, দু'টো কাপড় বোধ হয়। ওতেই হবে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

স্নান করবে না কি? পোড়াকপালী মুখপুড়ী মা মরেছে। দিদি খুন হয়েছে। করবে না কি স্নান? মাথাটাও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মর্মান্তিক অপমান করেছে ভুবন পালের ছেলে; নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে!

মাথাটাও ঠাণ্ডা হবে।

একটা ঘাটে এসে স্যুটকেসটা খুলে একখানা কাপড় বের ক'রে রাখলে। এঃ গামছাটা যে নাই; ওটা আর একখানা কাপড় শুকতে দেওয়া ছিল—তাই রয়ে গেল। ধোপা বাড়ীতে আছে দুখানা

কাপড় একটা জামা। থাক। কোন আপশোষ তার নাই। ওই মূর্তিটির মুখখানি ধ'রে সে—। এতেই সে খুসী। না—কিসের খুসী? বুকে তার এখনও তোলপাড় চলছে। মাটির মূর্তি জীবন্ত হয়ে যদি উঠত মুহূর্তের জন্য তবে পিপাসা মিটত। এ তার পিপাসা বাড়ল। ও মাটির মূর্তি সে গড়বে। কিন্তু সে কি জাগবে?

ভাবতে ভাবতেই নেমে পড়ল সে গঙ্গার জলে। গঙ্গার জলে লোকে তর্পণ করে, শুনেছে সে। মরা মানুষকে জল? দেবে না কি? মাকে আর দিদিকে জল? স্নানই যখন করছে তখন দিক। নে, জল নে মা। নে, জল নে দিদি। এ সময় কাঁদতে হয় বোধ হয়। কিন্তু কান্না তার আসবে না। কাঁদতে সে পারে না। কারুর কান্না সে দেখতে পারে না।

তৃতীয় পর্ব

।। এক ।।

পাঁচ বছর পর।

পাঁচ বছর পর, মলিন—ঠিক এই কথাগুলিই বলছিল। সেদিন গঙ্গার চরভূমির উপর দিয়ে চলবার সময় মনে মনে বলেছিল কথাগুলি ; আজ বলছিল—একটি মেয়েকে। মেয়েটির নাম টিয়া। সে কাঁদছিল। মলিন তাকে বলছিল—

'কান্না! কান্না আর ভাল লাগে না, তুই কাঁদিস না টিয়া। কান্না আমি সইতে পারি না। আমি নিজে কাঁদি না। কাঁদতে আমি পারি না। আমার মা মরেছিল, আমি কাঁদি নি। কেউ কাঁদলেও আমার ভাল লাগে না। কাঁদিস নে। কাঁদবি তো ঘরে গিয়ে কাঁদ।'

টিয়া একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে। আশ্চর্য রূপ। এরূপের জাতই আলাদা। সংসারে রূপেরও জাত আছে। কোন রূপে তেজ থাকে, কোন রূপে চোখ-জুড়ানো মায়া থাকে, কোন রূপে দীঘির কালোজলের ডাকের মত ডাক থাকে, কোন রূপ দেখে মন বিষিয়ে ওঠে—তাতে বোধ হয় বিষ থাকে, কোন রূপ দেখে ঘৃণা হয় ; টিয়া মেয়েটির রূপ দেখে নেশা লাগে—টিয়ার রূপে নেশা আছে।

মলিনের জীবনে নেশার ঘোর লেগেছে।

চন্দননগরে লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারের পূর্ব দিকে, যেখান থেকে গঙ্গার ধারের রাস্তাটা দক্ষিণে চলে গিয়েছে ষ্ট্র্যাণ্ডের দিকে,

উত্তরে গিয়েছে বস্তী অঞ্চলে, সেইখানেই মলিন এখন পুতুলের দোকান করেছে। পাঁচ বছরে মলিন ভরা জোয়ান হয়ে উঠেছে, যৌবন তার দেহের কানায় কানায়; লম্বা গৌরবর্ণ সবল দেহ, দীপ্তদৃষ্টি উজ্জ্বল মুখ মলিনকে আর সে মলিন বলে চেনাই যায় না। আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মুখ থেকে—ভাবগুলি থেকে দেবীগ্রামের সকল স্মৃতির রেশ যেন নিঃশেষে মুছে গেছে। বিল্বগ্রামের ধূলার চিহ্ন, পঙ্কজিনীর হাতের ছাপ—আর এতটুকু নাই। চোখে মুখে সে অস্থির মত ভাব আর নাই। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ দুটির মধ্যে আরও কিছু একটা ফুটে উঠেছে। যেন একটা নিষ্ঠুরতা অথবা শানিত ধাতুর দীপ্তির মত প্রখর কিছু। অনেক খেটেছে সে, অনেক লড়েছে সে, মার খেয়েছে, মেরেছে। তার সাক্ষী ওই দেহখানা।

যৌবনধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে ভরেই ওঠে নি, বেশ সবল এবং শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে। দেহে তার শক্তিও আছে। দেখেই বুঝা যায় যে, শরীরটাকে কসরৎ ক'রে গড়েছে। দেহ অবশ্য ওর গোড়া থেকেই ভাল এবং দেহকে খাটিয়েছেও যথেষ্ট। এ খাটুনীর সুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। পথ হেঁটে, গাছে চড়ে, সাঁতার দিয়ে। তারপর পালিয়ে এল নবদ্বীপে, ভুবন পালের কারখানায় ভর্তি হয়ে প্রথমেই পেয়েছিল মাটি-ভাঙা আর মাটি-মাখার কাজ। ওর পুতুল গড়ার নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েও ও-কাজ থেকে তাকে অনেকদিন অবধি রেহাই দেয় নি ছোট পাল। কেষ্টনগরে পুতুলের কাজ বেশী। নবদ্বীপে পুতুলের চেয়ে প্রতিমার কাজ বেশী। বছরখানেক পর তবে সে ও-কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। ততদিনে শরীরে তার গুল বাঁধতে সুরু হয়েছিল এবং ওতে তার

একটা নেশাও লেগেছিল। কারখানায়ও মলিনই ছিল সব চেয়ে ছোট ; ওর থেকে দু বছর চার বছরের বড় যারা ছিল, তারা সকলেই দুনিয়ার বাঁধা নিয়মে চাইত ওকে হুকুম করতে। প্রথম-প্রথম মুখচোরা মলিন সে হুকুম তালিম করত। পুতুল গড়ার কাজে ওর কদর হতেই মলিন 'পারব না' বলতে শুরু করেছিল। মুখচোরা ছেলেটা 'পারব না' বলেই আপন মনে কাজ করে যেত। আর ঘাড় দোলাত। তারপর আরও কথা ফুটল তার মুখে। এরপর শুরু হল হাত টানাটানি ; তারপর হাতাহাতি। প্রথম শুরু হয়েছিল তাকে 'কুকুর' বলার জন্য। গোপেশ্বর নামে একটা মাথা মোটা ছেলে ছিল। মাথাটা ছিল তার দেখতে আকারেও মোটা আর ভিতরে প্রকারেও ছিল বুদ্ধিতে স্থূল। সবাই তাকে বলত মাথা মোটা অথবা 'কাতলা' অর্থাৎ মাথা মোটা কাতলা মাছ। সে বলেছিল—বড় মিস্ত্রী বললে, হুঁকোটায় জল ফিরিয়ে দে আর তামাক সাজ ! শুনছিস্ অত্‌লো। মলিন তখন ওখানে অতুল ছিল।

মলিন বলেছিল—তুই ফেরা। আমি পারব না।

—পারবি না ?

—না, আমি কায়স্থ তোরা পাল, তোদের হুঁকোতে আমি জল ফেরাব কেন ? তুইও ত ওই হুঁকোতে তামাক খাবি। তুই সাজ।

গোপেশ্বর বলেছিল—একেই বলে নাই দিলে মাথায় চড়ে। নেয়ের কুকুর পাতে ভোজন। বেটা কায়েৎ ! ভিখিরীর ছেলে—কি জাত না কি জাত ঠিক নাই। বেটা আমার কায়েৎ।

—খবরদার আমাকে কুকুর বলবি না।

মলিন কিন্তু মৃদুস্বরেই প্রতিবাদ করে চলেছিল। মৃদু হলেও আশ্চর্য কঠিন তার কণ্ঠস্বর। এরপরই লেগেছিল মারামারি। মলিন

কুকুর বলতে বারণ করেই ক্ষান্ত হয় নি; কথা শেষ করেছিল গোপেশ্বরকে শূয়োর বলে। বলেছিল—আমি কুকুর হলে তুই শূয়োর।

গোপেশ্বর অভ্যাস মত এসে তার ঘাড় ধ'রে বলেছিল—কি বললি?

অভ্যাস মত মানে এর আগে পর্যন্ত মলিনের অবাধ্যতার জন্য তারা সবাই এসে তার ঘাড় ধরত। মলিন প্রাণপণে ঘাড়টা শক্ত ক'রে সোজা রাখতে চাইত। কাঁদত না, চীৎকার করত না, বাধাও দিত না। অন্য লোকে এসে আক্রমণকারীকেই ছাড়িয়ে দিত। মলিন ঘাড় ছাড়া পেয়ে—ঘাড়ে হাতও বুলোত না, কোন অভিযোগও করত না। কাজে থাকলে নীরবে কাজ করে যেত বসে থাকলে বসেই থাকত। কিন্তু বরাত করা কাজ সে কিছুতেই করত না।

সেই দিন প্রথম গোপেশ্বরের হাত ধ'রে বলেছিল—ছাড়।

গোপেশ্বর আরও শক্ত করে ধরেছিল তার ঘাড়। মলিন একটা আকস্মিক ঝটকা মেরে ঘাড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে গোপেশ্বরকে এক চড় মেরে বসেছিল। তারপরই আরম্ভ হয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। হেরেছিল মলিনই, কিন্তু গোপেশ্বরকেও সে ছাড়ে নি। এরপর থেকে যুদ্ধটা হামেসাই হ'ত। কসরতের কুস্তীতে নয়, সত্যকারের দ্বন্দ্বযুদ্ধের শক্তি প্রয়োগ। এইভাবে মার খেয়ে এবং মেরে তার শরীরটা গড়ে উঠেছে এবং মুখচোরা স্বভাবটাও কেটে এসেছে।

নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে সে এই কয় বছরে তিন চার জায়গা ফিরেছে। এ চার বছর সে পরিশ্রম করেছে মজুরের মত। সে অনেক কথা।

॥ দুই ॥

প্রথমেই বাড়ী যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। যাবে একবার দেবীপুর। শুনে আসবে কি ভাবে দিদি খুন হয়েছে, কে খুন করেছে। শুনে আসবে মা কেমন ক'রে কেঁদেছে। মা আর দিদি তার জীবনের দুই আপদ। তবু তাদের জন্য সেই মুহূর্তে তার অন্তরটা ফণা থেঁতলানো সাপের মত মুচড়ে মুচড়ে পাক খেয়েছিল। দেবীপুরে যাবে বলেই কাটোয়া জংসনের টিকিট কিনেছিল। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে কাটোয়ায় গাড়ী বদলের সময় হঠাৎ কি জানি পাল্টে গিয়েছিল সে ইচ্ছে। দেবীপুর। দেবীপুরের বাতাসে মাটিতে, লোকের চোখের চাউনিতে কথায় যেন তাকে, সেই অর্জুন গাছের অসংখ্য পোকার মত কামড়ায়। অস্বস্তির মধ্যেই সে কাটোয়ার বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। ট্রেনের দেরী ছিল তিন ঘণ্টা। সময়টা ছিল পূজোর ঠিক পর কার্তিক মাস। কাটোয়ার বাজারে মিস্ত্রীপাড়ায় ঘরের আঙিনায় সারি সারি ছোট বড় কার্তিকের কাঠামো তৈরী হচ্ছিল। সামনে ৩০শে কার্তিক কার্তিক-পূজো। কার্তিক পূজোয় কাটোয়ায় খুব সমারোহ। কার্তিকের লড়াই হয় না কি। এখানকার দেহ-ব্যবসায়িনীদের মহলে কার্তিক পূজোয় সোরগোল পড়ে যায়। হরেক রকমের কার্তিক। বই শ্লেট বগলে ক'রে পড়ুয়া কার্তিক, লাটাই ঘুড়ি হাতে কার্তিক, সাইকেলে চড়া কার্তিক, সে নানান ঢঙ। মলিন যেন বেঁচে গেল। বাঃ, এইখানেই তো অনেক কাজ! ভুলে গেল সে মায়ের কথা দিদির কথা।

দেবীগ্রাম আর যাওয়া হল না তার। কাটোয়াতেই সে আস্তানা নিলে। কিছু টাকা তার সঙ্গে ছিল। তার চার বছরের সঞ্চয়, সে প্রায় আশীটাকা; টাকাটা সে অহরহ সঙ্গেই রাখত। কোমরে একটা কাপড়ের লম্বা থলিতে পুরে বেঁধে রাখত। সেই নিয়ে শুরু করে দিয়েছিল তার স্বাধীন জীবন।

বেঁচে গিয়েছিল সে। মার খেয়ে গাল খেয়ে দমে যাওয়া মন-- এক মুহূর্তে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছিল; দেহের বেদনা মনের দুঃখ সব যেন কোন মন্ত্রগুণে দূর হয়ে গিয়েছিল। মা-দিদির মৃত্যু সংবাদের শোক ওই কাটোয়ার গঙ্গার জলেই যেন ধুয়ে মুছে গেল। দেবীপুরের মানুষগুলির সেই বিষাক্ত হাসি মাখানো চাউনি-- তার সর্বাঙ্গ বিষিয়ে দেবে।

আর এই তো! এই তো সে চেয়েছে সারা জীবন। এই তো সে চায়! এইখানে এই গঙ্গার ঘাটে বারো মাসই পুতুল বিক্রী হয়! এইখানেই সে পুতুল গড়বে আর বিক্রী করবে। এখানে দিদির কথা নাই মায়ের নাম নাই দেবীপুরের লোকের চোখের খোঁচা নাই কথার কাঁটা নাই---এখানেই সে মনের আনন্দে থাকবে! আর একটা কাজ সে করবে। নবদ্বীপের ওই পালের মত একটা কারখানা সে গড়ে তুলবে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে একখানা ঘর ভাড়া করে ফেললে। মাসে তিন টাকা ভাড়া। তিন মাসের ভাড়া এক সঙ্গে দিয়ে দিলে। বাড়ীওয়ালা খুঁত খুঁত করছিল। সামনেই কার্তিক পূজো, তারপরই একটা গঙ্গাস্নানের যোগ, পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নান, এখন দশ দিন বিশ দিন পর পর যাত্রীর ভিড় লেগেই থাকবে। বাড়ীটা অবশ্য ভাঙাচোরা, মাথাগুঁজে থাকাই চলে এবং একেবারে

গঙ্গার ধারে বনজঙ্গলের পাশে, খানিকটা দূরেই শ্মশান; নিতান্ত দায়ে না পড়লে যাত্রীরা এতদূরে আসে না কিন্তু ভিড়ের সময় শীতকালে ওরই কদর অনেক। এই কারণেই দিতে খুঁত খুঁত করছিল বাড়ীওয়ালা। কে জানে এক মাস পরই পালাবে কি না! মলিন একেবারে একখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বলেছিল—এই নাও। এ টাকা তোমার কাছে জমা রইল। ভাড়া মাস মাস আমি দিয়ে যাব।

ঘরখানা ভাড়া নিয়েই সে কাজ সুরু করে দিয়েছিল। ঘর দোর উঠোনটা পরিষ্কার করে নিয়েই, বাজারে গিয়ে একটা শাবল একখানা ছোট কোদাল একখানা বস্তা কিনে গঙ্গার ভাঙা পাড়ের মধ্যে গিয়ে আরম্ভ করেছিল মাটি কাটতে। হাঁড়ি থাক কলসী থাক চালডাল নূন তেল থাক, সর্বাগ্রে চাই মাটি। সামনেই কার্তিক পূজোর বাজার। আজ রাত্রি থেকেই সে আরম্ভ করবে কাজ। ঠাকুর কার্তিক না, পুতুল কার্তিক। বড় না, ছোট ছোট। হরেক রকম। আর গড়বে কিছু পুতুল। বোষ্টুমী পুতুল। আর কনে পুতুল।

হঠাৎ কিসে যেন পা পড়েছিল। কি?

একটা মরা ব্যাঙ। কিন্তু আশ্চর্য তো! সঙ্গে সঙ্গেই হাতে করে তুলে নিয়েছিল সে। বেশ তো! অনেকদিনের মরা ব্যাঙ, আশ্চর্যভাবে পেটের ভিতরের অন্ত্রপাতি বেরিয়ে গিয়ে শুকনো কাঠের মত হয়ে গিয়েছে। আকারে বেশ বড়। বোধ হয় দাঁড়কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে—পেটটা ফুটো ক'রে ভিতরটা খেয়েছিল এবং তারপর তার নখ থেকে খসে পড়ে এমন অবস্থা হয়েছে।

না, কোন সাপে ধরেছিল ? যাই হোক যে কারণেই এমন হয়ে থাক এটা হয়েছে চমৎকার ! হঠাৎ তার খেয়াল খেলে গিয়েছিল মাথায়। ব্যাঙটা কুড়িয়ে এনে, সেই রাত্রেই মাটি দিয়ে উপরের এবং নিচের দুটো স্বতন্ত্র ছাঁচ তুলে, উনোনে সেটা পুড়িয়ে নিয়েছিল।

দিন দুয়েক পরই ঘরখানার পিছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা মাকড়শার জালে পেয়েছিল একটা মরা প্রজাপতি। যেমন বিচিত্র রঙ—তেমনি বড়। ঘন কালো পাখার উপর গোল একটি লাল টোপা। যেন অমাবস্যার আকাশের চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকেও জাল থেকে ছাড়িয়ে এনে তার ছাঁচও একটা তৈরী করেছিল সে। এ কাজটা ব্যাঙের ছাঁচের মত সহজ হয় নি। এর কারিগরি আশ্চর্য ! বলিহারি কারিগর ! হাড় নাই মাংস নাই শুধু যেন রস জমিয়ে গড়া রস আর রঙের খেলনা ! মলিন প্রজাপতিটিকে সামনে রেখে প্রথমে একটি মাটির প্রজাপতি গড়ে নিয়েছিল, সেটাকে পুড়িয়ে, তার উপর মাটি দিয়ে ছাঁচ তৈরী করেছিল। কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত সারি সারি প্রজাপতি ও ব্যাঙ সাজিয়ে রঙ দিয়ে ভরে তুলেছিল তার পশরা। তার সঙ্গে বোষ্টুমী পুতুল আর কনে পুতুল। কার্তিক পুতুলও কিছু গড়েছিল। কার্তিক পূজোর একদিন আগে একটা পশরা মাথায় একটা কাখে নিয়ে এসে বসেছিল গঙ্গার ঘাটে। মিস্ত্রীদের বাড়ীতে বাড়ীতে কার্তিকের বাজার বসে গেছে। এ বাজারে দেহব্যবসায়িনীদের একটা ভিড় আছে। ওদের বাড়ীতে বাড়ীতে কার্তিক পূজো। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ওদের দিকে মলিন তাকায় নি। ওদের সে চায়ও নি। ওদের সে জানে। আর ওরা এলেই মনে হয়, দিদির সম্পর্কের ছোঁয়াচ—

যেটা সে গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলেছে সেটা আবার জেগে উঠবে হয়তো বা নতুন ক'রে তার গায়ে লাগবে।

সে পথ চেয়ে তাকিয়েছিল—লালপেড়ে, কালাপেড়ে, নীলাম্বরী, ডুরে শাড়ী পরা এলোচুল,—হাতে মাজা চকচকে ঘটি,—মিষ্টিমুখ, –শান্ত দৃষ্টি,—স্নানার্থিনী মেয়েদের। মা-খুড়ী ঠাকুমা-পিসীমাদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে নামবার সময় যারা থমকে দাঁড়াবে, মা খুড়ীর আঁচল ধরে টানবে, আঙুল দিয়ে দেখাবে—দেখ! দেখ! আমাকে কিনে দাও! তাদের!

যাদের সঙ্গে মিল আছে ভুবন পালের সেই কন্যের। তার কনে-পুতুলের। যাদের সঙ্গে মিল আছে তাদের গাঁয়ের বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের। তাদের।

কিন্তু দিদি সর্বনাশী! মা সর্বনাশী! মরেও মরে না।

হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল সেই সর্বনাশীদের সম্পর্ক ধরে আর এক সর্বনাশী।

তার দিদি মনোর এক প্রতিবেশিনী। ছোট শহরটিতে দিদি মনো যে বাড়ীতে থাকত, এ-মেয়েটাও সেই বাড়িতে থাকত। একটা কালো কুৎসিৎ মেয়ে। রূপ নাই কিন্তু যৌবন আছে। এ নিয়ে তার অহংকারেরও সীমা নাই। সেই অহংকারেই সে সেই ছোট শহরটা ছেড়ে কাটোয়ার মত শহরে এসেছে। কাটোয়ায় থাকবার সংকল্প করবার সময় ওর কথা মনে পড়ে নি মলিনের। মনে ছিল না। অনেকদিনের কথা। মলিনের দেহ মন বিষিয়ে উঠেছিল তাকে দেখে। মেয়েটা কিন্তু গায়ে পড়ে প্রায় হেসে ঢলে পড়তে চেয়েছিল। অন্যান্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রতিমার বাজারে পছন্দ ক'রে ঠাকুর কিনতে এসেছিল সে। মলিনকে দেখেই চিনে

ফেলে বলেছিল—আরে আরে তুমি কে হে ? ও নবীন কারিগর ? তুমি না মনোর ভাই মলিন ?

প্রথমটা কথার উত্তরই দেয়নি মলিন। যেন শুনতেই পায়নি। অর্থাৎ সে মলিন নয়, সে শুনতে যাবে কেন ? কিন্তু সে ছাড়ে নি। একটা ঢেলা তুলে তাকে ছুঁড়ে মেরে বলেছিল—এই ! কানে কালা নাকি ? এই নাগর !

—কি ? চমকে উঠে বিরক্তি দেখিয়ে ফিরে তাকিয়েছিল মলিন।

—চিনতে পার না, না কি ?

প্রথম দু-একবার না-চেনার ভান করে মলিন বুঝেছিল, না-চিনলে এ কদর্য মেয়েটা তাকে না-চিনিয়ে ছাড়বে না। এবং গোটা কাটোয়ায় তাকে একদিনে সকল জনের কাছে চিনেয়ে ছেড়ে দেবে। অগত্যা চেনা দিয়েছিল। মেয়েটার চোখে ফুটে উঠেছিল কুৎসিত লালসা, মুখেও সে বলেছিল—কি সুন্দর তুই হয়েছিস রে !

ওই মেয়েটাই সেদিন একটা মুটে ডেকে প্রায় সব পুতুলগুলো কিনে নিয়ে গিয়েছিল ঝাঁকা ক'রে। তার পাড়ায় বিলোবে সে। এবং কার্তিক পূজার দিন মলিনকে নেমন্তন্নও দিয়ে গিয়েছিল।—যেতে হবে কিন্তু !

সেইদিন রাত্রেই মলিন কাটোয়া ছেড়ে পালিয়েছিল।

।। তিন ।।

কাটোয়া থেকে এসেছিল বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানের গোলাপবাগ তার মনোহরণ করেছিল। মহারাজার গেষ্ট হাউসের সামনে সাদা মেঘের মত মার্বেল গড়া কি অপরূপ নারীমূর্তি! মূর্তিগুলি দেখে মনে পড়ত আর একটি মূর্তির কথা। সে মূর্তি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। এর কাছে সে? গ্রীষ্মের সময় সে রোজ যেত গোলাপ-বাগে। এ সময়টায় রাজবাড়ীর সকলেই চলে যেতেন পাহাড়ে, দার্জিলিং ঠাণ্ডার দেশে! এ সময়ে গোলাপবাগে বেড়াতে কোন বাধা হয়নি। গাছে গাছে নতুন পাতায় কচি সবুজের বাহারে চোখে একটা নেশা লাগত; প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও গোলাপবাগের ঘন সারিবন্দী গাছের তলায় তলায় নিরবিচ্ছিন্ন একটি ছায়ার রাজ্য থম থম করত। বাতাস শুধু খেলা ক'রে বেড়াত শুকনো পাতা নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত। ওদিকে গোলাপবাগের চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে এক কোণে ব'সে ব'সে বাঘগুলো ঝিমুত, হাঁপাত। ভালুকে থাবা চুষত। বাঁদরগুলো ঢুলত। পাখীগুলো চোখ বুজে এক পা তুলে বসে থাকত দাঁড়ের উপর। মলিন যেত সেই ভর্তি দুপুরে। ছায়াবিছানো রাস্তা পার হয়ে এসে পড়ত গেষ্ট হাউসের সামনে। খোলা জায়গায় রোদ যেন তপ্ত গলন্ত রূপার মত ঝরত, ঝলসে দিত সব। বিস্তৃত খোলা জায়গায় নানা ছকে ছাঁদে তৈরী কেয়ারীর মধ্যে গোলাপের গাছ, যুই-কামিনীর ছাঁটা ঝাড়গুলির পাতা ও ডগাগুলি আম্‌লে নুয়ে পড়ত। তারই মধ্যে বাঁধানো জায়গায় উঁচু বেদীর

উপর এই শ্বেতবরণীরা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কত বিচিত্র ছন্দ, কত মনোহর ভঙ্গি! দুধের মত শ্বেতবরণের সে কি শোভা! কতদিন সে তাদের পা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকত; সেও নিথর হয়ে যেত। এর বেশী আর সাহস হ'ত না।

সন্ধ্যেবেলা যেত সে মহাজনটুলির দিকে। রূপের হাট মহাজনটুলি। রঙে, কাজলে, রঙীন কাপড়ে সেজে দাঁড়িয়ে থাকত রূপসীরা। শরীরের মধ্যে রক্ত তার ফুটত; বুকের মধ্যে আশ্চর্য একটা উৎকণ্ঠার মাথা কোটাকুটি চলত। হাত পা ঘামত। কিন্তু—। কিন্তু কাছে গেলেই কেমন গোলমাল হয়ে যেত। সকলের মুখের মধ্যেই দেখতে পেত তার দিদির ছাপ। কারও চোখে, কারও কপালে, কারও ঠোঁটে, কারও হাসিতে মনে পড়ে যেত মনোকে। বর্দ্ধমান বাজারে তখন টুনি আর বাব্‌লি নামে দুটি মেয়ের নাম ছুটেছে। তাদেরও সে দেখেছে। বাব্‌লি একটু মোটাসোটা গড়নের, তার দিদির সঙ্গে মিল ছিল। কিন্তু টুনি ছিল পাতলা ছিপছিপে। মাজা শ্যামলা রঙ, কোন মিল ছিল না দিদির সঙ্গে, তবু মনে হত দিদির মত। পালিয়ে আসত সে। তখনই কোমরে সে একটা ছুরি রাখত। শরীরে তার তখন শক্তি বাড়ছে। সাহস তার চিরদিনই আছে। দিদিকে যারা খুন করেছিল, মহাজনটুলিতে তারা নিশ্চয় আসে। যদি দেখা হয় সেই জন্যে রাখত। কিন্তু দিদি ম'রে গিয়েও মহাজনটুলিতে ফিরে আসবে—এ সে ভাবে নি।

এই দিক দিয়ে বর্দ্ধমান তার বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু তবু বর্দ্ধমানে থাকা তার হয় নি। খাবে কি? দিন চলবে কি করে? পুতুল বিক্রী হল না বর্দ্ধমানে। শহরে বড় লোক অনেক, সৌখীন লোকেরও অভাব ছিল না। জামায়, কাপড়ে, চাল চলনে

কলকাতার নিচেই বৰ্দ্ধমান। পুতুল বহুজনেই কেনে; বাড়ীর কাচের আলমারিতে পুতুল সাজানোও থাকে। কিন্তু সে মাটির পুতুল নয়। সে পুতুল চিনে মাটির; ওই গোলাপবাগের বড় মূর্তিগুলির অনুকরণে ঘষা সাদা রঙ তাদের, পালিশ করা সাদাও আছে, তার উপর সে কি সুন্দর রঙ! দু চারটে কেষ্টনগরের পুতুলও আছে। তার পুতুলগুলি কেষ্টনগরের চেয়ে খারাপ ছিল না। কিন্তু তখনও সে পোড়াতে পারে নি। কাঁচামাটির পুতুল। আর মাটিও ভাল ছিল না। দামোদরের ধারের মাটিতে কি গঙ্গা মাটির মত পুতুল হয়? হয় না। গঙ্গাজলে চান ক'রে মানুষ স্বর্গে যায় কি না সে জানে না, তবে গঙ্গায় চান করলে রূপ খোলে--রঙ ফরসা হয়, আর গঙ্গামাটিতে তৈরী পুতুলের রূপের তুলনা হয় না—এ সত্যটা সে নবদ্বীপে চার বছর থেকে জেনে এসেছে। তবুও সে চেষ্টার ক্রুটি করে নাই।

শেষ চেষ্টা করেছিল—অনেক খেটে, অনেক যত্নে সে তিনটি পুতুল তৈরী করেছিল। পুতুল নয়, পুতুলের ছবি। একটি মহারাজার বাড়ীর অবিকল নকল। সামনে রেলিং, বড় বড় থাম, ফটক, ফটকে সান্ত্রী, এমন কি রাজবাড়ীর ছাদের আলসে এবং মাঝখানের বাহারের নক্সাটি পর্যন্ত তৈরী করেছিল। আর একটি কার্জন ফটকের নকল, তৃতীয়টি মহারাজের নতুন প্রতিষ্ঠা-করা ছোট ছোট পাথরের-মন্দিরের ঠাকুর বাড়ী। সেই তিনটি নিয়ে সে অনেক চেষ্টা করেছিল মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হয় নি। আমলা কর্মচারীরা দেখা হ'তে দেয় নি। দিন দশেক ঘোরার পর শেষ দিন ওই সর্বনাশী মা আর দিদি তার খোঁজ পেলে। সর্বনাশীরা মরেও নিষ্কৃতি দেবে না। মরার আগে যেন দেশ দেশান্তরে ওর খোঁজে

লোক পাঠিয়েছে। শেষ দিন রাজবাড়ীর কাছারীর বারান্দায় দেখা হয়ে গেল—দেবীপুরের বাবুদের গমস্তার সঙ্গে। রাজ কাছারীতে এসেছে বিষয় ব্যাপার নিয়ে। মলিনকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

সুবেশ, সবল স্বাস্থ্য রূপবান এই যুবকটিকে দেখে তার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এ কি—সেই—সেই—? মলিন আর দাঁড়ায় নি, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে বেরিয়ে চলে এসেছিল। পথে তিনটে পুতুলকেই কৃষ্ণসাগরের জলে ফেলে দিয়ে আপন মনে বুকে আঙুল বাজিয়ে মুখে বিসর্জনের বাজনার বোল আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী ফিরেছিল—"ওমা দিগম্বরী না-চ গো! ড্যাং ড্যানা স্যাং; ড্যাং ড্যানা স্যাং; ডাডাং, ডাডাং! জলে যাও জলেশ্বরী, হাত পা ধুয়ে ঘরে ফিরি।" উঠো মুসাফের বাঁধো গাঁঠেরী—বহুদূর চলো; বহুদূর চলো। যেখানে দেবীপুরের পরিচয় পৌঁছায় না—সেখানে চলো। পরের দিনই বর্দ্ধমান থেকে সে রওনা হয়েছিল।

ত্রিবেণী। ত্রিবেণী। ত্রিবেণী। সারা রাত্রি ভেবে ঠিক করেছিল ত্রিবেণী যাবে সে। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয়েছিল তারকেশ্বর যাবে। শহরে বাবুদের নজর উঁচু; মাটির কারবার এখানে চলবে না। মাটির ঘর না, মাটির পথ না, মাটি নিয়ে যারা কারবার করে তাদের পর্যন্ত ঠাঁই নাই এখানে। কাঁচা মাটির পুতুল সেখানে চলে? পোড়ালে হয়তো চলে। কিন্তু সে মূলধন তার এখন নাই। তা ছাড়া এখানে গঙ্গা নাই। গঙ্গামাটি নাই। মাটির পুতুল কিনবে গাঁয়ের লোকে, ওরা গাঁয়ে কেনে না, কেনে মেলায় এসে সে মেলা তীর্থের মেলা।

গঙ্গাতীর্থে নিত্যই ছোটখাটো মেলা, নিত্যই যাত্রী আসে।

পর্বপার্বনে হাজারে হাজারে যাত্রী আসে, তাদের টানে তখন বৰ্দ্ধমানের বাজারও ভাঙে। বৰ্দ্ধমান ফেলে দোকান-দোকানী ছোটে তারকেশ্বর ত্রিবেণী। এ পুতুল সেখানে কিনবে লোকে। কিন্তু তারকেশ্বর যেতে শেষ পর্যন্ত তার মন ওঠে নি। গঙ্গা নাই, গঙ্গামাটি নাই। তার থেকে ত্রিবেণী ভাল। মগরা ত্রিবেণী। গঙ্গাতীর্থের পার্বন বছরে অনেকগুলি। ত্রিবেণী ভাল। তাই ত্রিবেণীতে এসেছিল সে বৰ্দ্ধমান থেকে।

ত্রিবেণী থেকে এসেছে সে চন্দননগর। ত্রিবেণীতে সে নিজেকে গড়ে নিয়েছে। দেহটা তার ফুলে উঠেছে, এমন চমৎকার খাঁজগুলি ফুটেছে যে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। মাটি খুঁড়ে, মাটি বয়ে, অনেক খেটেছে। গঙ্গায় সাঁতার কেটেছে নিয়মিত। খেয়েছে পেট ভরে। তার কাজের হাতও খুলেছে আশ্চর্য রকমের; তেমনি খুলেছে মন আর বুদ্ধি। দিন দিন নতুন পুতুলের কথা মনে আসে। যা দেখে ভাল লাগে তাই তার পুতুল ক'রে গড়তে ইচ্ছে হয়। তার পর ভাবে কেমন ক'রে এর ছাঁচ হবে। ব্যাণ্ডেল জংসনে একটা পুরনো গির্জে আছে। ভারী ভাল লেগেছিল তার। সঙ্গে সঙ্গে মাটির অবিকল একটি গির্জে তৈরী করেছিল। ওটা আর সায়েবদের কাছে সে নিয়ে যায় নি। বৰ্দ্ধমান থেকে ও লোভ তার চলে গিয়েছে। লোভ নয়, ছ্যাচড়ামো। মূর্তিটাকে সে দোকানের সামনেই সাজিয়ে রাখত। লিখে দিয়েছিল—বিক্রীর জন্য নয়। বাড়ীতে উঠোনে পুতুল পোড়াবার জন্যে ছোট ভাটাও তৈরী করেছিল ত্রিবেণীতে। ত্রিবেণীতে প্রায় তিন বছরে হাতে জমেছিল পাঁচশো টাকা। ব্যাঙ-প্রজাপতি, পরীর মাথায় ব্রাকেট, পরী, পুলিশ, ফলওয়ালী

—অনেক রকম পুতুলের ছাঁচ সে তৈরী করেছে। সব থেকে বেশী বিক্রী হয় ক'নে পুতুল। একটি কিশোরী মেয়ের মূর্তি। অনেকবার ভেঙে সে তৈরী করেছিল ভুবন পালের সেই মূর্তির মত। প্রভেদ—মলিন পুতুলের হাতে দিয়েছিল গাঢ় লাল রঙের সুতোর তৈরী মালা, আর মাথায় দিয়েছিল মুকুট ; কপালে কানে চন্দন, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, পরণে বেনারসী। পুতুলটি দেখলেই লোকে দু দণ্ড তাকিয়ে দেখত। কিনেও নিয়ে যেত। দাম করেছিল ষোল আনা—এক টাকা। চন্দননগর ক' বছর ধ'রে তিল তিল করে তার মনে একটা আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি ক'রেছে। ত্রিবেণীর রং ফিকে করে দিয়েছে !

ত্রিবেণী ইদানীং আর তার ভাল লাগছিল না। গাছপালা জঙ্গল পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার নিঝুম। তার ভাল লাগবে কেন ? তার চাই শহর, মানুষের হাতের গড়া রঙীন জামা, রঙীন কাপড়, তুলো পাকিয়ে সুতো, সুতোয় বোনা কাপড়, তাতে নক্সার বাহার ; তামা রং গালিয়ে মিশিয়ে ঢালাই করে পেটাই মাজাই ক'রে চকচকে বাসন ; তার চাই চামড়া রাঙিয়ে প্যালশ করে তার জুতো। ফুল চোলাই করে গন্ধ। তিল পেশাই ক'রে তেল। রঙ করে গন্ধ মিশিয়ে শিশি বন্দী তেল। তার চাই ঝকঝকে আলো। তার চাই রূপের হাট। তার চাই মত্ত উল্লাসে হা-হা ক'রে হাসবার জন্য ভাল মদ। তার এইবার চাই বড় বাজার। বড় হাট। চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারে পোস্তা বাঁধানো গঙ্গার ধারের বাঁধানো পথের উপর রথের মেলা। ফরাসী সায়েবদের কি ডে যেন—বাস্তিল ডে—না কি-—তার মেলা, ওখানকার চমৎকার মদের দোকান এবং

মদের স্বাদ, ওখানকার রূপের হাট দেখে তার মনে হয়েছিল—এই জায়গাতে তাকে আসতেই হবে। সে মনে হয়েছিল তার অনেকদিন আগে। ত্রিবেণীতে প্রথম এসে আস্তানা পেতে যেদিন প্রথম চন্দননগর দেখতে আসে সেইদিনই মনে হয়েছিল। তারপরও ত্রিবেণীতে সে ছিল তিন বছরের উপর। তিন বছর ধরেই কথাটা মনে মনে জপেছে সে। কিন্তু হয় নি, পারে নি ত্রিবেণী ছাড়তে। ছাড়ালে এই টিয়া। টিয়ার জন্যই রঘুদস্যির সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেল। রঘুদস্যি দস্যি হোক মলিনের সত্যকারের হিতকামী বন্ধু ছিল।

॥ চার ॥

ত্রিবেণীতে পরম-বন্ধু রঘুদস্যির সঙ্গে টিয়ার জন্যই বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এই টিয়া যে আজ ফুলে ফুলে কাঁদছে। রঘু শাসিয়েছিল, ওর জান নেবে। মলিন শাসায় নি, বলেছিল—দেখা যাবে। তারপরই দশ-পনের দিনের মধ্যে চন্দননগরে বাড়ী-ভাড়া ক'রে, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছাঁচগুলি দিনে দিনে সেখানে সরিয়ে নিশ্চিন্ত এবং ঝাড়া-হাত-পা অর্থাৎ কোন ভার বোঝার বালাই না রেখে শুধু ছুরিখানি সম্বল ক'রে রাত্রে বন্ধুর সঙ্গে মোকাবিলা করে সটান এসে উঠেছিল চন্দননগরে। অবশ্য ছুরি মেরে রক্তারক্তি করে নি, হাতেই মেরেছিল, কিন্তু সে মারও উপেক্ষার নয়। যে মুখে রঘু শাসিয়েছিল, তার সেই মুখে ঘুঁষি মেরে ঠোঁট কেটে দু ফাঁক ক'রে দিয়েছিল, আর পেটে মেরেছিল এক লাথি। চন্দননগর নিরাপদ আস্তানা। এটা

ফরাসী সাহেবদের এলাকা। ত্রিবেণীর পুলিশের নাগালের বাইরে। মার খেয়ে রঘু-দস্যি সোজাসুজি শোধ নেবার চেষ্টা করলে মলিন ভয় পায় না। কিন্তু রঘু শোধ নেবার সময় সোজা বাঁকার ধার ধারে না; শোধ তার লক্ষ্য; তাই এমনক্ষেত্রে সাধারণত সে বাঁকা পথই ধ'রে। আর ত্রিবেণীতে বোঝাপড়া হলে একতরফা হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী ছিল। ত্রিবেণী রঘু-দস্যির তিন পুরুষের বাড়ী। ছেলে বয়স থেকে রঘু-দস্যির দল আছে। বাঁকা পথে দল বেঁধে নিজের এলাকায় বিদেশী একজনকে খুন করে গুম করতেই বা কতক্ষণ লাগে? চন্দননগরে আসবার এটাও একটা কারণ। তাই সে চন্দননগরে এসেছে এবং রঘুকে বলেও এসেছে যে শোধ নেবার ইচ্ছে যদি থাকে তার তবে সে যেন চন্দননগরে যায়। চন্দননগরেই সে তাকে পাবে।

রঘুর সঙ্গে মিতালী হয়েছিল হাতাহাতি ক'রে, ছাড়াছাড়ি হল ঘুঁষোঘুঁষি ক'রে। বর্দ্ধমান থেকে সে ত্রিবেণী এসেছিল অনেকটা হঠাৎ-আসার মত। বর্দ্ধমানে মাটির তৈরী রাজবাড়ী, ফটক এবং মন্দিরের নক্সা পুতুলগুলি মনের ক্ষোভে যেমন হঠাৎ কেষ্টসাগরের জলে ফেলে দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ সংকল্প করেছিল, এখানে আর নয়; এবং কাল থেকেই আর নয়। তখন থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভেবেছিল—তবে কোথায়? তারকেশ্বর না ত্রিবেণী? মন বললে ত্রিবেণী। ব্যস, বেঁধে ফেললে জিনিষ পত্র। তখন আর নবদ্বীপের অবস্থা নয়। কিছু জিনিষ পত্র হয়েছে। একটা ট্রাঙ্ক, একটা বিছানা, পুতুল নেবার একটা প্যাকিং ব্যাক্স। যন্ত্রপাতির একটা আলাদা টিনের স্যুটকেশ। টিয়া কাঁদছে তার সামনে,

আর সে নিঃশব্দে বসে অতীত কথাগুলো স্মরণ করছে। শেষরাত্রে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এসে ট্রেনে চড়েছিল।

সঙ্গে সম্বল গোটা তিরিশেক টাকা। রেলে মাশুল লাগল। তা সে দিলে। ওদিকে তার মেজাজটা খাঁটি। পয়সা সে ফাঁকি কাউকে দেবে না। ত্রিবেণী পৌঁছুতে তুপুর হয়ে গিয়েছিল। খুঁজে পেতে, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যে পাড়ায় বাসা নেয়, সেই পাড়ায় একটা বাসা নিয়ে সে-বেলার মত চিঁড়ে দই কলা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল। বিকেল বেলায় স্থায়ী বাসার খোঁজে বের হয়েছিল। বাড়ী চাই একটেরে। উঠোন চাই। গঙ্গার কাছে হওয়া চাই। তা না হ'লে তার চলবে না।

বিধাতা পুরুষের ব্রহ্মাঠাকুরকে পৃথিবীর জন্যে ভাড়া দিতে হয় কি না সে জানে না, তবে পৃথিবী না পেলে গাছপালা, পশুপাখী, ফড়িং-প্রজাপতি, মানুষ গড়ে সে রাখত কোথায়? কয়েকখানা ঘরই সে দেখে সেদিনের মত ফিরে এসেছিল বাসায়। পরের দিন সকালে ঘাটের ধারে একখানা বড় চ্যাটাই বিছিয়ে পুতুল সাজিয়ে দোকান খুলে বসেছিল। বেশী পুতুল ছিল না; কিছু ব্যাঙ, কিছু প্রজাপতি, কিছু ওই—কনে পুতুল। সবই তখনও কাঁচা মাটির। যাত্রী খুব বেশী ছিল না। বিক্রী সামান্যই হয়েছিল। তবে সকলে প্রায় থমকে দাঁড়িয়ে একবার না-দেখে পারে নি। তাতেই মনে ভরসা পেয়েছিল সে। রূপ যদি চোখে ধরে তবে মনে তাকে পাবার সাধ জাগাবেই এবং সে রূপ যদি নিত্য চোখে পড়ে তবে পাবার সাধও বাড়বে গ্রীষ্মকালের আগুনের তাপের মত, শিখার মত।

এই ভাবনার মধ্যেই তালভঙ্গ করে মূর্তিমান বেতালের মত এসে দাঁড়িয়েছিল রঘু-দস্যি। তখন অবশ্য রঘু-দস্যিকে চিনত না সে।

তবে দেহখানাতে এবং কণ্ঠস্বরে তার পরিচয় কিছুটা ছিল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে তার দিকে, তারপর পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভারীগলায় থেমে থেমে বলেছিল—

—পুতুল !···হুঁ।···চেহারাখানা তো বেশ বাবুকাত্তিকের মত! হুঁ। কোথা থেকে এসেছ ?···এরপরই আচমকা ধমকে উঠেছিল—এ-ই, ভাল ক'রে ব'স।

মলিন দুই হাতের ছাঁদের মধ্যে হাঁটু দুটোকে বেঁধে একটু আলগা হয়ে বসেছিল ; এবং পায়ের পাতাদুটোকে বেশ আরাম ক'রে দোলাচ্ছিল। মনের মধ্যে তার তখন রঙীন ভবিষ্যতের আমেজ লেগেছে। রঘু-দস্যির ভারীগলার গম্ভীর প্রশ্নগুলিতেও সে চকিত হয়ে সতর্ক হয়নি। সেই কারণে রঘু তাকে ধমকে উঠেছিল।

চমকে ওঠে না সহজে। চমকায় নি, তবে সতর্ক হয়েছিল, পা দোলানো থামিয়ে হাত দুটিকে মুক্ত করে একটু ভ্রু কুঁচকে হেসেই প্রশ্ন করেছিল—মন্দ ক'রে বসে আছি না কি ?

রঘুর চাউনির একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের তারা দুটি উপরের দিকে তুলে নিজের চোখের পাতা এবং ভ্রুর লোমগুলি দেখতে দেখতে কথা বলে ; ভঙ্গিটা অনেকটা যুদ্ধোদ্যত মহিষের দৃষ্টি-ভঙ্গির মত। শাসনের ঘোষণা তো আছেই, আক্রমণের উদ্যোগের আভাসও আছে, এই ভঙ্গিটির মধ্যে। সেই ভঙ্গিতে তাকিয়ে রঘু বলেছিল—হুঁ।···ত্রিবেণীতে এই বুঝি প্রথম ?

—হ্যাঁ। তা বটে। কাল এসেছি আমি।

—তাই !···আমি রঘু মিত্তির। লোকে বলে রঘু-দস্যি।···এখানে যে পুতুল সাজিয়ে বসেছ, হুকুম নিয়েছ ?

—হুকুমের কথা তো জানি না।

—জান না, জেনে রাখো, জমিদারের হুকুম চাই, খাজনা চাই, আমার চাই। জমিদারের দৈনিক দু আনা, আমার এক আনা।

মলিন খানিকটা চুপ ক'রে বসেছিল। জমিদারকে দিতে তার আপত্তি ছিল না। তবে ভাবছিল সেটা মাসিক হারে কি বার্ষিক হিসেবে দেবে সে? কিন্তু এই লোকটাকে কেন দেবে? এ যে নেহাতই গায়ের জোরের কারবারী তা বুঝতে তার বাকী নাই। তার দেহের জোর মনকে খোঁচা মারছে, ঠেলা দিচ্ছে।—হুকুম কর। কিন্তু প্রথমেই ঝগড়া করতে চায় না সে।

—দাও, দাও! নয় তো মারব লাথি—চূর করে দেব সব।

তিন আনা পয়সা বের ক'রে রঘুর হাতে দিয়েছিল সে। রঘু পয়সা নিয়ে শান্ত হয়ে চোখের তারা নামিয়ে পুতুলগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করছিল। চোখমুখ সপ্রশংস হয়ে উঠেছিল, বলেছিল—বেড়ে হাত তো তোমার। চেহারা খানার মতই হে। এটা তো বেড়ে করেছ! ক'নে? বাঃ! এ যে ভারি সুন্দর কনে হে! বহুত আচ্ছা! হুঁ।...আচ্ছা এটা আমি নিলাম। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাব।

খপ ক'রে হাত চেপে ধরেছিল মলিন— না, তা হবে না।

রঘু কৌতুক অনুভব করেছিল!—হুঁ, হাত ধরে আটকাবে? আমাকে? বলেই মেরেছিল একটা ঝটকা। ভেবেছিল তার ঝটকায় এই কার্তিকের মত চেহারার ছোকরাটি তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত নিয়ে কাতরাবে; ঝটকায় মুচড়ে যাবে হাতটা। কিন্তু ঝটকা মেরেই চমকে উঠেছিল রঘু। মলিনের হাত মোচড় খায় নি, শক্ত বটে তো ছোকরার মুঠি।

—হ্যাঁ? আচ্ছা—। আবার মেরেছিল ঝটকা।

এবারও ছাড়ে নি মলিন।

নিষ্ঠুর আক্রোশে ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল রঘু। মলিন তার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—বেকায়দা হয়ে গেছে আপনার হাত। নইলে আমি রাখতে পারতাম না।

পুতুলটা রঘুর হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। প্যাকিং বাক্সের ভিতর থেকে আর একটা কনে পুতুল বের করে তার হাতে দিয়ে বলেছিল—নিন। আমার ক'নে আপনাকে দিলাম—এর পর ঝগড়া করলে চলবে না।

খুসী হয়েছিল রঘু। এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল তুমি তো বেশ হে।

-হ্যাঁ। তা আমি বেশ বটে।

—দেখি। বলেই রঘু তার হাতের গুল, বুকের ছাতি পরীক্ষা করে দেখেছিল। এবং কোমরের ছোরার বাঁটখানা হাতে ঠেকতেই তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—আ চ্ছা। দেখি যন্তরটা ?

যন্ত্রটা দেখে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল তা হ'লে তো তোমার সঙ্গে আমার মিলবে ভাল! কি নাম ? দেশ কোথায় ? এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরেই বেড়াও বুঝি ? না—পুতুলটুতুল বাইরের ঢং। ভিতরের আসল রঙ আলাদা! কি ব্যাপার ?

—নাম মলিন দাস। দেশ-টেশ নাই। ছিলাম বর্দ্ধমানে। কারবার চলল না। এখানে এসেছি, গঙ্গার ধার তীর্থস্থান। যদি চলে তো থাকব। কারবার একটাই। এই পুতুলের। তবে ভয় কাউকে করি না, ভয় কাউকে দেখাইও না। মার খেলে মারতে ছাড়ি না। তাই ওটা রাখি। পুতুল পালিশ হয়, ছাঁচ

ছোলাই হয়, খোদাই হয়, আবার দরকার পড়লে—হেসেছিল মলিন।

—বহুত আচ্ছা। এই কনের বদলে দোস্তি হল তোমার সঙ্গে। হাত ধরেছিল রঘু।

হেসে মলিন বলেছিল—হল দোস্তি।

—মদ খাও?

একটু হেসেছিল মলিন এবার।

—বহুত আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় নেমন্তন্ন তোমার!

সন্ধ্যের আসরে চন্দননগরের মদ খাইয়ে চন্দননগরের সন্ধান প্রথম তাকে রঘুই দিয়েছিল। সে আসরে আরও একটু ঘটনা ঘটেছিল। একটা আধা-স্বৈরিণী মেয়েকে নিয়ে এসেছিল রঘু। মেয়েটার চটক একটা ছিল, রঘুর তা ভাল লাগত, কিন্তু মলিনের ভাল লাগে নি।

রঘু তাকে হাত ধ'রে এনে চোখের ইসারা হেনে মলিনকে বলেছিল—ক্যায়সা হ্যায়?

মলিন হেসে বলেছিল—তুমি বল না! আমার কনে পুতুল তো দিয়েছি তোমাকে!

—আরে ও তো স্রিফ মাটি।

—দুই-ই এক ভাই, এ জল পড়লে গলে, আছাড় খেলে ভাঙে; ও আগুনে পুড়ে ছাই হয়, আছাড় খেলে থেঁতলে যায়। সে কাদা ধুলোর চেয়েও ঘেন্নার। ও তুমি রাখ। ওতে আমার দরকার নেই।

তিন বছর তার রঘু-দস্তির সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে কেটেছে। কতবার ঝগড়া হয়েছে, কতবার মিটেছে। পাঞ্জা-কুস্তী তো দিনই লড়েছে। মলিন জেতে নি কখনও তবে সমান সমান গিয়েছে

অনেকবার। শেষের বার কি হয়ে গেল! রঘুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল মলিন। রঘুর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভোজ্য নারী। পার্বনে পর্বে গঙ্গা স্নানের যোগে—রঘু প্রতিদিনই নারী-সংগ্রহ ক'রে আনত। হারানো মেয়ে, স্বেচ্ছাচারিণী নারী, কিন্তু তার সবগুলিকে দেখেই মলিন নাক কোঁচকাত। শুধু পর্বে-পার্বনেই নয়, সাধারণ সময়েও রঘু-দস্যির এ ভোজ্যের অভাব হ'ত না। এদিকে রুচি ওর বাঘের মত ; শীকার দেখলেই ক্ষুধা থাক বা না থাক ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবৃত্তি জাগে। মলিন সন্ন্যাসী নয়, কিন্তু রুচি ওর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গাল দিয়ে রঘু বলত—তোর কপালে ও আর জুটবে না এ আমি বলে দিলাম। তুই পুতুল নিয়েই থাকবি।

হেসে মলিন বলত—তাও তো তোকে দিয়ে দিয়েছি মিতে।

মধ্যে মধ্যে পর্বে স্নানের যোগে, যাত্রী সমাগমের মধ্যে মলিন চঞ্চল হয়ে উঠত। তার দোকানে ভিড় জমত। তাদের মধ্যে তার দৃষ্টি তৃষ্ণার্তের মত সন্ধান করত কার মধ্যে আছে তার তৃষ্ণাহরা রূপ। পুতুলের রূপের হাটের সামনে বসে যেত তরুণীদের রূপের হাট। ছায়ার টানে যেন কায়া আসত। রঙের মায়ায় মরীচিকা কায়া ধরে শত তরঙ্গে উথলে পড়ত কলস্বর তুলে। তাদের কেশ-সৌরভে বুক ভরে যেত। হাতে হাতে পুতুল দিতে পয়সা নিতে—কোমল স্পর্শ অনুভব করে উন্মনা হয়ে উঠত। রঘু ফিরত আশে পাশে।

নিরালা পেলেই জিজ্ঞাসা করত—চোখে ধরল কাউকে ?

হাসত মলিন। কিন্তু তার চোখ দেখে রঘু তার পাশে বসত।

—আমি তোর পাশে বসছি। পছন্দ হলে আমার হাত টিপে ইসারা দিবি।

—কি করবি ?

—সে রঘুর দল বুঝবে   তুলে নিয়ে আসব রাত্রে

—উঁহু।

—কেন ?

—জোর ক'রে তুলে আনলে মানুষের দেহটা আসে, মানুষটা আসে না।

তার কথা শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে রঘু বলত—তবে পাবি কি ক'রে শুনি ?

—পায়ে হেঁটে আসবে।

—তোর কাত্তিকের মত চেহারা দেখে ?

—নয়ই বা কেন ? তোরাই বা ছুটছিস কি দেখে ? তোরা বস্ না। ওরা আসুক।

—ভাগ্। তাই আসে ?

—আসে।

মলিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নির্বোধের মত চেয়ে থেকে সে বলত—শা—! অর্থহীন প্রলাপের মত বলে চলে যেত, আবার ঘুরে আসত। চেপে ব'সে বলত—এইবার ঠিক হয়েছে।

—কি ?

—বল কাকে পছন্দ, টিয়া ছুঁড়িটাকে লাগাব। সে গিয়ে বলবে। বাজি রাখছি, নিশ্চয় আসবে।

ভিক্ষুকের মেয়ে ভিক্ষুণী, বুড়ো গোপাল পটোর মেয়ে টিয়া। বয়স তখন এগার-বারো কি তের। গোপাল পটো ঘাটের পাশে ব'সে মন্দিরে বাজিয়ে ধরাগলায় গান গঙ্গা-মাহাত্ম্যের অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভের গান করত। টিয়া এবং টিয়ার একটা হাবা ছোট ভাই,

নাম ফড়িং, করত তার দোহারকি। ত্রিবেণীর কাছেই গ্রামে ওদের বাড়ী, সে বাড়ীতেও ভাঙা ঘর। তবু সন্ধ্যায় চলে যেত সেখানে, আবার সকালে উঠেই চলে আসত।

সেই বয়সেই টিয়া মেয়েটা পেকেছিল। মুখে কাপড় দিয়ে হাসত। বেঁকিয়ে কথা বলত। হেলে দুলে চলত। অনেক জনেই ওকে নিয়ে রহস্য করত। ইঙ্গিত ক'রে কথা বলত। টিয়া ঘাড় বেঁকিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে মৃদুস্বরে জবাবও দিত। হাটে ঘাটে বাজারে ভিক্ষে ক'রে ফিরে শুধু দীঘির জলই খায় নি, পঙ্ক-পল্বলের ঘাটের খবরও জেনেছে। টিয়া আবদার ক'রে কথা কইত, আজও কয়।

তোমার কাছে চাইব না তো, চাইব কার কাছে? তুমি আমার জীবনধন—শ্যামচাঁদ!

যে যেভাবে নেয় সে কথা। কথাগুলি ওদের সম্প্রদায়ের প্রাচীনকালের বুলি। আরও গাঢ়রসের বুলিও জানে টিয়া। বলে, মনের মধু পরান বঁধু। আমার ধন মান সব তোমার হাতে, পোড়া পেট মানে না, তাই তোমার কাছে হাত পাতি। রাঙা নয়, কালো হাত। সোনা চাইনা রূপা চাই না। তামার পয়সা।

আ মরে যাই। তোমার বালাই নিয়া আমার মরণ হোক!— এ কথাটা মুখে লেগে আছে। সামান্য কোন দুঃখের আভাস পেলে বলবেই।

এইসব জাত-বুলিগুলি টিয়ার মুখে পাখীর বুলির মতই মনে হত। পুরুষানুক্রমে শেখা কথা, বলতে হয়, বলে যায়। কিন্তু টিয়ার নিজের কথাও হয়েছে। আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলত—

পয়সা তোমরা দেবে না তো আমরা খাব কি। কিন্তু তুমি পাষাণ বটে। আমার মুখের দিকে তাকায়ে বল দেখি দিব না।

রঘুর মত তরুণ নাগরেরও অভাব নেই। দেশেও নাই, কালেও নাই। নানান ধরণের আছে। যার মনের প্রদীপে যেমন তেল-তেমনি আলোর ছটা, কালির ঘটা। রঘুর প্রদীপটি কেরোসিনের ডিবে, আলো যত লালচে তত তার কালি। সে সোজা ইঙ্গিত জানিয়ে কথা বলে হি হি করে হাসত; টিয়াও মুচকি হাসত। একদিনের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল মলিন। মেয়েটার হাত ধরেছিল রঘু। সে বলেছিল—ছাড় বাবু, ছাড়। তুমরা মানত করে পদ্মকলি গুলান পটপটিয়ে ছিঁড়ে ঠাকুরে পায়ে দাও। মাটির ঠাকুরের নাক নাই, চোখ নাই—সে তাই নেয়। কিন্তু তোমার তো চোখ আছে, নাক আছে, কলিটারে ফুটতে দাও তবে তুলিয়ো। বাস পাবে, চোখ জুড়াবে। হাত ছাড়। তুমি বরং বস, আমি তুমার চরণে হাত বুলায়ে দি।

ক্ষয়া চেহারা, মুখখানা শুধু টলটলে ছিল তখন। রঙটা ছিল চাপা, তার উপর যেন একটা ধূসরতার ছিলকে পড়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে মনে পড়ত, ত্রিবেণীর মজে যাওয়া যমুনার কথা, গ্রীষ্মকালের যমুনা। না। যমুনা নয়। যমুনা বোবা। মেয়েটা যেন বিশীর্ণা পাহাড়ী ঝর্ণার মুখের দিকটা; গা ভাসিয়ে স্নান দূরে থাক, হাঁটু ডোবে না, কিন্তু কলস্বরে তরঙ্গিনীর মতই মুখরা। মেয়েটা চলতও নেচে নেচে।

এই টিয়া। তা টিয়ার অসাধ্য কিছু ছিল না। তা' সে পারত। দূতীগিরি করবার যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু মলিন বলত—না। দেখি না, ভাগ্যে কি আছে। ভগবান এমন রূপ দিয়েছেন—সে

রূপে নিজে ভুলে যাকে চাইলাম সে যদি নাই-ই এল তবে রূপের দাম কি ?

—রূপের গরবেই গেলি।

—দেখি না !

॥ পাঁচ ॥

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে চারে পড়েছিল। এই ভাবেই কাটছিল রঘুর সঙ্গে। মদ খেয়ে মাতামাতি হাতাহাতি করে; হঠাৎ বিচ্ছেদ-ঘটানো বিরোধ হয়ে গেল। বিরোধ হল এই টিয়া মেয়েটাকে নিয়েই।

তার আগে প্রায় বৎসর খানেকের বেশী টিয়াকে আর দেখা যায়নি ত্রিবেণীর ঘাটে। গোপাল পটো হাবা ফড়িংয়ের হাত ধ'রেই ইদানীং আসত—ভাঙা গলায় গান গাইত। গঙ্গা মাহাত্ম্য। পীর মাহাত্ম্য। পটুয়ারা না হিন্দু, না মুসলমান। হাবা ফড়িং তার সঙ্গে সুর জুড়িয়ে গোপালের ভাঙা কণ্ঠের সুরকে বেসুরো ক'রে তুলত।

প্রথম প্রথম লোকে গোপালকে জিজ্ঞাসা করত।—টিয়া কই গোপাল ? সে আসে না কেন ?

গোপাল বলত—আর আনি না বাবা। ডাগর হল মেয়েটা। বিয়া-সাদী দিতে হবে। আর সঙ্গে আনলে মন্দ কইবে পাড়পড়শী। মেয়েটারে পাটকাম শিখতে দিছি আমার দিদির ঘরে। আমার গাঁ থেকে কোশখানেক দূরের গেরাম।

মেয়েকে পাঠিয়ে গোপালের কিন্তু সংকট এসেছিল জীবনে। ভিক্ষের পরিমাণ নিতান্তই কমে গিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে মলিনের

দোকানের সামনে ব'সে দুঃখ গাইত।—দিন আর চলছে না বাবা। সারাটা দিনে বাপ-বেটায় দশটা পয়সা। খাব কি? দুটা পেট!

গোপালের অভিপ্রায় মলিন বুঝত। কিন্তু ভিক্ষে সে নিজে করেনি—কেউ করলে তাকে তার ভাল লাগত না। ভিক্ষে সে দেয় না। ওই টিয়াও কোন দিন তার কাছে ভিক্ষে আদায় করতে পারেনি। রঘু কতদিন টিয়াকে বলেছে—ওই ওর কাছে যদি একটা পয়সা আদায় করতে পারিস তবে আমি দুটো পয়সা দোব। দুটো নয়, চারটে।

টিয়া প্রায় একটা বেলা তার শেখা সকল বুলি নিঃশেষে বলে হার মেনেছিল। কটাক্ষ, অভিমান, দীর্ঘশ্বাস, ছলাকলার যত অস্ত্র তার তূণে ছিল সব প্রয়োগ ক'রে অবশেষে—দূর বেরসিক, বলে উঠে চলে গিয়েছিল। হা হা ক'রে রঘু হেসে উঠে তাকে ডেকে বলেছিল—নিয়ে যা। পাঁচটা পয়সা আমার কাছে নিয়ে যা। ওর এক পয়সা, আমার চার পয়সা।

—না, আমি নিব না। আমি হারেছি। আমি নিব কেন? ভিখ মাগি, পয়সা নি, সে আলাদা কথা। ই আমি নিব না।

মলিন এবার বলেছিল—গান শোনা, পয়সা দেব।

—তবু ভাল। তাই শুন। গাইতে বসে গিয়েছিল মেয়েটা।

'ও নিঠুর কালিয়া, অবলায় দুখ দিলিরে নিঠুর কালিয়া।
সরম-সিন্দুর-কৌটা ভুলায়ে হ'রে নিলিরে, চতুর কালিয়া।
মরম-হরিণী মোর—
মন-বনে সুখে ভোর—
বাঁশুরীর সুরে তারে আনিয়া বাঁধিলিরে—কপট কালিয়া।'

গান শুনে মলিন তাকে পয়সা দিয়েছিল। একটা আনি।

আনিটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে সশব্দে চুম খেয়ে ছলকলা-পটিয়সী মেয়েটা বলেছিল—রাঙা হাতের আনি, আমার তেষ্টার পানি, ষোল আনির চেয়েও দামী।

একটা দো আনি ফেলে দিয়ে রঘু বলেছিল—আমারটা ?

— তুমারটা আমার মুখের পান, চুলের তেল, খোপার ফুল।

টিয়া অভাবে এ রোজগার গোপালের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোপাল দুঃখ গেয়ে বেড়াত। বেশী গাইত মলিনের কাছে। কে... গাইত সেই জানত। মলিন ভিক্ষে দেয় না, দিত না। এ সব সময় মলিন সেই পুরনো মলিন হয়ে যেত। চুপ ক'রে বসে থাকত আর অকারণে আগের মত ঘাড় দোলাত। গোপালের দুঃখ শুনে অস্বস্তি অনুভব করত।

গোপাল বলেছিল—কিছু দয়া কর না বাবা।

—না। স্পষ্ট বলে দিয়েছিল মলিন।

—কপাল! বুঝলা না বাবা!

—কপাল কিসের? খেটে খাও না কেন? খাট না আমার কাছে। এই তো মাটি কেটে আনবে; মাটি মাখবে। তোমরা পটুয়া, তোমরা তো জান এ সব কাজ। পুতুল শুকোবে, তুলবে ভাটায় পোড়াবার সময় বয়ে নিয়ে আসবে। কাজ কত রয়েছে। এ... তো আমার কাছে বারোমাস তিনটে ছোকরা খাটছে।

গোপাল কপালে হাত দিয়ে বলেছিল—তাই তো বললাম গো নসীব। পটুয়ার ছেলে হয়ে ই কামটা শিখি নাই। বাপ চাকর হয়েছিল মিয়াদের ঘরে। গরুর চিকিচ্ছা জানত, মিয়ারা গরুবাছুর দেখার কামে রেখে দিয়েছিল। বাঁধা মাইনে। মিয়াদের বাড়ীতে

হবে দিয়েছিল থাকতে। আমি হয়েছিলাম পেথমে গরুর রাখাল। তার পরেতে মাহিন্দার। শেষ যাখন মিয়ারা ধুয়া ধরলে কি ধরমে যাখন আমরা ইসলাম ত্যাখন নাম আমাদের ইসলামী নাম নিতে হবে, খাওয়া দাওয়া সব ইসলামী করতে হবে ত্যাখন নোকরী ছেড়ে পলায়ে এলাম। কিছুই শিখি নাই। ওই গান টান দু চার গান জানতাম, তাই গেয়ে ভিখ মাগি। তা' ই বয়সে আর কাম করতে লারব বাবা। আল্লা, সত্যপীর, গঙ্গা পতিতপাবনী!

বলে উঠে গিয়েছিল গোপাল।

এরই কিছু দিন পর। মাস চারেক। মাসখানেক গোপালও আসে নি।

হঠাৎ রঘু সেদিন এল---কালো মুখ তার থম থম করছে। চোখের চাউনিতে কি যেন একটা ঝকমকানি ঝকমক করছে। কথার সুরে রন রন করছে তার আমেজ --উঠে আয়!

কোথায়?

বসে বসে আপন মনে ছাঁচের ভিতরে নরুন দিয়ে খোদাই করছিল মলিন। কাজ করতে করতেই জবাব দিলে। রঘু লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে খপ ক'রে তার হাত চেপে ধরলে --আয় না। রাখ ওসব। তার পরই বললে কি পুতুল তৈরী করছিস? আয়, দেখবি আয়। কারিগরের কেরামতি দেখে যা। রঙ হবার আগে দেখছিলি—রঙ শেষ হয়েছে, দেখে যা কি হয়েছে!

-পুতুল? কোন পুতুল?

আয় না বাবা।

হন হন ক'রে তার হাত ধরে প্রায় টেনেই নিয়ে চলেছিল।

বাজার পার হয়ে বুড়ো কবরেজের কবরেজখানার সামনে হাজির হয়ে বলেছিল—দেখ!

রঘুর কথা সত্যি। তাই বটে। সদ্য রঙ-শেষ-হওয়া পুতুলই বটে। জীবন্ত পুতুল। টিয়া। সে-ই ক্ষয়া গড়ন, শীর্ণ শরীরে ধূসর মালিন্যের যে একটি আবরণ ছিল তার আর চিহ্ন নাই। বাতাসে-উড়িয়ে-দেওয়া আগুনের উপরের ছাইয়ের মত উড়ে গিয়েছে। দেহের পরিপূর্ণতায় সে টলমল করছে, বর্ণের উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে। চোখ দুটিতে কৌতুক নাচছে, তবু যেন কিসের ভারে ঈষৎ ভারী হয়েছে চোখের পাতা দুটি। চোখের ক্ষেত আরও সাদা দেখাচ্ছে, গাঢ় কাল দেখাচ্ছে তারা দুটি। চুলগুলি কি চিকন কালো হয়েছে! সে পিঙ্গলাভার এতটুকু চিহ্ন নাই। এবং এত বেড়েছে চুল! এক বছর ধরে কারিগর কি তুলিই না চালিয়েছে! সত্যি বলেছে রঘু, বলিহারি কারিগর!

মুখ ভরে হাসলে টিয়া।

—ভাল আছ মোহন কারিগর?

—মধ্যে মধ্যে ওই নামেই ডাকত সে মলিনকে। মলিন উত্তর দেবার পূর্বেই সে আবার বললে—বাবার ব্যামো। কবরেজ দেখাতে এনেছি।

গরুর গাড়িতে গোপালকে এনেছে। সঙ্গে ভাইটাও এসেছে। গোপাল চোখ বুজে পড়ে আছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া হয়েছে। হাবা ফড়িংয়ের উপর ভরসা করতে পারে নি টিয়া, নিজে এসেছে সঙ্গে।

রঘু-দস্যি ত্রিবেণীতে দণ্ডমুণ্ডের শাসন কর্তা, কালভৈরব। সে

এগিয়ে গিয়ে বললে—কারিগরের কাছে বাবার অসুখের খরচটা আদায় কর।

টিয়া বাপের অসুখের ভাবনার মধ্যেও কৌতুকে হেসে উঠল, টিয়া সেই টিয়াই আছে। চোখ ঘুরিয়ে বললে—করব না? নিশ্চয় করব। মোহন কারিগর এমন সোনার টিয়ার দুখে দুখ মানবে না—তাই হয়? কি গো কারিগর?

মলিন চুপ করে রইল। ভাবছিল, টিয়ার ছাঁচ তুললে কেমন হয়?

টিয়া আগের মতই আঁচল উড়িয়ে এগিয়ে এল এবং আদর জানিয়ে মৃদুস্বরে বললে—কথা কও মোহন কারিগর। মনের মধু পরান বঁধু!

মলিন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—উহুঁ। তোর বাবা যদি মরে তো ঘাটের খরচ কি গোরের খরচের সময় আসিস, দেব! বাপকে বাঁচিয়ে করবি কি? মরলে ও খালাস পাবে। তোর পথেরও কাঁটা ঘুচবে।

চলে এসেছিল মলিন। কিন্তু বুকের মধ্যে আবার তুফান উঠেছিল। যেমন তুফান উঠেছিল নবদ্বীপে ভুবন পালের গড়া পুতুল দেখে। কিন্তু তবু যেন তার মধ্যে একটা অস্বস্তি ছিল। মেয়েটার রঙ আছে, রস আছে, গান আছে, কিন্তু সে গন্ধ নেই। আর যেন কি নাই। ভুবন পালের গল্প মনে পড়ছে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াত, পায়ের শব্দ শুনতে পেত না, চুলের গন্ধে বুঝতে পারত। সে মিষ্টি করে বলত—ভাল আছেন! অসুখের সময় কপালে জলপট্টি দিয়ে দিত। তাকে ডাকলে পাওয়া যায় না। তাকে ডাকতে হয় উপরের দিকে মুখ তুলে। এ ডাকলেই আসে!

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে সে অবাক হয়ে গেল। দাওয়ার ওপর রঘু-দস্যির একজন চেলা বসে আছে। তার নিজের মাইনে করা ছোকরা দুটো নাই। রঘুর চেলা বললে—রঘুদা তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে।

—কেন?

এই চাবি নিয়ে ঘর খুলে দেখ।

মলিনের নিজের তালাটা ভাঙা পড়ে আছে। তার জায়গায় নতুন তালা ঝুলছে। সে প্রশ্ন করলে—এ তালা? আমার তালা কে ভাঙলে?

—রঘুদা। চাবী নাও। কিন্তু খুব সাবধান। রঘুদা চন্দননগর গিয়েছে মদ আনতে। আমি নৌকা ঠিক করতে চললাম। বলেই সে চলে গেল।

তালা খুলে সে চমকে উঠল। মুখে-কাপড়-বাঁধা হাত-পা-বাঁধা টিয়া পড়ে আছে। বুঝলে রঘু এনেছে। কিন্তু হাত-পা-বাঁধা কেন? খুলে দিলে মুখ। টিয়া মুহূর্তে কেঁদে উঠল—আমারে ছেড়্যা দাও কারিগর।

—এলি কেন?

—রঘুবাবু জোর করে এনেছে গো!

—জোর করে?

—হ্যাঁ। কাল আমারে বুলেছিল—বাবার চিকিৎসার লেগ্যা চাঁদা ক'রে টাকা তুলে দিবে। তুমি চলে এলে তখুন রঘুবাবু কইলো। আমি বুলে ছিলাম—টাকার কি হবে বাবু? আমি জানতাম—আমি টাকা চাইলে রঘুবাবু তুলে দিবে। রঘুবাবু বুলেছিল—কাল আসিস। দিব তুলে টাকা। সেই ভরসায়

এসেছিলাম। ইটা ভাবতে পারি নাই। ভেবেছিলাম—হেসে কথায় রঙ্গরস ক'রে যেমন ভুলায়ে চলে আসি তাই আসব।

—নিজের চেহারা দেখিস নি আয়নায় কি পুকুরের জলে ?

রাঙা হয়ে উঠেছিল মেয়েটার মুখ। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বোধ হয় নিজেকে সম্বরণ ক'রে বলেছিল—নিজেরে আমি বেশী চতুর ভেবেছিলাম কারিগর !

—চাতুরী করতে গিয়ে হারলে তার মাশুল লাগে। তাই দিবি।

—না। না—গো। না। আল্লার কাছে, ভগবানের কাছে, মা গঙ্গার কাছে কি জবাব দিব আমি ! ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে মেয়েটা।

—মানিস ওসব ? তবে ডাক তা দিগে, তারাই তোকে রাখুক।

এবার ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটা—আমার যে সাদী হবে ; আমি তারে কি কইব ? তারে যে আমি ভালবাসি।

—কে রে সে ?

—আমাদের জাতের পাটোর ছেলে। ভারী ভাল লোক। আমারে ছেড়ে দাও কারিগর, আমারে বাঁচাও।

—যাঃ। হাত পা খুলে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল মলিন।

শুধু ছেড়েই দেয় নি, ত্রিবেণী পার করে খানিকটা দূর পর্যন্ত দাঁড়িয়েও দিয়ে এসেছিল।

রঘু ফিরে শূন্য খাঁচা দেখে ক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। হয়তো তখনই একটা কিছু হয়ে যেত। কিন্তু চন্দননগর থেকে ফেরার পথে মদ্যপান ক'রে সে এমনই মাতাল হয়েছিল যে মারামারি করবার

ক্ষমতা আর তার তখন ছিল না। উদ্যোগ পর্বে দাপাদাপি করতে গিয়েই পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মলিন তাকে তুলে ঘরে তার বিছানায় শুইয়ে অনেক শুশ্রূষা করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। যতক্ষণ শক্তি ছিল ততক্ষণ রঘু কুৎসিৎ ভাষায় তাকে গালাগালি ক'রেছিল। কোনও বাদ প্রতিবাদ করে নি মলিন। সকালে জ্ঞান হয়ে উঠে রঘু মাথা ধরে চুপ ক'রে বসে ছিল। মলিন সরবং করে এনে সামনে ধ'রে বলেছিল—খা।

—না। হাতের ঝটকা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল গেলাসটা।—হারামী বেইমান কোথাকার!

হেসে মলিন বলেছিল— আমার ঘরে এনেছিলি কেন?

—তোর ঘরে আর কখনও আসব না।

উঠে পড়েছিল রঘু।

—মিতে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে রঘু বলেছিল—আজ থেকে ফারখৎ। আমি তোর দুশমন—আজ থেকে জেনে রাখিস। মরদের বাচ্চা যদি হস সামলাস।

নিদারুণ জ্বালাকর কোন রসায়ন-মাখানো একটা তীর যেন সশব্দে তার বুকে বিঁধেছিল। "মরদের বাচ্চা যদি হস তবে সামলাস"। মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠেছিল মলিন।

—তোর বাস ওঠাব এখান থেকে। তবে আমার নাম রঘু।

—আমি উঠেই যাব মিতে।

—উঠে যাবার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া যদি না করে যাস তবে জানব তুই এক বাপের বেটা নস।

—রঘু! চীৎকার করে উঠেছিল মলিন!

রঘু ততক্ষণে চলে গিয়েছে বাড়ির বাইরে। ওই চীৎকারে ক্রুদ্ধ পশুর মত আবার ঘুরে এসে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল—তোর জান নোব আমি। হাঁ!

মলিন বলেছিল—দেখা যাবে।

এরপর মলিন দিন কয়েকের জন্যে সেই ছেলেবেলার মলিন হয়ে গিয়েছিল। নীরব অস্থিরভাবে অকারণে ঘাড় দোলাত যে মলিন, যে মলিন সদর পথে হাঁটত না, মনের কাজটি করে যেত, কারও কথা শুনত না যে মলিন, সেই মলিন।

চন্দননগরে সমস্ত ব্যবস্থা করে, যাবার দিন রাত্রি ন-টার পর সে নির্জন পথের একটা জায়গায় প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। রঘু-দস্যি এই পথে ফিরবে। একটা মেয়ের বাড়ী থেকে সে এই পথেই ফেরে। রঘু এ ক'দিনে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। মলিনের সঙ্গে কলহের জন্য অনুতাপ না হোক মনে মনে বেদনা অনুভব করেছিল। ভাবছিল—একটা মিটমাট করে নেবে। কিন্তু রঘু সেই জাতের মানুষ যারা নিজে এগিয়ে গিয়ে মেটাতে পারে না। নইলে মিটে যেত এতদিন।

না। মিটত না। মলিন মেটাত না। তার রক্ত বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল রঘুর সেদিনকার তীরে। তা ছাড়া ওর রক্তের মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে যার জন্যে ওর সংকল্প কখনও শিথিল হয় না। ও ভুলতে কিছু পারে না। সব চেয়ে আক্রোশ ছিল ওর নিজের মায়ের উপর। মা ম'রে তাকে রেহাই দিয়ে গেছে। সেও গঙ্গাস্নান করে রেহাই পেয়েছে। আরও অনেক লোকের উপর তার আক্রোশ আছে। দেবীগ্রামের বাবুদের উপর, সেটা অনেকটা কমে গিয়েছে। হ্যাঁ, কমে গিয়েছে। পূজারী অনন্ত ঠাকুরের উপর, নবদ্বীপের ছোট

পালের উপর, বর্দ্ধমানের রাজার আমলাদের উপর। ভুলতে সে পারে নি। রঘুর সঙ্গে মিতালি ঘুচে গিয়েছে, রঘু নিজেই ঘুচিয়েছে—তার উপর কঠিন আক্রোশ মলিন ভুলতে পারত না।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি মলিনকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরমানন্দে গান করতে করতে ফিরছিল রঘু। মলিন তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দাঁড়া।

—কে? ও, মিতে! রঘু সুযোগটা ছাড়ে নি।

—মিতে নয়। তুই নিজে বলেছিস দুশমন।

—ভাল। তাই। রঘু সোজা হয়ে খুঁট নিয়ে দাঁড়িয়েছিল; মহিষের চাউনির মত সেই চাউনি ফুটে উঠেছিল তার চোখে।—কি চাস বল?

—যাবার আগে দেখা করে যেতে বলেছিলি। বলেছিলি—তা যদি না করি তবে আমি—।

—হাঁ। তা আয়, হোক বোঝাপড়া।

তারপর নিঃশব্দে লেগেছিল লড়াই। রঘু ভাবতে পারেনি, মলিন নিজেও ভাবেনি যে এত শীঘ্র রঘু পড়ে যাবে। কিন্তু ঘুঁষিটা মারাত্মক হয়েছিল, উপরের ঠোঁটখানা কেটে দু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, গলগল করে রক্ত বেরিয়েছিল, সেই রক্তের স্পর্শের উষ্ণতায় রঘু ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হয়েছিল, সেই সুযোগে মলিন তার পেটে মেরেছিল লাথি। একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে পেটে হাত চেপে ধ'রে কুঁজো হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়েছিল রঘু, তারপর আর পারেনি; অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

ঝুঁকে ডেকে বলেছিল মলিন—আমি চন্দননগরে থাকব। বোঝাপড়া আবারও যদি করতে চাস তো যাস।

বলেই সে চলে এসেছিল চন্দননগর। রাত্রিটা অপেক্ষা করেছিল চন্দননগরের বাইরে। সকাল বেলা শহরে এসে ভাড়া করা বাসার দরজা খুলে ঢুকে বিছানা পেতে সারাটা দিন ঘুমিয়েছিল। পরের দিন থেকে সে আরম্ভ করেছিল কারবার।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ এসে হাজির হল টিয়া। বৈশাখ মাস তখন। দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। সমস্ত পথ জনহীন; পথের ধারে দোকানগুলোর দরজা আধখানা বন্ধ। দোকানে বসে দোকানীরা ঝিমুচ্ছে। নিজের দোকানে বসে মলিন স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে চেয়েছিল দুপুরের রোদের দিকে। মনে পড়ছিল বর্দ্ধমানের গোলাপবাগের কথা। চন্দননগরের ভিতরে "দ"এর মত বাঁকা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটার যেখানে মাঝের বাঁক, যেখান থেকে লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারের পথটা এসে গঙ্গার ঘাটের পথে মিশেছে—প্রায় সেইখানে মলিনের বাসা। একটা গোটা বাড়ীই সে নিয়েছে। ভিতরে ভাটা করবে। পুতুল পোড়াবে। এইখান থেকেই উত্তর দিকে গরীবের পাড়া। মলিন আধ-তন্দ্রায় ঢুলছিল; আর গোলাপবাগের কথা ভাবছিল। হঠাৎ টিয়া এসে হাজির হল। পরিপুষ্ট মুখখানা দুপুরের রোদে রাঙা টকটকে দেখাচ্ছিল। ডাকলে—

—মোহন! মোহন কারিগর!

চমকে উঠেছিল মলিন।—কে?

—আমি। টিয়া গো সোনা।

তারপরই বলেছিল—আঃ, চাঁদমুখ দেখে জীউটা আমার জুড়াল আজ!

তার রোগা বাপ গোপালের নিউমোনিয়া সেরেছে, তাকে আর

ফড়িংকে নিয়ে চন্দননগরে এসেছে গোপাল। এখন খুঁজে খুঁজে এসেছে তার কাছে।

মলিন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল।

ফিক ক'রে হেসে টিয়া বলেছিল—অবাক হয়ে গেলে কারিগর আমাকে দেখ্যা ?

—কোথায় রয়েছিস এখানে ?

—গাছের তলায়। তোমার সোনার টিয়াকে ধরার লেগে চারিপাশে ব্যাধ জমেছে। টিয়া উড়ে এসেছে তুমার কাছে।

—কিন্তু কি জন্যে এলি দেশ ছেড়ে ?

—বাঁচবার লেগে, তুমার লেগে। শুনলাম তুমি হেথা এসেছ। হোথা গেরামে রঘুবাবুর দল ঘুরে বেড়াতে লাগল। বলে ফাঁক পেলেই তুল্যা নিয়া যাবে আমাকে। শুনলাম তুমি তার ঠোঁট ছ'ফাঁক ক'রে দিয়ে হেথা এসেছ। আর ভরসা করতে পারলাম না কারিগর, বাবাকে আর ফড়িংকে নিয়ে হেথা চলে এলাম। তুমার ভরসায় মোহন! মনমোহন! মনের মধু! ঠাঁই দাও।

—না। ঠাঁই আমার নাই। ঘাড় নেড়ে বললে মলিন।

ঠাঁই দেবে ওই ঘাটের মড়াকে, ওই হাবাকে, এই ছলাকলাময়ী মেয়েটাকে ? তার দোকানের সামনেই সাজানো ছিল সেই ব্যাণ্ডেলের গির্জের পুতুলটি। সেই দিকে চেয়ে রইলো মলিন। এখানকার ফরাসী সাহেব-মেম ক'দিনই এসে দেখে গেছে পুতুলটা। কিনতেও চেয়েছে। সে দেয়নি। বলেছে—আর একটা না গড়ে সে দেবে না। তার দোকানের শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। এখানকার গির্জে দেখে আর একটা গির্জে গড়বে সে। আর ওই ষ্ট্রাণ্ডের উপর ডুপ্লে সাহেবের মূর্তি আছে, তাও গড়বে। আরও অনেক

গড়বে। দোকানে কাচের আলমারি করবে। রঙে-রঙে মূর্তিতে মূর্তিতে ভরে দেবে। ওই ঘাটের মড়াটা তার গোটা বাড়ীটা কুশ্রী ক'রে দেবে। না। তার অনেক সাধ। সে অনেক পুতুল গড়বে। কৃষ্ণনগরের যোগেশ পালের চেয়েও খাতির হবে তার। ঘর করবে বাড়ী করবে। সে বাড়ীর ভিতরটা কেশতেলের সুবাসে ভরে থাকবে!

—মোহন! মেয়েটা নাছোড়বান্দা। কিন্তু মেয়েটা চোখে যেন কি মাখিয়েছে। রঙ নয়, কাজল নয়, সুর্মা নয়, নেশা। গলার স্বরটা কেমন করে এনেছে, এও নেশার মত।

—আমি ফিরব না মোহন। আমি ফিরবার তরে আসি নাই।

মলিন কোন কথা না বলে উঠে দোকানের দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অনেকগুলি কনে পুতুল সাজানো ছিল চাটের উপর। রঙ দেওয়া হয় নি। তুলি নিয়ে রঙ দিতে বসল। হঠাৎ ঘরের উঠানে কি একটা পড়ল। শব্দ উঠল। মলিন উঠে উঠানে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেল। টিয়া। গঙ্গার ধারের দিকের পাচীলে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়েছে! হাসছে সে। হাসতে হাসতে বলেছিল—আমি মিছা বলি নাই, কারিগর, ফিরব বলে আমি আসি নাই। চরণে আমাকে ঠাঁই দাও মোহন। আমি আর ভিক মেগে বেড়াব না। কারু সঙ্গে হেসে কথা কইব না। তুমি আমাকে বাঁচায়েছ; তুমি নইলে কার পায়ে নিজেকে দিব আমি? যার সাথে সাদীর কথা হয়েছিল তার দিকে আর আমি তাকাতে পারি না। পরান আমার ধূ-ধূ করে ওঠে।

বৈশাখের রৌদ্রেও কি নেশা লেগেছে? লাগবে কি, নেশাই একটা আছে, বৈশাখী রৌদ্রেরও একটা নেশা আছে। কৃষ্ণপক্ষের

স্তব্ধ দুপুররাতের যেমন একটা নেশা আছে, পূর্ণিমা চতুর্দশীর প্রথম রাত্রে লালচে গোল চাঁদ যখন সবে দিগন্তের মাথায় ওঠে তখন যেমন একটা নেশা জাগে, বৈশাখের দুপুরেরও তেমনি একটা নেশা আছে। মলিনের মনে পড়ল দেবীপুরের প্রান্তরে বাগানে বৈশাখের দুপুরে মহুয়াগাছের মাথায় মৌমাছির ডাক। কানের পাশে নেশায় বুঁদ হয়ে তারা গান করে, সে বৈশাখের দুপুরের নেশা। আজ যেন তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ডাকছে! ঝঙ্কার উঠছে! পৃথিবী ঘুমিয়ে গেছে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুছে যাচ্ছে, মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে! সত্য শুধু সে আর টিয়া! সে আর টিয়া! টিয়ার গালদুটো রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে! অদৃশ্য কারিগর ওর মুখে সিঁদুরের ছিটে মেরে তুলি দিয়ে ঘষছে! কি সুন্দর!

টিয়া তখনও বলে যাচ্ছিল—কারিগর, সব হারায়ে মানুষ বাঁচে, আবার হয়, ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা যায় আবার হয় কিন্তু মন হারালে আর ফিরে পায় না মোহন। আমি সেই মন হারায়েছি তুমার পায়ে। রঘু-দস্যি আমাকে বেঁধে ঘরে ভরেছিল। জোর করে আমার ইজ্জৎ লিত—দেহটাকে তছনছ করে দিত ডাকাতের মতন। মোহন—ভিখিরীর মেয়ে আমি, হাসি-কথায় লোকের মন ভুলায়ে পয়সা রোজকার ক'রে খেয়ে বাঁচি, আমার আধা ইজ্জত তো আমি নিজেই বিলায়ে দিছি। জাতে আমাদের পতিন করেছে। রঘু-দস্যির দস্যিপনাকে আমার ডর লেগেছিল কারিগর, সে আমারে কাঙাল করত, কিন্তু পরান নিতে পারত না। কাঙালকে কি কাঙাল করা যায় মোহন। ধূলা কাঙালের গায়ের ভূষণ। সেই ধূলা বড় জোর বেশী ক'রে মাখাত। ঝেড়ে নিতাম, মুছে নিতাম, মা গঙ্গার জলে চান করে ধুয়ে নিতাম। বলতাম, পতিতপাবুনী,

এ ধূলা আমি মাখি নাই, দস্যিতে মাখায়েছে ; তুমি ধুয়ে নাও, শুদ্ধ কর আমাকে। কিন্তু তুমি আমারে মুক্ত করলে, তিরপিনি পার ক'রে মাঠের পথে এগিয়ে দিলে, আমাকে ছুঁলে না। কারিগর, কেঁদেছিলাম আমি ছলা ক'রে, ভেবেছিলাম তুমি হয়তো দস্যিকে ফাঁকি দিয়া আমাকে নিয়া পালাবে! তা পালালে না। আমি মাঠের পথে ছুটেছিলাম হাসতে হাসতে ; ভেবেছিলাম ছলেচি তুমাকে। হঠাৎ হাসি আমার ফুরায়ে গেল, যেন পিদীমের আলো দপ ক'রে নিভায়ে গেল। দেখলাম, পিদীমের তেল তোমার চরণে উল্টায়ে ঢেলে দিয়ে এসেছি। মনটা আমার পরাণের মধ্যে নাই। খাঁ খাঁ করছে, পরাণ-পুরী আঁধার, পরাণ-পুরী নিঝ্যুম। মোহন কারিগর, তুমাকে নইলে আমি মরা। মরাকে তুমি বাঁচাও।

টিয়া সেদিন কথা বলেছিল—যেন গান করেছিল। বেদিনী যেমন সাপকে মোহিত ক'রে বিচিত্র সুরে গান করে, তুমড়ী বাঁশী বাজায় তেমনি ভাবে। গভীর রাত্রে কাক জ্যোৎস্নার ছটা যেমন ভোরের কুহক জাগায় তেমনি একটা ছটা টিয়ার মুখে চোখে জেগে উঠেছিল। বৈশাখে মধ্যাহ্নে সূর্যের রৌদ্র মাথায় করে দাঁড়িয়েও মলিন উত্তাপ অনুভব করতে পারে নি। টিয়াও তপ্ত মাটির উপর পড়ে ছুটি হাতের উপর ভর দিয়ে কথা বলছিল, সেও বুঝতে পারছিল না উত্তাপ। কোন শব্দ না, মানুষের সাড়া না, বাড়ীর পাশেই গঙ্গা, গঙ্গার কলকল, ছলছল শব্দ, তাও না। শুধু টিয়ার কথা। বেদেনীর গানের মত গান। আর পাচ্ছিল একটা গন্ধ। টিয়ার গায়ের গন্ধ। সে গন্ধ মিষ্টি নয় মধুর নয়, তাতে কেশ-বিলাসের বাস-তেলের গন্ধ নাই ; তাতে যেন—যেন কিসের গন্ধ! মাদকের গন্ধ। চন্দননগরের উগ্র মদের গন্ধের মত। একটা উত্তাল আবেগ বর্ষার

গঙ্গার অমাবস্যার জোয়ারের মত কলরোল তুলে চারহাত উঁচু হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল তার সর্বাঙ্গে। এগিয়ে গিয়েছিল সে। অস্ফুট স্বরে ডেকেছিল—টিয়া। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল, কাঁপছিল সেখানা। তার জীবনের সাধের, সংকল্পের সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে ছুটেছিল বাসনার বন্যা গঙ্গার বন্যার মত। টিয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তাতে বর্ষার ঝড় জলের মত।

—মোহন।

—টিয়া! শুধু তুই আর আমি। তোর রোগা বাবা নয়, হাবা ভাই নয়। না। তুই, শুধু তুই।

উন্মত্ত আবেগে টিয়া তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।—তাই হবে মোহন। পরান বঁধু মনের মধু মোহন কারিগর!

সে আজ ছ মাসের কথা।

ছ মাস সে টিয়াকে নিয়ে প্রায় উন্মত্ত হয়ে আছে। ভুলে গিয়েছে, সব ভুলে গিয়েছে। মায়ের কথা ভুলেছে, দিদির কথা ভুলেছে, বাবুদের বাড়ীর মেয়েগুলির কথা ভুলেছে, অনন্তঠাকুর, যোগেশ পাল, নবদ্বীপ, ভুবন পাল, ছোট পাল, গোপেশ্বর, এমন কি ভুবন পালের গড়া পুতুলটার কথাও আর তার মনে পড়ে না। তার কনে পুতুলের ছাঁচটা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। কি যে করলে, কোথায় রাখলে সে তা তার মনে নেই। মনেও করতে পারে না। ভাবেও না খুব।

টিয়া আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বলিহারি সুমোহন কারিগর,—টিয়া তাকে বলে মোহন কারিগর—টিয়াকে গড়েছে যে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তার অপরূপ তুলি আজও চালাচ্ছে তার সারা অঙ্গে, তার নাম সে দিয়েছে সুমোহন কারিগর। তাকে সে বলিহারি দেয়,

বাহবা দেয়! টিয়া যখন চান করে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফেরে তখন সব চেয়ে ভালো লাগে তার জলে-ভেজা পায়ের পাতা দুখানি। ধব ধব করে—যেন শ্বেতপাথরের গড়া মনে হয়। সে মদ খায়, ভাল মদ। টিয়া পরম যত্নে উপচার সাজিয়ে দেয়। তার চোখ রাঙা হয়ে আসে, টিয়া হাসে। সে হাসিতে মদের চেয়েও মাদকতা।

দুর্যোগ রাত্রির অন্ধকার যেমন ক'রে সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে আত্মসাৎ করে তেমনি ভাবেই সে টিয়াকে আত্মসাৎ করে; বৈশাখের দুপুরের রৌদ্র যেমন পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুকে শোষণ করে তেমনি করেই টিয়াকে শোষণ করে সে।

টিয়ার বাবা টিয়ার ভাই থাকত গঙ্গার ধারে একটা ভাঙা চালায়। গোপাল দাস এসেছিল একবার। টিয়া এসে আর ফেরে নি। তাই খোঁজ করতে এসেছিল। টিয়া তাকে বলে দিয়েছিল—সে যাবে না। তাকে ভিক্ষে ক'রে আর খাওয়াতেও পারবে না। যা পেরেছে এতদিন করেছে। আর না। এক কারিগর ছাড়া দুনিয়ায় কারও সঙ্গে টিয়ার আর কোন সম্বন্ধ নেই!

টিয়ার বাবা নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। দুনিয়ায় কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করে নাই। হাবা ছেলে ফড়িংয়ের কাছে পর্যন্ত না। মলিনই ফড়িংকে ডেকে তার কাজে লাগিয়েছিল। মাইনে দিত তাকে খেতে দিত। কিন্তু বাড়িতে থাকতে দিত না।

ফড়িং সন্ধ্যের সময় একটা গামছায় খাবার বেঁধে নিয়ে চলে যেত বাবার কাছে।

কাল টিয়ার বাবা মরেছে।

টিয়া তাই কাঁদছে।

মলিন বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সে বললে—কান্না! কান্না আমার

ভাল লাগে না, তুই কাঁদিস নে টিয়া। কান্না আমি সইতে পারি না, আমার মা মরেছিল—আমি কাঁদি নি। কাঁদতে আমি নিজে পারি না ; কেউ কাঁদলে আমার ভাল লাগে না। কাঁদিস নে! কাঁদবি তো ওঘরে যা।

টিয়া উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছিল। সে উঠে পাশের ঘরেই চলে গেল।

মলিন উঠে এসে দোকানে বসল। কান্না তার ভাল লাগে না। হঠাৎ মনে হল, টিয়াকেও তার ভাল লাগে না।

না। লাগে না।—অস্থির ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে লাগল সে। না লাগে না কথাটা হঠাৎ যেন গর্তের সাপের মত বের হয়ে পড়ল।

চতুর্থ পর্ব

॥ এক ॥

মানুষের মনের মধ্যে বোধ হয় একটা সাপ আছে। অন্তত মলিনের মনের মধ্যে আছে। মনের মন। অন্তরের অন্তর। কখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকে। ঘুম ভাঙলে গর্তের মধ্যে পাক খায়; অসহ্য গুমোটে অকস্মাৎ বের হয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না রাত্রের ঠাণ্ডায় আরামে পড়ে থাকে। কখনও ফণা তুলে দোলে। আহত হলে সরোষে ফণা তুলে গর্জন করে। হার সে মানে না, মানতে জানে না।

চন্দননগরে সেদিন টিয়াকে যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো গর্তের সাপের মত বের হয়ে পড়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে মনের সাপটাই যেন বেরিয়ে পড়েছিল। অসহ্য গুমোটে ঘুম ভাঙা সাপ!

টিয়া ভাল লাগে না, চন্দননগর ভাল লাগে না। না, ভাল লাগে না।

*　　　*　　　*

এর আট বছর পর।

আট বছর পর আহত হয়ে সেই সাপটা আবার গর্জন ক'রে ফণা তুলে দাঁড়াল। মলিন আহতফণা সাপের মত কপালে ক্ষত চিহ্ন, মাথার বিপর্যস্ত চুল নিয়েই মাথা তুলে দৃঢ়স্বরে বললে—না, কোন অন্যায় আমি করি নি!

আশ্চর্য! মলিনকে সে মলিন বলে আর চেনা যায় না! এ মলিনের মধ্যে দেবীগ্রামের সেই গ্রাম্য ছেলেটির কোন চিহ্নের এক

বিন্দু অবশেষ নেই। এ মলিন রূপে, মার্জনায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে, ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় সোজাগড়নের তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল শানিত। জীবনে খোলসের পর খোলস ছেড়ে ছেড়ে এক অপরূপ রূপে সে ফুটে উঠেছে। অথবা দেবীপুরে বিড়ালের বাচ্চার চেহারা নিয়ে যে ঘুরে বেড়াত সে পালিয়ে বনে গিয়ে কোন মায়া সরোবরে স্নান করে জোয়ান বাঘের চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

আহত সাপের মতই ফণা তুলে গর্জন করে উঠল মলিন—না কোন অন্যায় আমি করি নি!

পাঁচ ছ' জন লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার সেই বাল্যকালের স্বভাবের মত অল্প দুলে দুলে ঘাড় নাড়তে নাড়তে দৃঢ়স্বরে বললে ওই কথা।—ভাল লেগেছে, ভালবেসেছি! ওকে বিয়ে করেছি আমি।

সামনে দাঁড়িয়েছিল একটি আর্ত-মুখ মেয়ে!

আট বছর পরের কথা।

কলকাতায় চিৎপুর রাস্তার পাশে বস্তীতে খাল এবং গঙ্গার ধারের এলাকার মধ্যে। কাছেই খালের উপর কাশীপুর ব্রিজ। পাঁচ ছ' জন লোক মলিনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বৃদ্ধ তাদের মধ্যে। তাদের চোখে মুখে নিষ্ঠুর ক্রোধ ফুটে উঠেছে। মলিন বলছে—না, কোন অন্যায় আমি করি নি।

চন্দননগর থেকে কয়েক বছর আগে সে কলকাতায় এসেছে। হঠাৎ সেদিন যেন শীত শেষে ঘুম ভেঙে মনের সাপটা অনুভব করেছিল টিয়ার সঙ্গের মধ্যে তার অঙ্গের মধ্যে অতৃপ্তির পীড়ন, চন্দননগরের আশ্রয়ের মধ্যে সংকীর্ণতার অস্বাচ্ছন্দ্য, গুমোটের

অস্বস্তি। সাপটা সেদিন চলতে চেয়েছিল প্রশস্ততর সুন্দরতর আশ্রয়ের সন্ধানে—প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করে। মলিন দাস নয়, মলিন রায়। জাতিতে ব্রাহ্মণ। চন্দননগর থেকে আসবার আগেই সে গলায় পৈতে নিয়েছে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কাউকে প্রতারণার জন্য নয়, কোন সুবিধা পাবে বলেও নয়, ভাল লেগেছিল বলে নিজের সবল প্রশস্ত গৌরবর্ণ বুকের দিকে তাকিয়ে দেখে—তার কি মনে হয়েছিল—একগাছা পৈতে তৈরী করে প'রে নিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল, এই তো! এই তো—এইটি নইলে ঠিক যেন তাকে মানাচ্ছিল না। এইবার ঠিক হয়েছে।

এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। টিয়াকে বিদায় ক'রে দিয়ে মলিন একাই এসেছিল। সঙ্গে শুধু ফড়িং। ওই সেই যে হঠাৎ সেদিন সে অনুভব করেছিল যে টিয়াকেই তার ভাল লাগে না—সে আর মিথ্যে হয় নি কোনদিন। রাত্রিবেলা মদ্যপানে অচেতন মানুষের নেশা কাটার মুহূর্তটি এবং সূর্যোদয়ের মুহূর্তটি এক হ'লে মনটা যেমন চমকে ওঠে, বুকের ভিতর থেকে সমস্ত মুখটা যেমন বিস্বাদ ঠেকে, নিজের গায়ের গন্ধ, নিশ্বাসের গন্ধ পর্যন্ত যেমন অসহনীয় ঠেকে—তেমনি অবস্থা হয়েছিল সেদিন তার। টিয়ার গায়ের গন্ধ আর তার সহ্য হয় নি। টিয়া কেঁদেছিল। কান্না সে কোনদিনই ভালবাসে না, নিজে সে কোন দিন কাঁদে না, টিয়ার কান্নাও তার ভাল লাগে নি। কিন্তু এর পর টিয়ার হাসিও আর ভাল লাগল না; টিয়ার গান, টিয়ার সেবা, টিয়ার আনুগত্য, টিয়ার রূপ, টিয়ার টিয়াপাখীর মত কলকলানি কিছুই ভাল লাগল না। চন্দননগরও অসহ্য মনে হ'ল। বড় সংকীর্ণ। বড় ছোট।

বিস্বাদ হয়ে উঠল দিন রাত্রি, বিতৃষ্ণা ধরে গেল সব কিছুতে।

রাগ হতে লাগল তার নিজের ওপর। জীবনের স্বাদ সে নিজেই হারিয়েছে, তৃষ্ণা সে নিজেই ঘুচিয়েছে। টিয়ার দোষ কি? টিয়ার উপর রাগ সে করলে না, কিন্তু টিয়ার প্রতি তৃষ্ণার অভাবের সত্যটা চেহারা পড়ল অবহেলায়। সে অবহেলা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত কিছুর উপর, টিয়া, পুতুল, দোকান, চন্দননগর—এমন কি নিজের উপর পর্যন্ত। কয়েকদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত স্তব্ধ হয়ে শুধু বসেই রইল। বসেই রইল। নিজেই ঠিক বুঝতে পারত না। খরিদ্দার নাই; স্তব্ধ দুপুর;—চন্দননগরের বাতাস গুমোটে অসহ্য বলে মনে হত।

কয়েকদিন মদ খেলে না। টিয়াকে সে স্পর্শ পর্যন্ত করলে না।

টিয়া জিজ্ঞাস করলে—কি হল তোমার মোহন?

সে সংক্ষেপে উত্তর দিলে—জানি না।

—শরীর? শরীর ভাল নাই?

—না। শরীর ভাল আছে।

—তবে?

—জানি না। বলেছি তো!

টিয়া চলে গেল। আবার ঘুরে এসে প্রশ্ন করলে—আমার ’পরে রাগ করেছ বঁধু?

—নাঃ। রাগ তোর ওপরে করি নি। কথা বলেই সে টিয়ার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিল। সে দৃষ্টি টিয়া সইতে পারে নি। প্রশ্ন করেছিল—এমন ক’রে কি দেখছ মোহন?

মলিন টিয়াকে বিচার করে দেখছিল।

টিয়া আরও সুন্দর হয়েছে। সে পুতুল গড়ে, রঙ দিয়ে রাঙায়; রূপ সে চেনে, বোঝে। টিয়া আরও রূপসী হয়েছে, অবরোধের

মধ্যে থেকে তার রঙ উজ্জ্বল হয়েছে। সুমোহন কারিগর পালিশ করেছে, সেটা টিয়ার ছিল না। ভুরু-চোখ আরও কালো দেখাচ্ছে। চুলের রাশি আরও ঘন, আরও কালো হয়েছে, আরও চিকন হয়েছে প্রসাধনের প্রসাদগুণে। প্রথম ভাদ্রের ঘোলা জল-ভরা বিল—আশ্বিনের শেষে কাজল কালো জলে টলমল করছে, চারিপাশে শালুক ফুটেছে। কিন্তু তবু ভাল লাগছে না তার। না ভাল লাগছে না। না—না। স্থিরজল তার ভাল লাগে না। তরঙ্গ চাই বেগ চাই।

ভাবছিল সে মনে মনে। শেষ দিকে মনের ওই 'না—না' এর সঙ্গে মাথাটা না—না করেই দুলে উঠল।

টিয়ারও ভ্রূ কুঁচকে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—কি? সে সবিস্ময়ে একদৃষ্টে মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল; মুখের প্রতিটি রেখা প্রতিটি কুঞ্চন লক্ষ্য করছিল! বুঝতে পারছিল না।

—কিছু না।

সময়টা তখন সন্ধ্যার মুখ। সে হঠাৎ, অত্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। কোথাও যেতে হবে। আবার তাকে খুঁজে পেতে হবে তার তৃষ্ণাকে। স্বাদকে। কোথায় আছে, কিসে আছে? রাস্তায় বেরিয়ে দীর্ঘদিন পর একটা বারে, টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো মদের দোকানে ঢুকে বসল। এখানে চেনা লোক তার বেশী নয়। এতদিন টিয়াকে নিয়েই মেতেছিল সে। বাইরে বেরিয়েছে কম। যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তাদেরও কোনদিন বাড়ীতে ডাকে নি, টিয়াকে দেখাতে চায় নি।

ভাল মদ খানিকটা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। হ্যাঁ, খানিকটা যেন ফিরে পেয়েছে সে তার স্বাদকে, তৃষ্ণাকে।

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে সুরু করেছিল সে। কোথায়? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চন্দননগরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘোরা তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। দূর! দূর! আবার খানিকটা ঘুরেছিল সে গঙ্গার ধারে ধারে। সরকারী বাড়ীগুলোর সামনে। সাহেব মেমদের সেই হোটেলটার সামনে। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ ভাল লাগে। হঠাৎ আবার চলতে সুরু করেছিল।

চলো রূপের হাটের দিকে। খানিকটা ঘুরে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল। মনো দিদি মরে নি। মনে মনে বলেছিল—মনো দিদি তুই মর, তুই মর, তুই মর! অভিশম্পাত দিয়ে এবার ফিরেছিল বাড়ির দিকে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। পথের উপর একটা আলোর খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিয়া। স্থানটা নির্জন। কয়েকটা ছোকরা আশেপাশে ঘুরছে।

—টিয়া?

টিয়ার চোখে স্থির দৃষ্টি। বোধ হয় কিছুই সে দেখছিল না। নিজের মনের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গোটা দুনিয়াই যেন টিয়ার হারিয়ে গেছে। মলিনের কথাতেও তার মগ্নতা ভঙ্গ হয় নি। তেমনি একভাবেই তাকিয়েছিল সে। মলিন আবার ডেকেছিল—টিয়া?

এবার টিয়া তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু কথা বলে নি। চিনতে পারছিল না যেন।

—এখানে? কি করছিস এখানে? টিয়া!

—মোহন! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টিয়া বলেছিল—ঘর আর আমার ভাল লাগছে না মোহন, তোমাকেও লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। হাঁফ ধরছিল মোহন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছিল মলিন। পথের অদূরে সেই ছোকরাগুলো কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। গ্রাহ্য করেনি সে। টিয়া স্থির নিস্পন্দ। তারপর বলেছিল—

—খালাস নে টিয়া!

—হ্যাঁ। সেই ভাল। তুমি খালাস—আমি খালাস। এতক্ষণে হেসেছিল টিয়া। তারপর বলেছিল—চল, রাতটার মত ঘরকে যাই।

—চল্।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে টিয়া বলেছিল—কিন্তু এ রাত যদি না পোহায় মোহন?

—পোহাবে। ভাবিস নে।

—আমাকে কিছু টাকা দিবে কিন্তু।

—কত?

—যা তোমার খুসী।

নিজের সঞ্চয় থেকে একশো টাকা বের করে মলিন তার হাতে দিয়েছিল —নে একশো টাকা।

—না। এত নিব না।

—কেন? আশ্চর্য হয়ে গেল মলিন। পয়সার জন্য যে টিয়ার এককালে ছলাকলার অন্ত ছিল না—সে টাকা চায় না? হেসে টিয়া বললে—রূপ আছে, বয়স আছে। এর উপর এত টাকা থাকলে—রঘু-দস্যির মাসতুতো ভায়েরা মেরে জলে ফেলে দিবে।

—বেশ কত নিবি নে।

—ওর অর্ধেক দাও।

টাকাটা নিয়ে খুঁটে বেঁধে টিয়া উঠে চলে গেল। মলিনও আর

ডাকলে না। জিজ্ঞাসাও করলে না—কি করবে, কোথায় যাবে? নিশ্চিন্ততা, একটা পরম নিশ্চিন্ততার প্রসন্নতায় চোখ বুঁজে সে কখন অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল—খেলে না। টিয়াও রাঁধলে না—রেঁধে ডাকলে না। তারও ঘুম ভাঙল না। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে, তখন রোদে উঠোন ভরে উঠেছে। দোর খোলা। ঝি টা এসে দাঁড়িয়ে আছে। টিয়া নাই।

টিয়া নাই? ঝিটা জিজ্ঞাসা করলে—সে কোথায় গেল? মলিন বললে—জানি না। তারপর উঠল—দোকানে চা খেয়ে এল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এই ঘরটায় তাদের ঘরকন্না। টিয়ার ঘর এটা। সবই যেমনকার তেমনি আছে। শুধু একটা বাক্স খোলা। টিয়ারই বাক্স—সেই তাকে বাক্স কিনে দিয়েছিল, টিয়ার কাপড় চোপড় থাকত। কাপড়গুলো ছড়ানো। দেখে অনুমান করলে কিছু নিয়ে বাকী ফেলে দিয়ে সে চলে গেছে। আঃ! একটা নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। খালাস! সে খালাস! পরম প্রশান্ত মনে ফিরে সে কাজ করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু অখণ্ড প্রশান্তির মধ্যে কাজ করা হল না। মধ্যে মধ্যে টিয়ার কথা মনে হল। তার কান উৎকর্ণ হয়ে রইল কখন শুনবে—মোহন আমি ফিরে এলাম। তুমি নইলে বাঁচব না আমি। কিন্তু সে কথা সারা দিনেও শুনতে পেলে না।

কোথায় গেল? যাক, যেখানে তার মন চায়। পথে পথে বালিকা বয়স থেকে যে টিয়া ঘুরছে পথের বাঁকে সে হারাবে না। আবার কারও সঙ্গে দেখা হবে, থমকে দাঁড়িয়ে মুচকে হেসে হাত পেতে বলবে—জয় হোক তোমার শ্যাম। ভিখারিণীর দিকে ফিরে চাও গুণমণি!

সে খালাস পেয়েছে, টিয়া তাকে খালাস দিয়েছে, এই জন্যে তার কৃতজ্ঞতা। না-দিলে নিজেই নিত সে। সেই তো আজ বলত, টিয়া বলতে একমহূর্ত দেরী করলে সে-ই বলত, টিয়া আর ভাল লাগছে না, আমাকে খালাস দে! বল, কি চাস বল। সে কি থাকতে পারে ওই বন্ধনে?

খেলাফুল। ওরা হল খেলাফুল; য'দিন ভাল লেগেছে খেলেছে। ভাল লাগল না, নামিয়ে দিয়েছে। জীবন্ত খেলা-ফুল। ওরা নিজেরাও খেলে, খেলুড়েকেও ভুলায়। মনে পড়ল দিদির কথা। মনে পড়ল কত জনের কথা। সারাটা দিন ধরে চেষ্টা করেছিল একটা পুতুল গড়তে। চন্দননগরের গির্জে গড়বে একটি। মেলা আসছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে গিয়ে দোকান নিয়ে বসবে। সামনে সাজিয়ে দেবে। ফরাসী সাহেবদের এদিকে ঝোঁক খুব। কিন্তু হল না। হাতে মনে যেন কিছুতেই এক হচ্ছে না। নাঃ, হবে না এখন। উঠে পড়ল সে কাজ ছেড়ে। দোকান থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে গেল সে ভাল ক'রে। বেলা তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। প্রায় দুটো আড়াইটে। সবে-নিঝুম গাছগুলোর পাতা চঞ্চল হচ্ছে, কাকগুলো নিঝুম গাছ থেকে নেমে পথে এসে বসছে; পায়ে পায়ে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পাশের রাস্তাটার বাঁকের ওপার থেকে ডাক উঠল—চুড়ি চাই, চুড়ি! চুড়ি!

চমকে উঠল মলিন। চমকে ওঠার কথাই। এ গলার আওয়াজ কার? কার গলা এমন হাসির পরতের মত কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ে? না, ভুল হয় নি তার। ওই যে চুড়িওয়ালী এই দিকেই আসছে। চুড়িওয়ালীদের ঢঙে কাপড় পরে—মাথায় চুড়ির ঝুড়ি

নিয়ে ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে যে মেয়েটি, সে টিয়াই বটে। সঙ্গে তার হাবা ভাই ফড়িংটা। তার মাথাতেও একটা ঝুড়ি।

চমৎকার মানিয়েছে টিয়াকে। চমৎকার! তার ঘরে, সৌখীন কাপড়ে জামায় এ রূপ টিয়ার খোলে নি। টিয়া তাকে দেখে তার কাছে এসে দাঁড়াল, মুখ টিপে হেসে বললে—কি করছ এখানে? মেম সাহেব দেখছ? কথাটার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল।

—না, গির্জেটা দেখছি, গড়ব।

—গড়া হ'লি পরে আমি দেখে আসব। আমাকে না দেখায়ে বেচিয়ো না। আমি চুড়ি বেচছি। ভাল লাভ! কেমন মানায়েছে বল?—বলেই আবার ফিক ক'রে হাসলে। আবার বললে—না। পালাই, তুমার চোখে আবার নেশার ঘোর লাগছে।

বলেই হাসতে হাসতে হাঁকতে হাঁকতে আবার চলে গিয়েছিল পশ্চিম মুখে—শহরের দেশী বাসিন্দা পাড়ার দিকে।—চাই চুড়ি। চুড়ি চাই।

মলিনও ফিরে এসেছিল। চোখে নেশা নিয়েই ফিরে এসেছিল। বোতল থেকে খানিকটা মদ খেয়ে নিয়েই সে বসে গিয়েছিল। বসে গিয়েছিল মাটি নিয়ে। নতুন গড়তে সুরু করেছিল। গির্জে নয়, একটি মেয়ে পুতুল; চুড়িওয়ালী। তরুণী চুড়িওয়ালী, চোখের চাউনিতে অদ্ভুত ইসারা—মুখের হাসিতে তার আশ্চর্য ঢঙ। মুখের রঙে সিঁদুরের আভা। নাম দেবে মোহন-চুড়িওয়ালী!

গড়লে সে নেশায় বিভোর হয়ে। খাওয়া না, দাওয়া না, তিনদিন ধরে গড়লে আর মধ্যে মধ্যে মদ খেলে। আর কখনও চিড়ে মুড়ি কখনও ফুটো তেলে ভাজা; কখনও দোকানে গিয়ে একটা ডিম। নতুন গড়ার সময় তার এমনই নেশা লাগে।

টিয়া অবাক হয়ে যেত। ভয় পেত। কিছু বলতে সাহস করত না। এ মোহনকে ছোঁয়া যায় না। শুধু হাতে হাতে তার প্রয়োজন মত জিনিষগুলি যুগিয়ে দিত। আর মধ্যে মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত—কি সুন্দর! কি সুন্দর গো মোহন কারিগর! কি সুন্দর!

সেদিন যখন শেষ হল চুড়িওয়ালী পুতুল তখন সে একা। তারিফ করবার কেউ ছিল না। তাতে ক্ষতি হয় নি, মন ক্ষুণ্ণ হয় নি, বরং নেশাটা যেন বসেছিল ভাল। নিজের দোকানের চারিদিক তাকিয়ে দেখে হিসেব করেছিল কোথায় রাখবে তার চুড়িওয়ালীর সারি।

দোকান তার নতুন করে তখন জমে উঠেছে। অনেক পুতুল গড়েছে। নতুন পুতুল। চন্দননগরের গির্জের ছাঁচ হয় না, সে হাতেই অনেকগুলো গড়েছিল। ডুপ্লে সাহেবের মার্বেলের মূর্তি দেখে তার ছাঁচ তৈরী করে পুতুল গড়েছিল। কনে-পুতুলের নতুন ছাঁচ তৈরী ক'রে আবার কনে-পুতুল করেছিল। বাঘ, ভালুক, কুকুর, বিড়াল, গাই-বাছুর এসব তো ছিলই। এগুলি দামে সস্তা; ছেলেদের জন্যে; নেবে, ভাঙবে আবার নতুনের জন্য কাঁদবে। গরীবের জন্যেও বটে। গরীবের সাধও সে বোঝে। বেশী দামের ভালুকওয়ালা ভালুক নাচাচ্ছে, ফোটা পদ্মের উপর ভ্রমর বসে আছে, অজগর সাপে হরিণ জড়িয়ে ধরেছে, মহিষের পীঠে বাঘ লাফ মেরেছে, হাতীর মাথায় বাঘ—হাওদায় শিকারী, এসব পুতুলও তৈরী করেছে। বোষ্টুমী-পুতুল তার পাশে কনে-পুতুল। মোহন-চুড়িওয়ালী বেশ একটু বড় হয়েছে। ভাল বিক্রী হবে। ওগুলিকে রাখবে সকলের উপরে। হাতের নাগালের বাইরে। চট ক'রে যেন ছুঁতে না পারে।

রথের মেলায়, বাস্তিল ডে'র মেলায় আজকাল সব চেয়ে বড় দোকান পড়ে তার। সাহেব মেম ভিড় ক'রে আসে। জগদ্ধাত্রী পূজোয়, রাসযাত্রার সময় বারোয়ারি তলায়, পালপাড়ায় দোকান নিয়ে যায় সে। মধ্যে মধ্যে মধ্যে সাহেবদের অর্ডার আসে। ডেকে পাঠিয়ে অর্ডার দেয়।

—মরি-মরি-মরি! এ তুমি করেছ কি গো মোহন কারিগর! আমার পরাণ বঁধু—মনের মধু কই কি তোমারে সাধে, আমার সোনার শ্যাম, নবীন গৌর! টিয়া পোড়ামুখী এমন সুন্দর? এত রূপ?

এ কথা আর কে বলবে? বলেছিল টিয়া। তুপুরে সে রোদের নেশায় ঝিমুচ্ছিল—হঠাৎ টিয়া এসে দাঁড়িয়েছিল কখন; উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিল ওই কথাগুলি। মলিনের ঝিমুনী ছুটে গিয়েছিল।

—টিয়া?

—হাঁ মোহন। ফড়িং সকালে এদিক পানে এসেছিল, সে দেখে গিয়েছে নতুন পুতুল। কইল গিয়া—দিদিরে, কি পুতুল গড়েছে কারিগর, দোকান আলো করেছে গো। দেখে আয় গিয়া। চুড়ি-ওয়ালী পুতুল। তাই ছুটে এলম।—দেখি পুতুল তো নয়, ও যে আমি। আমি এত সুন্দর মোহন?

মলিন হেসেছিল। কি করে বোঝাবে সে যে গড়তে গেলে যে যত সুন্দর পারে তত সুন্দর করেই গড়ে। ওখানে, যেমনটি ঠিক তেমনটি হল কি না হ'ল সে মনে থাকে না, কত সুন্দর হল তাই-ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর তুলি বুলায়। ওরে টিয়া, সুমোহন

কারিগর যে কি থেকে তোকে কি ক'রেছে তা কি ভেবে দেখেছিস? মনে আছে তোর ত্রিবেণীর ঘাটের সেই ধুলোর আস্তরণ পড়া শীর্ণ মলিন চেহারা?

টিয়া বলেছিল—আর আমার খেদ রইল না মোহন। আমার পুতুল হাজারে হাজারে বিক্রী হোক তোমার। অনেক টাকা হোক তোমার। তোমার মনের ভিতর ইয়ার চেয়েও মোহন রূপে আমি রইলাম···সে জেনে গেলাম। আর আমার খেদ নাই। খেদ নাই—খেদ নাই। তোমারে একটা গান শুনায়ে যাই।

সে গেয়েছিল—অতি মৃদুস্বরে—

কি রঙে রাঙালে কারিগর!
রঙের ছটা মনে লাগি মন—জর জর।
কালো রঙে এত শোভা—
আগে তা জানিত কেবা
ও রঙ পরশ লাগি—তনু কাঁপে থর থর।

ওই গান গাইতে গাইতেই সে হেলে ছুলে প্রায় নেচে নেচেই যেন চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। তবে পথে-ঘাটে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল। দল বেঁধে গাঁ-গাওলায় চুড়ি বেচতে যেত, চার পাঁচ দিন ধ'রে এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরে চুড়ি বেচে আবার ফিরত চন্দননগর। থাকত দিন কয়েক, আবার চুড়ি সংগ্রহ ক'রে বের হ'ত। কোথাও মেলা হ'লে সেখানে চলে যেত। মেলা সেরে ফিরত। টিয়ার কণ্ঠস্বরে গানের সুর আছে। তা ছাড়াও ওর ডাক শুনেও মলিন বুঝতে পারত—ওই যাচ্ছে টিয়া।—চুড়ি চাই—চা-ই চু-ড়ি। মোহন-বেশরী চুড়ি।

বুলিধরা টিয়া পাখীকে ছেড়ে দিলে—সে যেমন মধ্যে মাঝে

বাড়ীর ছাদের আল্‌সেতে অথবা বাড়ীর ধারের কোন গাছে এসে বসে সব থেকে প্রিয় বুলিটি বলে—ঠিক সেই রকম।

এর কিছুদিন পরে—বোধ করি মাস দুয়েক পর—টিয়া যেন কোথায় উড়ে গিয়ে পথ হারাল—আর ফিরল না। পথে ঘাটে দেখলে না, সাড়া শুনলে না। কি হল?

কয়েক দিন পরই মিলল খবর। চুড়িওয়ালীদের দলেরই একজন—হেসে বললে—টিয়া আবার খাঁচায় ঢুকল কারিগর।

—খাঁচায়?

—হ্যাঁ, খাঁচায়। গঙ্গার ওপারে শান্তিপুরের ওদিকে কোন এক মেলায় এক মনিহারির দোকানদার তাকে খাঁচায় পুরেছে। কয়েকটা মেলাতেই দোকানীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, এক শেখের ছেলে; সে তাকে বিয়ে করবে বলেছে; টিয়া অনায়াসে চুড়ির ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে ফড়িংকে ফেলে তার সঙ্গেই চলে গেছে তার ঘরে।

নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। চিন্তা অবশ্য সে করত না টিয়ার জন্য তবুও এ খবরটায় যেন সে শান্তি পেলে। বেশ করেছিস টিয়া। বেশ করেছিস। সুখে থাক তুই। তোর কলকল বুলিতে শেখের ঘরে জলসা জমে উঠুক।

পরদিনই এল টিয়ার হাবা ভাইটা, ফড়িং। টিয়া চলে গেল—সে কি করবে? বাবা মরেছে, টিয়া নাই, সে কোথায় যাবে—কার কাছে থাকবে?

—তুঃ মি আঃ-আঃ-মাকে রাখঃ কারিগর। আঃ-আঃমি খুঃব খাঃটব। যা বলবে শুনবঃ।

কারিগর ছাড়া আপন জন সে আর দেখতে পায় নি।

মলিন হেসে বলেছিল—থাক। আমার কাছেই তুই থাক।

জানোয়ারের প্রতি যে মায়া মানুষের, সেই মায়াতেই রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল তাকে। তা ছাড়া একটা লোকও তার দরকার। কাজ করবার জন্য দরকার, কথা বলবার জন্য দরকার, রাগ হলে সে রাগের বশে লাঞ্ছনা করবার জন্যও দরকার। মায়া করবার স্নেহ করবার জন্যও দরকার। —থাক—তুই থাক।

ফড়িং থেকে গিয়েছিল। হাবা জড় বুদ্ধি ফড়িং।

॥ দুই ॥

টিয়ার কথা আর মনে রইল না, মনে করবার সময় হল না। নতুন নেশায় তাকে পেয়ে বসল। সে মেতে গেল। শুধু তাই নয়, মোহন চুড়িওয়ালী পুতুলগুলো ছিল কাচের শো-কেসে, সব থেকে উপরের থাকে—সেগুলোকে সেখান থেকে সরিয়ে নিচে নামিয়ে দিলে; দাম সস্তা করে দিলে। শো-কেসের উপরের থাকে সারি সারি সাজিয়ে দিলে পুতুল। নতুন নেশার—নতুন পুতুল। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, রবিঠাকুর।

উনিশ শো তিরিশ সাল। দেশ তখন মত্ত হয়ে উঠেছে। ঝড়ো হাওয়ার মত হাওয়া উঠেছে, অশ্বত্থ বট শাল সেগুন থেকে আগাছার বনে সমান দোল লেগেছে।

আরম্ভ হয়ে গেছে তিরিশ সালের আন্দোলন। চন্দননগর ঠাণ্ডা, কিন্তু হুগলী চুঁচড়ো তেলিনীপাড়া কোন্নগর শ্রীরামপুরে তখন যেন তুফান লেগেছে মানুষের জীবনে। মলিন নবদ্বীপ থেকেই অবসর সময়ে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। ছবির বইই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ছবি থেকে গল্প। বই পেলেই সে পড়ত। ত্রিবেণীতে

রঘু তাকে বই দিত। সেই বই চুম্বনে খুন, প্রণয়ে বিষ, রাজকন্যার গুপ্তকথা, আরও অনেক। মধ্যে মধ্যে ছড়ার বই, কিন্তু কেচ্ছার ছড়া। চন্দননগরে এই তুফানের সময় সে খবরের কাগজ পড়ত। পড়ে সে অনেক জেনেছে—অনেক বুঝেছে। মাতন তারও লেগেছিল কিন্তু সে-মাতনে সে কি ভাবে মাতবে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ বুঝতে পারলে ; পথ পেলে—সেবার রথের মেলায় একটি ছেলে তার দোকানের সামনে এসে বলে গেল—ওই মূর্তিগুলো বেচো না।

—কোন গুলো ? কেন ?

—ওই ডুপ্লের মূর্তি। বেচোনা। একদিন ভেঙে দেবো দোকান।

—কেন ? ভয় মলিন করে না, সেদিনও করেনি, তবু জিজ্ঞাসা করেছিল। মনের মধ্যে খট ক'রে লেগেছিল একটা কিছু। আপনিই লেগেছিল। নইলে সে জিজ্ঞাসা করত না, হেসে বলত—আচ্ছা, দেখা যাবে।

—কেন ওই সায়েবদের মূর্তি বেচবে ? আর গড়বার মূর্তি পেলে না ? কেন ? দেশবন্ধুর মূর্তি গড় না কেন ? রামকৃষ্ণের মূর্তি গড় না কেন ? বিবেকানন্দের মূর্তি গড়তে পার না ?

মূর্তিগুলো তুলে সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের মধ্যে পুরে দিয়েছিল মলিন। বাড়ী ফিরে ফেলে দিয়েছিল গঙ্গার জলে। ছাঁচটা পর্যন্ত। এবং দেশবন্ধু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ছবি জোগাড় করে সর্বপ্রথম তৈরী করেছিল বিবেকানন্দের মূর্তি। প্রথম মূর্তিটি বড় করেই তৈরী করেছিল ! তারপর রামকৃষ্ণ, তারপর দেশবন্ধু। রঙ দিতে গিয়ে কিন্তু থমকে গেল সে। অনেকক্ষণ তুলি হাতে বসে রইল, তারপর উঠে হন হন করে গিয়ে দাঁড়াল—ডুপ্লে সাহেবের মূর্তির সামনে।

দেখে চলে এল। হয়েছে। রঙ সে করবে না। তুলি চালাবে না। চোখ আঁকবে না। রঙে চুল আঁকবে না। শ্বেতপাথরের রঙ দেবে। রেখে দিলে সে তৈরী মূর্তিগুলি। আবার মাটি এনে আবার বসল। চেয়ারির টানে মাটির উপর দাগ কেটে চুল দাড়ি গোঁফ তৈরী করলে, জামার বেড় ফোটালে ; রামকৃষ্ণদেবের কাঁধের উপর ফেলা কাপড়ের আঁচল কেটে বের করলে। বিবেকানন্দের পাগড়ী করলে ; দেশবন্ধুর সত্য জেল ফেরত মূর্তি তৈরি করেছিল, দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে চশমা! তার উপর অনেক যত্নে তৈরী করা সাদা রঙ লাগিয়েছিল। সরস্বতীর সাদা রঙ। চমৎকার হয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ পথের উপর নেমে, এদিক থেকে ওদিক থেকে দাঁড়িয়ে দেখে খুসী হয়ে উঠেছিল সে। এত উল্লাস তার আর অনেকদিন হয় নি। হয়ত জীবনে হয় নি।

দিন কয়েকের মধ্যেই তার দোকানের সামনে লোক দাঁড়াতে সুরু হয়েছিল। ওই মূর্তি দেখতে। কয়েক দিন পর সেই ছেলেটিই এসে তাকে বলেছিল, মূর্তি তিনটি নিয়ে চল—প্রবর্তক সংঘে। দেখবেন কর্তারা।

প্রবর্তক সংঘ চন্দননগরে তখন বিখ্যাত।

প্রবর্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে সে গিয়েছে গতবছর। সংঘের প্রধানকেও সে দেখেছে। অনেক নাম অনেক কাহিনী তাঁর। ওখানকার মেলায় মাটির মূর্তি গড়িয়ে আগেকার কালের অনেক ঘটনার ছবি সাজিয়ে দেন। সেসব মূর্তি দেখেছে সে। ঘোষপাড়ার সতী মায়ের দীক্ষা। নবাব সিরাজোদ্দৌলা আর রামপ্রসাদ।

মূর্তি তিনটি দেখে সংঘের প্রধান ভারী খুসী হয়েছিলেন। তাকে

ডেকে আলাপ করেছিলেন—নিজের হাতে লিখে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এতদিন আমাদের এখানে অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে এসব মূর্তি আন নি কেন ?

মলিন উত্তর দেয় নি। উত্তর দিয়েছিল সেই ছেলেটি, বলেছিল—আগে সব অন্য পুতুল গড়ত। এসব এবার নতুন গড়েছে।

—চমৎকার হয়েছে। তারপরই প্রশ্ন করেছিলেন—কি নাম তোমার ?

—মলিন রায়।

—রায় ? তোমরা জাতিতে কি ? কুম্ভকার কি সূত্রধরদের তো রায় উপাধি দেখা যায় না ! আছে নাকি ?

—না। ছুতোর কুমোর নই আমি। আমি ব্রাহ্মণ ! একটু রূঢ় ভাবেই উত্তর দিয়েছিল সে।

—ব্রাহ্মণ ?

—হ্যাঁ।

—তা বেশ ! কিন্তু তোমার এ মূর্তি তো একজিবিশনে পাঠানো উচিত।

সেই ছেলেটিকে বলেছিলেন—শ্রীরামপুরে একটা হচ্ছে না ? সেখানে পাঠিয়ে দাও।

উৎসাহিত হয়েই সে বাড়ী ফিরে এসেছিল। ফড়িংকে ডেকে টাকা দিয়ে বলেছিল—যা মদ নিয়ে আয়। এলাচের গন্ধওয়ালা, বুঝেছিস। আর শোন। একটা সুতোর বাণ্ডিল আনবি। সুতোর বাণ্ডিল। বুঝেছিস।

সুতোর বাণ্ডিল পাকিয়ে সেই দিনই পৈতে তৈরী করে গলায় পরেছিল সে।

শ্রীরামপুরের মেলায় সে প্রাইজ পেলে। ভালো রূপোর মেডেল আর সার্টিফিকেট। শুধু তাই নয়, ওখান থেকেই কর্তারা মূর্তিগুলি কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও হচ্ছিল একটা বড় একজিবিশন। কলকাতাতেও পেলে পুরস্কার। শুধু তাই নয়—মূর্তি তিনটি বিক্রী হয়ে গেল দেড় শো টাকায়।

ঐ টাকা আর পুরস্কার নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরল সে আনমনার মত।

হাবা ফড়িং তার সে চেহারা দেখে ভয় পেলে।—কি হলঃ কাঃ রি গরঃ ?

চুপ ক'রে বসে রইল মলিন, উত্তর দিলে না।

—মাটি আন।

আবার মূর্তি তিনটি গড়তে হবে।

মাটি কিছু কিছু তৈরীই থাকে। ফড়িং আনলে মাটি।

মাটি নিয়ে বসল। মাটির তাল তৈরী ক'রে পাতলা তক্তার উপর বসিয়ে সুরু করলে কাজ। কিন্তু কি হল, ফেলে দিলে সব। কি হবে? চন্দননগরে এ কে কিনবে? ফেলে দিয়ে ঘুরতে লাগল পথে পথে। ফড়িং সভয়ে ভাবতে লাগল কারিগরের কি হ'ল? যা তার বরাবর হয় তাই হয়েছে। যা হয়েছিল বর্দ্ধমানে, যা হয়েছিল ত্রিবেণীতে, তাই হয়েছে। ত্রিবেণী থেকে শুধু সে রঘু দস্যির ভয়েই পালিয়ে আসে নি। ওটা হয়েছিল উপলক্ষ্য। চন্দননগর তার ভাল লেগেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কলকাতাও তার ভাল লেগেছে অনেকদিন থেকে। মধ্যে মধ্যে যেত সে কলকাতা। চন্দননগরে এসে কলকাতার রঙের দোকানের খোঁজ পেয়েছিল। বিলিতি রঙ, বিলিতি তুলি। আরও আসত

কুমোরটুলির প্রতিমা দেখতে। থিয়েটার দেখে গেছে। চন্দননগর ছোট হয়ে গিয়েছিল, হাজার বাতির আলোর কাছে পঁচিশ বাতির আলোর মত! কতদিন সে মরা বড় প্রজাপতি খুঁজতে যেত। খুঁজতে যেত নতুন রঙ নতুন ছকের জন্যে। এক একটা প্রজাপতি এমন পাওয়া যায় যে অবাক হয়ে যেতে হয়; এমন রঙের ছক আর রঙের বাহার মাথায় আসে না, খেলে না। তাই সে খুঁজত। রাত্রে বের হয় বড় প্রজাপতি। আলো দেখে ছুটে আসে। কিন্তু তার দোকানে বড় একটা আসত না। আসত ষ্ট্র্যাণ্ডের ধারে এক মেমসাহেবের একটা হোটেল আছে, সেখানে। সন্ধ্যে থেকে সারা রাত্রি প্রায় আলো জ্বলত, একশো ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সারি সারি আলো। ফটকের মাথায়, বাড়ীটার মাথায় জ্বলত; তার জোর আরও বেশী। আড়াই শো ক্যাণ্ডেল পাওয়ার। ভোর বেলা গেলে ওখানেই পেত মরা প্রজাপতি; অসংখ্য পোকার মধ্যে দুটি একটি প্রায়ই পেত সে। কলকাতা হাজার বাতি লক্ষ বাতির আলো। চল রে মন, পাখা যখন মেলেইছিস তখন চল ওই লক্ষবাতির আলোর ছটার ঝলমলানির মধ্যে চল। তাতে মরণ হয়, সে মরণ ভালো! চল কলকাতা! মরতে হয় কলকাতাতে গিয়েই মরবে সে।

আর চন্দননগরে নয়। ভাল লাগছে না তার। চন্দননগর ছোট হয়ে গেছে, চন্দননগরে গুমোট মনে হচ্ছে, চন্দননগর অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে। কলকাতার আলো চোখে ভাসছে। যাবে, সে কলকাতাতেই যাবে। রাত্রে বসল সে তার সঞ্চয় নিয়ে। গুনতে লাগল। মূর্তি তিনটের দাম দেড়শো টাকা নিয়ে বারশো টাকা তার সঞ্চয়। অনেক! অনেক! অনেক!

চলো কলকাতা।

কলকাতা এল সে আর ফড়িং। বাড়ী ভাড়া করলে। চিৎপুর রাস্তার পাশে বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাট, খড়ঘাটারও উত্তর অঞ্চলে, খালের উপর কাশীপুর ব্রিজের দক্ষিণে গ্যালিফ ষ্ট্রীটের দক্ষিণে বস্তীর মধ্যে বেশ একটা উঠানওয়ালা মাঠ কোটা। খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই কুমোরটুলি। কিন্তু কুমোরটুলিতে সে গেল না। আলাদা, ওদের থেকে দূরে থাকবে সে। কাজ আরম্ভ করে দিলে সে। গায়ের জামা খুলে ফেলে লেগে গেল। সঙ্গে ফড়িং।

ফড়িংটা হাবা হলেও দেহ খুব অপটু নয়। অপটুতা ওর বুদ্ধিতে, জড়তা ওর কথায়। সে বয়সে সদ্য যুবা হয়ে উঠেছে তখন, খাটতে পারে এবং এই আড়াই তিন বছর চন্দননগরে মলিনের কাছে থেকে কাজগুলি বুঝেছে, শিখেছে। আর একটা আশ্চর্য গুণ ফড়িংয়ের, ওর নিষ্ঠা। কাজটি পরিপাটি না-হলে কিছুতেই মনোমত হয় না। ভাঁটা চাপাবার আগে এমন ভাবে সে মাটি ধরিয়ে নিকোয় যে মনে হয় কর্নি দিয়ে মেজেছে যেন। নিকোয় আর দেখে, আবার নিকোয়। মাটি সে তৈরী করে আশ্চর্য সুন্দর। আরও গুণ তার—সে মলিনকে ভালবাসে। হাবার হাসি হেসে প্রায়ই বলে—কারিগরঃ তুমিঃ এমন ছোস্তর আর এমন ভালঃ।

মধ্যে মধ্যে কথার শেষে বিসর্গ যোগ করলে যেমন উচ্চারণ হয়, জড়তা হেতু ঝোঁক দিয়ে কথা বলার জন্য তেমনি বিসর্গান্ত উচ্চারণ হয়ে উঠে! হুঁচোট খেয়েও বুক ছেঁচড়ে চলে যেন কথাগুলো। আর দন্ত্য 'স' এবং 'দ'য়ের উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না। অকারণে বা অতি সামান্য কারণে হি-হি করে হাসে। আবার হঠাৎ হাসি

থামিয়ে ত্রস্ত ভাবে সকলের হাসিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। কর্মহীন অবসরে অসাড়ের মত বসে থাকে, মুখটা হাঁ হয়ে যায়, জগতের কর্মকোলাহল কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গচ্যুত হলেই নির্জন প্রান্তর একলা শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে। নইলে ফড়িংয়ের গুণ অনেক। ফড়িংই মলিনকে শুধু ভালবাসে না, মলিনও তাকে ভালবাসে। ফড়িং এই আড়াই বছরে মলিনের কারিগরি যন্ত্রপাতির মতই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যন্ত্র হারালে কেনা যায়, তৈরী করা যায়। ফড়িং মেলে না, ভাগ্য গুণে জুটে যায়। যে বস্তুটি ভাল বলে মনে হয় তার, সেটি দেখে এসে সে বলে—কারিগরঃ ভালঃ জুটোঃ ডেখে এলাম ডোকানে, টুমি টাই কি পর! মেয়েদের জুতো দেখে এসে একথা প্রায় বলে সে।

সস্তা খাবার হলে কিনে এনে অগ্রভাগটি মলিনের সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে—খাও কারিগরঃ।

সামান্য বস্তু। বাদাম ভাজা। চানাচুর। শোন পাপড়ি। নিজের পয়সা থেকে কিনে আনে। দুজনেই আরম্ভ করেছিল কলকাতার জীবন। ঘর সংসার, কারখানা ব্যবসা সব। দেরী হয় নি, দু' জনেই প্রাণপণে খেটে সামান্য প্রারম্ভ শেষ করেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই। তার সে সামান্য প্রারম্ভ বছর তিনেকের মধ্যেই যা হয়ে উঠেছিল তাকে অসামান্য বলা চলে না, কিন্তু সেই মুখে গতি নিয়েছে এ কথা সকলেই বলে। বাধা বিঘ্ন কম হয় নি কিন্তু সে তা আপন শক্তিতে সব লঙ্ঘন করেছে। সে বিরক্ত হয় না, রাগে না, হেসে বলে—কুছ পরোয়া নাই ; দেখা যাক।

উঠানে ভাঁটার ধোঁয়ার জন্য প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করেছিল, দরখাস্ত করেছিল। সে যথারীতি লাইসেন্স দিয়ে ধোঁয়া

বের হবার জন্যে একটা লম্বা টিনের চোঙ তৈরী করে বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, সঙ্গে সঙ্গে চোঙটাকে ঘিরে আরও দুটো ভাঁটা তৈরী করলে। ফড়িং ছাড়া আরও জন দুয়েক লোক রাখলে। একজন কারিগর, একজন ছোকরা। কালীঘাটের পটোপাড়া থেকে কুমোরটুলি পর্যন্ত কয়েকদিন অবিরাম ঘুরে লোক বেছে নিয়ে এল। ইচ্ছে হয়েছিল, নবদ্বীপ থেকে মাথামোটা গোপেশ্বরকে নিয়ে আসে। কিন্তু না। এখানে সে মলিন রায়। তার গলায় পৈতে। সে ব্রাহ্মণ। গোপেশ্বর জানে—যোগেশ পালের দেওয়া তার পরিচয়। তার মিথ্যে পরিচয়। সে ব্রাহ্মণ। তার মা ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে। সে ব্রাহ্মণ। তার এই রূপ—তার এই বুদ্ধি, তার এত প্রশংসা, সে ব্রাহ্মণ। জাত সে মানে না। জাত কিসের? তবে সবাই যখন জাত মানে তখন সে ব্রাহ্মণ। এই জন্যেই সে কুমোরটুলি যায় নি। সে ছোট কারুর চেয়ে হবে না। কিছুতেই না। এই জন্যেই ঝগড়াও হয়েছে অনেক জনের সঙ্গে। মলিন পিছু হটে না। ঝগড়া ক'রে কেউ ঘুঁষি তুললে—ঘুঁষি তুলেই সে আটকায়, ছুরি বের করলে সে নিজের ছুরিটা বের ক'রে দেখায়।—ঠিক আছে এসো। তুমিও নিজের হাতে সাড়ে তিন হাত, আমিও আমার হাতে তাই। যার হাত মাপে বড়, সে জিতবে। এসো। ফড়িংও সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মাটি-ভাঙা কাঠের মোটা হাতুড়ীটা নিয়ে। দাঁড়িয়েই সে ক্ষান্ত হয় না, হাতুড়ীটা নাচিয়েছে, ওটা তার অভ্যাস।

ঝগড়াও হয়েছে আবার আলাপও হয়েছে। আলাপই হয়েছে বেশী। বন্ধু তার অনেক। কর্মযোগেই তার বন্ধুভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তার অজ্ঞাতসারেই হয়ে উঠেছে, সে নিজেও ঠিক বুঝতে

পারে নি। বৎসর খানেকের মধ্যেই তারই ওই মূর্তিগুলি যে প্রশংসা ও সমাদর পেয়েছিল, তারই সূত্র ধ'রে তার কাছে এল অনেক লোক। মূর্তি গড়তে হবে। ফটো এনে দিয়ে যেত। একদিন ডাক পড়েছিল কলেজ ষ্ট্রীটের কমার্শিয়াল মিউজিয়ম থেকে। মডেল তৈরী করতে হবে। নানান ধরণের মডেল। কর্তা ছবি ধ'রে দিয়েছিলেন সামনে। বাড়ীটার ঘরে ঘরে ঘুরে দেখেছিল মলিন। ঘরে ঘরে টাঙানো ছিল অনেক ছবি। যেমন বিচিত্র মানুষ সব ছবিগুলিও তেমনি। এরা আলাদা মানুষ, এদের কথা আলাদা, মনের রঙ আলাদা, গায়ের গন্ধ আলাদা, সব আলাদা। তার ভারী ভাল লেগেছিল। শুধু ভাল লাগাই নয়, কিছু দিনের মধ্যে জীবনে যেন নতুন মাটি, নতুন জল, নতুন আলো এসে গিয়েছিল। নতুন সুর লেগেছিল। নতুন নেশা। আশ্চর্য! আশ্চর্য, এরা শুধু পুরুষই নয়—মেয়ে পুরুষের আলাদা একটি জাত। এতদিন এদের দূর থেকে দেখেছে, হঠাৎ কাছে এসে গেল। এসব মেয়েরা পুরুষেরা সব নতুন তার কাছে। ভুবন পালের গড়া সেই মেয়েটির মত নয় এ মেয়েরা। এদের চুলে সে মিষ্টি গন্ধ ওঠে না; এরা তার মত সুরে কথা বলে না। এরা আলাদা। এ যেন তার নূতন জগতে নবজন্ম; এরা সব নূতন জগতের নূতন জীবন। তবু বুকে তার আগুন ধোঁয়ায়, কিন্তু জ্বলতে পারে না! সাহসের উল্লাসের বাতাস বয় না, একটা ভিজে গুমোটের মত সঙ্কোচ ঘিরে থাকত সে আগুনকে। পূর্ব জন্মের সংস্কারের মত। জাতিস্মরের মত সে জীবনের স্মৃতি তাকে দীপ্যমান হতে দিচ্ছে না।

জ্বলেছে সেই আগুন।

সে আগুনের আঁচ যাদের গায়ে লেগেছে, তারাই এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ে তার সামনে, বিধ্বস্ত ক'রে দিতে চায় আগুনকে তেমনি ভাবে তারা এসে ঘিরে ধরেছে মলিনকে। যা হয়েছে হয়েছে বলে তারা ছেড়ে দেবে না ওকে। আগুন লেগেছে যখন তখন পুড়ুক, ছাই হয়ে যাক, এ বলে ছেড়ে দেওয়া মানুষের স্বভাব নয়। সে লড়াই করে, জল ঢেলে নেভায়, ধুলো বালি নিক্ষেপ ক'রে তাকে চাপা দেয়; শুধু নেভাবার জন্যেই করে না, আগুনের আক্রমণকে বিধ্বস্ত ক'রে তার উপর প্রতিশোধ নেয়। আগুন নিভে গেলে অঙ্গার ফেলে দেয়, আধ-পোড়া কাঠ তাও ফেলে দেয়, কিন্তু সে জ্বলন্ত কাঠখানাকে নিয়ে অতি ক্ষুধার সময়েও রান্নাশালায় উনোন জ্বালে না। তেমনি আক্রোশের সঙ্গেই ওরা আক্রমণ করেছে মলিনকে।

তার সেই নিজের বাড়ীর উঠানেই—লোকে তাকে ঘিরে ধরেছে। নির্যাতন করতে চাইছে।

কলকাতায় আসার কাল থেকে এর মধ্যে আট বছর চলে গেছে।

উন্মাদের মত চেঁচাছে এক বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ, বাতেপঙ্গু বঙ্কিম ভটচাজ। চীৎকার করে বলছে—এত বড় পাষণ্ড, এত বড় শয়তান তুই? এত বড় পাপ এত বড় অন্যায় করতে তোর সঙ্কোচ হল না।

মলিন সাপের মত গর্জন করে বললে—না, অন্যায় আমি করিনি। ভাল লেগেছে, ভালবেসেছি। আমাকে খুন করতে হয় কর। খুন হব। কোন অন্যায় আমি করি নি।

একটু দূরে কাঁদছে একটি মেয়ে। বঙ্কিম ভটচাজের কন্যা। মায়া।

॥ তিন ॥

সঙ্কোচের মধ্যে জীবনের কামনা নিয়ে, বর্ষার বাষ্পভার-আর্দ্র বাতাবরণের মধ্যে ধোঁয়ানো আগুনের মত সে যখন অন্তরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, তখনই কাছে এসেছিল এই বৃদ্ধ বঙ্কিম ভট্টাচার্যের কন্যা মায়া। দেখবামাত্র যেন ঘৃতাহুতিতে তার বুকের আগুন সেদিন দপ করে জ্বলে উঠেছিল। মন বলেছিল—এই, এইতো! একেই তো সে সারা জীবন চেয়েছে। নারীশিল্প-মন্দিরে মায়া তখন কাজ শিখত। সেখানেই দেখেছিল তাকে। শিল্প-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মলিনকে মেয়েদের মাটির পুতুল গড়ার কাজ শেখাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ওই কমার্শিয়াল মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে। বেতন দেবার সাধ্য তাঁদের ছিল না ; নিতান্তই দাতব্যের উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান ; অসহায় মেয়েদের কল্যাণ কামনায় তাদের শিল্প কাজ শিখিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য।

মিউজিয়মের একজন প্রধান তাকে ডেকে নারীকল্যাণের প্রয়োজনীয়তা এবং সে দিকে প্রতিটি সক্ষম জনের যথাসাধ্য করার দায়িত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে তাকে বলেছিলেন—তাঁরা আমাকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন তুমি ওঁদের ওখানে সপ্তাহে তিন দিন ঘণ্টাখানেক করে কাজ শেখাও।

মলিন আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়েছিল। জীবনের তৃষ্ণা খানিকটা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। রক্তধারা চঞ্চল হয়েছিল। তবে উগ্র লালসা জেগেছিল এ বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তা জাগেনি। মেয়েরা সুন্দর, পুরুষদের চেয়ে সুন্দর ; মহানগরীটার চারি দিকে

নারীরূপের শোভা। কমার্শিয়াল মিউজিয়মে এ নিয়ে বিচিত্র-কথা সে শুনেছে। শুনেছে—এ অন্যায়। না কি লালসা এর মূলে। নলিনের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। আবার হাসিও পেয়েছিল। পৃথিবীতে গাছে গাছে ফল, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল। সে লোভ? ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায়, আলো জ্বলে, সে কি আগুন জ্বালাবার প্রবৃত্তি, না সে বুকের জ্বালার ইঙ্গিত? মেয়েরা সুন্দর, বিধাতার হাটে পুরুষ বল, নারী রূপ। পুরুষ থেকেই যদি সৃষ্টি চলত তবে পৃথিবী হ'ত দৈত্যের পৃথিবী। মহিষাসুরের মত আকারের অবয়বের মানুষে ভ'রে যেত। ভালবাসা থাকত কোথায়? ওরা আছে, ওদের দেখে চোখ জুড়োয় বলে; চোখে এখনও জল আছে, নইলে চোখে শুধু আগুনই জ্বলত। ওরা জল, পুরুষ রোদ; ওরা মাটির বুক জুড়োয়, নরম ক'রে বলেই পৃথিবী সবুজ; নয় তো পুড়ে যেত পৃথিবী, মরুভূমি হয়ে যেত। কিন্তু ওঁদের সামনে তো বলতে পারে নি এসব কথা। সন্ধ্যায় নিত্য সে যায় চৌরিঙ্গীতে, ধর্মতলায়; চোখ জুড়িয়ে আসে মনোহারিণীদের দেখে। কতদিন বেড়াতে যায় চিৎপুরের ট্রামে চেপে। জানালার ধারে বসে দেখতে দেখতে যায়, দেখতে দেখতে ফেরে। ওদের দেখে মনে পড়ে দিদিকে। দিদি অমর, ওর মরণ নাই।

নারীশিল্প-মন্দিরে গিয়ে যতটা ভাল লাগবে ভেবেছিল তা লাগে নি। মেয়েগুলির চোখ-জুড়ানো রূপ নাই। আর দশটি মেয়ের কোমল মুখ দেখে মায়া লাগে, কিন্তু ভাল লাগার নেশা জাগে না। হঠাৎ চোখে পড়ল ওই মেয়েটি। মায়া।

উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েটি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, পাতলা শরীর, মুখে শান্ত শ্রীর মধ্যে একটি দীপ্তি। কাল ফিতে-পাড় সাদা ধুতি পরে মায়া, গায়ের ব্লাউসের হাতাটিতে

সরু বর্ডার, হাতে দুগাছি চুড়ি ; সোনার নয়, সোনার পাত মোড়া। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। মায়াকে দেখে মলিনের মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। এই তো! এই তো সেই মেয়ে! যে মেয়ে ওই নতুন মেয়ে, তাদের সে দেখেছে—তাদেরই জাতের অথচ তাদের মত দূরে নয়; মেয়েটি এমনই দীপ্ত অথচ এত উত্তাপ নেই। ওদের মত এত উজ্জ্বল নয়—কিন্তু স্নিগ্ধশ্রীতে প্রসন্ন। এরও মার্জনা আছে, কিন্তু ওদের মার্জনায় হাত দিতে সে পারে না—ও পালিশের মহার্ঘতা মলিনকে সঙ্কুচিত করে, এর মার্জনায় ও পালিশ নাই, যেটুকু আছে মলিন তার মূল্য জানে—সে তা দিতেও পারে। তার ভারী ভাল লাগল।

মায়া জামা কাটা ও সেলাই শিখত, সূচের কাজ উলের কাজ শিখত। সেদিন অর্থাৎ যেদিন মলিন শেখানোর কাজ আরম্ভ করে, সেদিন ওর একটা ক্লাসের শেষে মলিনের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মলিন তার দোকান থেকে কতকগুলি মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল। সেগুলি টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছিল। মাটির কাজ খুব বেশী মেয়ে শিখত না। যা-ও শিখত তা-ও ছিল বাজার থেকে কেনা সরা, কপ্‌টে, ভাঁড়, কলসী রঙ করার কাজ। কাজটা পুরনো, কিন্তু একালে—কালটা তখন ১৯৩৮।৩৯ সাল, একালের শিল্পীরা তাকে নতুন চেহারা দিয়েছেন। বিশেষ যামিনী রায়। বাগবাজারে রায় মহাশয়ের বাড়ী মলিনের বাড়ীর খুব কাছে না হলেও, পাড়াতেই ; সে অনেকদিন গিয়ে দেখে এসেছে। তার সঙ্গে মলিন কাঁচামাটির পুতুলের কাজ শেখাবে। ছাঁচ তৈরী, তা থেকে পুতুল করে রঙ করা কঠিন নয়। ছাঁচ থেকে নতুন জিনিষ প্ল্যাষ্টার

অব প্যারিস দিয়ে করতেও পারবে। মলিন তা-ও আয়ত্ত করেছে আজকাল।

মায়া এসে অন্য মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পুতুলগুলি। মলিন তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মায়ার হঠাৎ দৃষ্টি পড়েছিল তার দৃষ্টির দিকে। সে দৃষ্টি দেখে অস্বস্তি অনুভব করেই মায়া যাবার জন্যে ফিরেছিল দরজার মুখে।

মলিন চকিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—চলে যাচ্ছেন?

ফিরে মায়া বলেছিল—আমি এ কাজ শিখি না।

—শেখেন না?

—না। পুতুলগুলি দেখছিলাম। ভারী সুন্দর।

—শিখলে আপনিও পারবেন।

—নাঃ। ঘাড় নেড়ে একটু হেসে নাঃ বলে মায়া চলে গিয়েছিল।

পরের দিন ছিল গঙ্গাস্নানের একটা পর্ব। গঙ্গার ঘাটে ফড়িংকে পুতুল নিয়ে বসিয়ে দিত সে এসব পর্বে। বাগবাজারে একটা ছোট দোকানও করেছিল। সেদিন দেখা হয়ে গেল মায়ার সঙ্গে। মায়া মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছে। মায়ার কোঁকড়া চুলগুলি সেদিন খোলা ছিল। সদ্যস্নাতা মায়ার এই রূপ দেখে তার চিত্ত আরও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মায়া তার দিকে বক্রকটাক্ষে ফিরে তাকিয়েছিল, কিন্তু কথা বলে নি। সে-ও বলতে সাহস করে নি।

এর পরের দিন—নারী-মন্দির থেকে ফেরার পথে মায়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। মায়াও সেখান থেকে বাড়ী ফিরছিল। মলিনের বুকের মধ্যে ধোঁয়ানো আগুনে তখন শিখা দেখা দিয়েছে। মলিনের আকাঙ্খা দমে না, আজীবন বাধাবিঘ্ন ঠেলেই সে চলেছে। থামেনি কোনদিন, থামতে সে জানে না। এগিয়ে এসে সে বলেছিল—

আপনি, কিছু মনে করবেন না, আমাদের পাড়াতেই আপনার বাড়ী ;—না ?

মায়া তার দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে পথ চলতে চলতে বলেছিল—আমরা থাকি বাগবাজারে।

—তাই বলছি। কাল আপনাকে দেখলাম কিনা।

—হ্যাঁ, গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছিলাম।

এরপর কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মলিন বলেছিল - আপনি মাটির কাজ শেখেন না কেন ? ভাল পারবেন আপনি।

হেসে ফেলেছিল মায়া।—কি করে জানলেন ভাল পারব ?

—আপনার আঙুলের গড়ন দেখে। ভারী পাতলা আঙুল, আর বেশ লম্বা। বড় মূর্তি যদি করতে পারেন—ওঃ, ও-কাজের এখন খুব আদর হয়েছে !

হেসেই মায়া বলেছিল—আপনার করা পরমহংসের মূর্তি আমি দেখেছি। সত্যিই সুন্দর।

—আপনি শিখুন, আপনিও পারবেন। আমি বলছি।

—পারব ?

—আমি বলছি। আমি শিখিয়ে দেব। সেই দিন তখনই সে মায়ার হাতখানি ধ'রে আঙুলগুলি দেখে বলেছিল—চমৎকার পাতলা হাল্কা আঙুল। আঙুলের খেলাই ওতে বড় জিনিষ। হাল্কা ভাবে চেয়ারি ধরে, মিহি ঘন টানে আশ্চর্য খেলবে।

মৃদু আকর্ষণে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল মায়া। মলিন একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, বুঝেছিল হাত ধরা তার অন্যায় হয়েছে। মায়া নমস্কার করে বাঁয়ে ভেঙে চলে গিয়েছিল। প্রতিনমস্কারের জন্য দাঁড়ায় নি।

পরদিনই কিন্তু মায়া ক্লাশে এসেছিল, মাটির কাজ সে শিখবে। মলিন খুসী হয়ে বলেছিল—আপনি মূর্তি গড়া শিখুন।

একদিন বঙ্কিম ভট্টাচার্য নিজে এলেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার কারখানাতে। তাঁর হাতে একটি বেতের সাজি। সাজির মধ্যে একটি মাটির মূর্তি। বেশ বড় মূর্তিটি। প্রায় একফুট উঁচু। পরমহংসদেবের মূর্তি। গড়েছে মায়া। মূর্তিটি দেখাতেই আনেন নি, মূর্তিটির খুঁতগুলি সংশোধন করে নিখুঁত করে দিতে হবে। ভট্টাচার্য পরমহংসের ভক্ত; মেয়ের গড়া মূর্তিটি তিনি পূজা করবেন। আর এটিকে রঙ ক'রে দিতে হবে। নইলে মূর্তিটা মূর্তি-মূর্তি মনে হবে। মাটি মাটি ভাব ঘুচবে না। দিব্যি চোখ চেয়ে থাকবেন তবে তো!

মায়া লজ্জিত নত মুখে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কথায় তাঁর শিল্প-জ্ঞানের অজ্ঞতায় তার লজ্জা হয়েছে। বঙ্কিম ভটচাজ একনাগাড় বকেই গিয়েছিলেন—বাত হয়েছে, চাকরী গিয়েছে, আগে মেয়েস্কুলে পণ্ডিতি করতেন। আর সকাল সন্ধ্যে যতটা পারেন পুরোহিতের কাজ করতেন। বাড়ীতে একটি শালগ্রাম ছিল—সেটি নিয়ে লোকের বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম করতেন। ইচ্ছে ছিল—ছেলে দুটোকে পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু—। হাত নেড়ে বলেছিলেন—বলেন কেন? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং ন-চ বিদ্যা ন-চ পৌরুষং। একটা থিয়েটার করে; তাও এ্যাপ্রেন্টিস, মাইনে দেয় না। আর একটা রোয়াকে রোয়াকে আড্ডা দিয়ে ফেরে। মেয়েটা লক্ষ্মী। ওকে ছেলেবেলায় আমি যে ইস্কুলে পণ্ডিতি করতাম সেই ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম। বুদ্ধিসুদ্ধি ভালই ছিল।

তা ওর কপাল। ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠেছিল। কি দুর্মতি হল আমার। পড়া ছাড়িয়ে—।

—থাক না বাবা ও সব কথা!

ভটচাজ চেপে বসে বলেছিলেন—দাঁড়িয়ে থাকার কি উপায় আছে। বাত কনকন করে।

ব্যস্ত হয়ে একটা টিনের চেয়ার এনে পেতে দিয়ে মলিন বলেছিল—বসুন!

চেয়ারে বসে ভটচাজ বলেছিলেন—বিড়ি সিগারেট খান? দিন একটা, আপনি তো ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ।

—তবে জল খাওয়ান একটু।

এক গ্লাস জল এনে দিয়েছিল মলিন।—খান।

জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ভটচাজ বলেছিলেন—এখন যে জন্যে এসেছি, বলি শুনুন।

মলিনের বেশী সহ্য হচ্ছিল না। সে বলেছিল—ও রঙ করার মূর্তি তো নয়। তবে বলছেন—করে দেব। নিন, সিগারেট নিন।

সিগারেট খেতে খেতে ভটচাজ বলেছিলেন—দেবেন। আরও কথা আছে। আমি মশায়, প্রথম মায়া মাটির কাজ শিখবে শুনে আপত্তি করেছিলাম। বুঝেছেন। হ্যাঁ, সত্যি বলছি আমি। ও সেলাই কাটাই শিখছিল, সে শেখা ওর প্রায় হয়ে গিয়েছে। এখন ঘুরে-ফিরে দোকান থেকে কাজ নিতে পারলে সংসারে কিছু আসবে। আর ও মাটির পুতুল গড়তে শিখে কি হবে? কে বেচবে? হাঙ্গামা কত? মাটি আন, শুকোও, গড়, আবার শুকোও; শুকুবার জায়গা চাই, রোদ চাই; তারপর বৃষ্টি যদি এল

তো গলল, পড়ল তো ভাঙল ; নানান ফ্যাচাং, নানান ঝঞ্ঝাট। তা কিছুতেই ছাড়বে না। আজ এ ক'মাস এই চলছে। শেষে রেগে বললাম, বেশ, গড় একটা কিছু, আমার চোখের সামনে গড় ; তা পরমহংসের মূর্তিটি গড়লে। দেখলাম বেশ গড়েছে তো। তা আমাদের পাড়ার মস্ত ছবি আঁকিয়ে রায় মশায়কে দেখালাম। তিনি আবার আমার দেশের লোক। তিনি বললেন—ভাল। শেখান। শিখতে দেন। এতেই ওর ভবিষ্যত ভাল হবে। বুঝেছেন—তাই নিয়ে এসেছি ওকে। এইটিই আসল কথা। তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিন। একটু যত্ন ক'রে। বুঝেছেন !

হেসেছিল মলিন।—যত্ন ক'রে শেখাই তো। আর অল্প দিনেই মায়া বেশ শিখেছে।

—আরও একটু বেশী যত্ন নেবেন।

—নেব।

মায়া কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লজ্জায় বোধ হয় সে মরে যাচ্ছিল। এতক্ষণে সে বলেছিল—ওঠ বাবা !

—উঠি। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে বলেছিলেন—ওইগুলো বুঝি ভাঁটা। পুতুল পোড়ান ? কিন্তু, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—। এ কুম্ভকার মিস্ত্রীর কর্মে রুচি হল কেন ?

—আমার ছেলেবেলা থেকেই এদিকে ঝোঁক।

—ভাল। দেশ কোথায় ? কেষ্টনগর না কি ? আমার দেশ বাঁকুড়ো-বিষ্টুপুর, আমাদের দেশে গোপেশ্বর বাঁড়ুজ্জে মস্ত গাইয়ে, গাইয়ের ঘর। অনেকদিনের গাইয়ের পাট ওদের। বিষ্টুপুরটাই তাই। আমাদের সবাই হাঁ করতে পারে। আমিও পারতাম। বাজাতেও জানতাম। গলা ছিল না, বাজনায় হাত ভাল ছিল।

তা বলেছি তো কপাল। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং। ছেলেবেলা বাবা এসেছিলেন শালগ্রাম বুকে ঝুলিয়ে এখানে পুরুতের ব্যবসা করতে। সঙ্গে আমাকে এনেছিলেন। বাঁক্‌ড়োয় থাকলে বাজাতে শিখতাম। এর চেয়ে ঢের ভাল হ'ত।

মলিনের ইচ্ছা হচ্ছিল বৃদ্ধকে আঙুল বাড়িয়ে পথ দেখিয়ে বলে—যান। কিন্তু মায়ার জন্যে পারছিল না। মায়া সকরুণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে, তার মুখের প্রতিটি রেখার সঙ্কুচন-প্রসারণ লক্ষ্য করছে। সে আবার তাগিদ দিলে—বাবা চল।

—চলি। তা হলে আপনার বাড়ী কেষ্টনগর! তাই এমন হাত! ভাল হাত। আমার ও মূর্তিটি রঙ করে দেবেন তা হ'লে!

যাবার সময় আবার একটা সিগারেট নিয়ে তবে ভটচাজ গিয়েছিলেন। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আর মায়াকে একটু তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিন। একটু বেশী মন দেবেন ওর ওপরে।

মলিন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ওরা চলে যাবার পর। মনে পড়ে গিয়েছিল অনন্ত ঠাকুরকে। প্রশ্ন করে—ব্রাহ্মণ তো?

কিন্তু না। মায়ার বাপ! মায়া ও সব ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছে। করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে শতবার মার্জনা ভিক্ষা করেছে। মায়া! মায়ার চোখের সে দৃষ্টি তার ভিতর-বাহির ব্যপ্ত করে যেন মায়ার একটি রঙীন জাল বিস্তার করেছে।

পরের দিন নারী-মন্দিরে ক্লাসে মায়া একটু হেসেছিল মাত্র। ওখানে বড় সাবধান থাকতে হয়। অন্য মেয়েদের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

নারী-মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে দেখলে মায়া তার প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তার পথে

দেখা হত, কিন্তু সে এমন ভাবে নয়, মায়া তার জন্যে অপেক্ষা করত না। সে-ই এসে চারিদিক চেয়ে মায়াকে দেখে দ্রুত হেঁটে এসে তার সঙ্গে নিত। আজ মায়া তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। সে আসতেই মায়া বলেছিল—কাল কিছু মনে করেন নি তো?

—না-না-না। কি মনে করব? তোমার বাবা উনি!

—আমার এমন মনে হচ্ছিল! তাই ক্ষমা চাইবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম।

—ক্ষমা? না! সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলেছিল—আমি তোমায় ভালবাসি মায়া, ক্ষমা তোমার জন্যে নয়। তোমাকে নইলে আমার সব মিথ্যে। মায়া!

মায়ার হাতের স্পর্শে সে বুঝতে পারছিল মায়া চমকে উঠেছিল। মায়া কি চীৎকার করে উঠবে? না। তা ওঠেনি। অকারণে হাঁপাতে সুরু করেছিল। যেন জলে ডুবে যাচ্ছে সে, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই মৃদুস্বরে বলেছিল—ছাড়ুন।

—না। দৃঢ়স্বরে বলেছিল মলিন। ছাড়বে না সে। তার বুকের মধ্যে আবার উন্মত্ত ঝড় উঠেছে। যে ঝড় বাধা মানে না, বন্ধ মানে না; দুর্নিবার। মলিনের কোন জ্ঞান থাকে না। তুচ্ছ হয়ে যায় সব। এর জন্য প্রাণ তুচ্ছ, অর্থ তুচ্ছ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুছে যায়; থাকে সে আর থাকে যাকে চায় সে।—তোমাকে আমি বিয়ে করব মায়া।

—আমি বিধবা! ছাড়ুন, ছেড়ে দিন আমাকে।

চমকে উঠেছিল মলিন। হাতের মুঠো আলগা হয়ে আপনি খসে পড়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়। সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। কিন্তু মায়া থামেনি। হাতছাড়া পেয়ে সে তাকে অতিক্রম ক'রে চলে গিয়েছিল।

সেদিন সারাটা সন্ধ্যা সে লক্ষ্যহীন হয়ে প্রায় বিকৃত-মস্তিষ্কের মত কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছিল। সারা রাত্রি ঘুমোয় নি। না। মায়াকে নইলে তার জীবন বৃথা, জীবন ব্যর্থ। সব মিথ্যা। বিধবা? কিসের বৈধব্য? বিধবার বিবাহ হয়! নাই যদি হত—তাতেই কি? সে ভালবাসে—তার ভালোবাসা—বিশ্বগ্রাসী তার ভালোবাসা, সে ভালোবাসা মানবে কেন? সে কিছু মানে না, কিছু বোঝে না: ঈশ্বর নিজে এসে বললেও সে মানবে না, আগুনের অক্ষরে-লেখা বিধানটা তার চোখের সামনে ধরলেও সে বুঝবে না। ঈশ্বর সে মানে না। যম, মৃত্যু,—তাকে মানে, না-মেনে উপায় নেই; সে এসে সামনে রক্তচক্ষু মেলে শাসন ক'রে দাঁড়ালেও সে মানবে না। পারবে না, মায়াকে পাবার বাসনা পরিত্যাগ করতে পারবে না। মায়াকে নিয়ে চলে যাবে সে দূর-দূরান্তে।

ভোর বেলায় উঠে সে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল। মায়া যদি আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অধীর হয়ে উঠল সে। মায়া এল না। সে মায়াদের বাড়ীর গলিটায় ঢুকে হেঁটে গেল বাড়ীটার সামনে দিয়ে। বাড়ীটার নম্বর বের ক'রে থমকে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। ডাকবে? বঙ্কিম ভটচাজকে সরাসরি বলবে—বিধবা মায়াকে সে বিয়ে করবে। তার সংসারের সব ভার নেবে সে! কিন্তু সে পারলে না। দাঁড়িয়ে থাকতেও সাহস হল না। চলে গেল। আবার ফিরে এল। আবার ফিরল। সামান্য বাড়ী। জীর্ণ একতলা একটা দালানের

সামনে এক টুকরো উঠান—পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ উপরের দিকে একটা আর্তনাদের মত ধাতব শব্দ উঠল, সেই শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে সে দেখলে, ছাদের সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাঁড়িয়েছে মায়া; আলসের উপর দিয়ে শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে তার। তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল; মায়া হাত নেড়ে ইসারায় জানালে—যাও। যাও। যাও।

সে মাথা নাড়লে—না-না-না।

মায়া আবার জানালে—যাও। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে নেমে চলে গেল।

কি করবে সে? উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে দাঁড়াল বড় রাস্তার উপর। কয়েক মিনিট পরেই তার আর উল্লাসের সীমা রইল না। মায়া। মায়া বেরিয়ে এসেছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইছে। চোখাচোখি হ'তেই মায়া হন হন করে চলতে লাগল। হাতে তার নারী-মন্দিরে যাওয়ার ব্যাগটা। মলিন তাকে অনুসরণ করলে। অনেক দূর এসে মায়া দাঁড়াল। চিৎপুরের রাস্তায় একটা ট্রাম স্টপ। সবে সকালবেলা। তখন ভিড় নেই। মলিন এসে পাশে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছিল সে।

একা দাঁড়িয়েছিল মায়া। মায়াও হাঁপাচ্ছিল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। একটা কি যেন বিপর্যয় বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। সে বললে—চল কোথায় নিয়ে যাবে! আমি এসেছি।

—মায়া! সে কথা খুঁজে পেলে না।

—চুপ কর, ট্রাম আসছে, ওঠ।

ট্রামে উঠে পড়েছিল তারা। মায়া আগে উঠেছিল। অল্প কয়েকজন লোক ট্রামে। তখন ১৯৩৯ সাল, কলকাতার জীবনে

এ ভিড় ছিল না। ট্রামে উঠে পাশাপাশি বসে মায়া বলেছিল—কালীঘাট যাব।

এসপ্লানেডে নেমে বলেছিল—চল হেঁটে চলি খানিকটা। কথা বলি।

হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল—কাল সারারাত আমি ভেবেছি।

—আমি পাগলের মত ঘুরেছি উঠোনে। মনে হয়েছিল, রাত্রেই এসে তোমাকে চীৎকার ক'রে ডাকি, মায়া, তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না। ভোরে উঠে—।

—আমি জেগেছি সারারাত। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। হেরেছি। তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না। অকস্মাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার, রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—এ তুমি কি করলে আমার! চোখ থেকে তার জল পড়তে লাগল।

—মায়া! কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মলিন তার চোখ মুছিয়ে দিতে গিয়েছিল।

মায়া সরে গিয়ে বলেছিল—লোকের চোখে পড়বে! একটা গাড়ী কি ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সিতে উঠে মায়াই বলেছিল—কালীঘাট চলো।

মলিন তার হাতখানি নিজের হাতে টেনে নিয়ে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে বলেছিল—আঃ! তোমাকে না-পেলে আমি হয়তো আত্মহত্যা করতাম। হয়তো—

—কি হয়তো?

—হয়তো তোমাকেও খুন করতাম! তোমাকে ছুরি মেরে নিজের বুকে মারতাম। আমাকে জান না মায়া। আমি যা চাই তা না পেলে আমি পাগল হয়ে যাই।

হেসেছিল মায়া। বললে—তা জানলে আমি আসতাম না। আমাকে খুন করে খুন হলে সে যে আমার সুখের স্বর্গ হত। আগে কেন বললে না গো?

মলিনও হেসেছিল।

মায়া বলেছিল—কালীঘাটে যাচ্ছি, তুমি আমার মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেবে। আমাদের বিয়ে হবে। তারপর কোথা যাবে চল, আমি তোমার।

—বিয়ে? চকিত হয়ে তাকিয়েছিল মলিন মায়ার দিকে।

প্রশ্নটা শুনে মায়াও চকিত হয়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ। নইলে—আমি কি—? আমি কি ব্যাভিচারিনী হব? বিধবারও বিয়ের নিয়ম আছে।

—না। তা আমি বলিনি।

—তবে চমকে উঠলে কেন?

—অন্য কারণে।

—কি?

—বিয়ে কি এমনি করে হবে? দিনে, শুধু সিঁদুর দিয়ে? হঠাৎ হাসলে মলিন, বললে, আরও ভাবছিলাম—যদি ঠকাই তোমাকে আমি—সে কি বিয়ে হলেই—

বাধা দিয়ে মায়া বললে—ঠকাবে? মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলেছিল—সে তোমার ধর্ম। আমার ধর্মে আমি ঠিক থাকব। আর বিয়ে এমনি করেই হবে। এমন হয় শুনেছি।

মলিন চমকেছিল অন্য কারণে। মলিনের মনে আছে। সে চমকেছিল—তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ে মায়ার বিয়ে?

গাড়ী কালীঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে পকেটে হাত দিয়ে মলিন হিম হয়ে গিয়েছিল। মায়া জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল?

—টাকা।

—আন নি? আমার কপাল! বলে হেসে ব্লাউজের ভিতর থেকে ছোট একটি ব্যাগ বের ক'রে তার ভিতর থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে দিয়েছিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মায়ার টাকায় ভাড়া চুকিয়ে মলিন প্রথম বিক্রী করেছিল তার সোনার বোতাম। কত টাকা? টাকাগুলি নেড়েচেড়ে বলেছিল—এতে কি ক'রে হবে?

মায়া বলেছিল—কি করবে? প্রেমে পাগল হলে এমনি হয়। টাকার কথাও ভুল হয়ে যায়। তোমার ভালবাসায় আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—আমার কাছে কিছু নেই। একটি জিনিষ আছে, একটা আংটি। সে বিক্রী ক'রে ক' টাকাই বা হবে, তা বিক্রী করতেও আমি পারব না।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ মলিন বলেছিল—চল। এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ফিরে যাব, টাকা নিয়ে আসব।

—বেশ, আমি মন্দিরে বসে থাকি—তুমি যাও, নিয়ে এস।

—না। তুমি, পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি চেক বই, টাকা নিয়ে আসব।

—ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ওখান থেকেই যদি উধাও হই আমি ?
হেসে ফেলেছিল মায়া। মায়া সেদিন ওইটুকু সময়ের মধ্যেই, কথায় বার্তায় রূপে রঙে যেন কোন যাদুর ছোঁয়া পেয়েছিল। ট্রাম-স্টপের কাছে মায়াকে যখন দেখেছিল, তখন তার উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ মুখখানা যেন সাদা হয়ে গিয়েছিল ; যেন সমস্ত রাত্রি ধরে তার বুকের রক্ত ক্ষয়িত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে ; চোখ দুটো শুধু ছিল রাঙা, অবশিষ্ট রক্তটুকু যেন আশ্রয় নিয়েছিল তার চোখে ; দৃষ্টি ছিল উদ্‌ভ্রান্ত। তাতে সর্বনাশের আতঙ্কের বিহ্বলতা। এরই মধ্যে সব কেটে গিয়েছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়া কার্তিকের প্রথম হিমরাত্রির শিশির-ক্লিষ্ট লাল পদ্মের মত রূপে, রসে, গন্ধে, নতুন সতেজ লাবণ্যে নবীন জীবন ফুটে উঠেছে। মুখরা হয়ে উঠেছে। সূর্য সে।

মলিন বলেছিল—কোথায় যাবে তুমি ? যদি মর, তবে সেখানে ছুটব আমি।

মলিন বাসায় টাকা বেশী রাখত না। তখন সে ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে শিখেছে। চার বছরে তার কম টাকা জমে নি। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

—বাইরে একটা বড় কাজ পেয়েছি। অনেক টাকার। অনেক মূর্তি গড়তে হবে। বড় বড় মূর্তি। গান্ধীজির, দেশবন্ধুর, মতিলাল নেহরুর, আরও অনেকের। যাচ্ছি আমি সেখানে। হঠাৎ খবর পেয়েছি। ফিরতে ক'দিন দেরী হবে। দিন বিক্রীর টাকা থেকে তোমরা চালিয়ো।

সঙ্গে নিয়েছিল ফড়িংকে। চলুক—ফড়িং চলুক। ফড়িংকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আর নিয়েছিল একটা স্যুটকেস।—কাজ

পাকা হলেই ফিরব। আরও লোক চাই। সে সব ঠিক করব তখন।

চলো মুসাফের। না, মুসাফের নয়। মুসাফের একা। এবার তারা দুজন।

ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় সব টাকাটাই তুলে মায়াকে নিয়ে আবার চলেছিল। বাজারে কিনেছিল অনেক টাকার জিনিষ। মায়া বলেছিল —এত কেন?

—চাই। আরও অনেক চাই। অনেক। গহনা কিনব। কয়েক শো টাকার গহনাও কিনেছিল। সর্বস্বান্ত হতেও তার আপত্তি ছিল না। আপত্তি? তাতেই ছিল তার সর্বোত্তম উল্লাস।

ফড়িং, বিচিত্র ফড়িং। সে অবাকও হয় নি। মলিনের উল্লাস দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল সে। উল্লাসের সঙ্গে সম্ভারগুলি বয়ে বয়ে ট্যাক্সিতে বোঝাই করেছিল।

এরপর মলিনের মস্তিষ্ক কাজ করেছিল মূল্যবান সুইস ঘড়ির মত। ঘাটে ঘাটে সুনির্দিষ্ট গতিতে কাঁটায় কাঁটায় সময় রেখে চলার মত যেটির পর যেটি তাই করে গিয়েছিল। মায়াকে একটা ঘড়িও সে কিনে দিয়েছিল আশী টাকা দিয়ে।

জিনিষপত্র নিয়ে উঠেছিল একটা হোটেলে। মায়াকে বলেছিল —ঘোমটা দিয়ে নাও। সেখানে ভাল একখানা ঘর নিয়ে, অগ্রিম সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে, হোটেলের বয়দের ছুতো-নাতায় বকশিস দিয়ে সোরগোল তুলেছিল। অনেকদূর থেকে তারা আসছে। স্বামী স্ত্রী। যাবে আরও অনেকদূর। পথে একদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। কাল সকালেই তারা চলে যাবে।

মায়ার চোখে তখন জীবনের রঙ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। তার

জন্য কেউ এত আয়োজন করবে এ সে কোনদিন কল্পনাও করে নি। জীবন তার রিক্ত জীবন, সব রঙ ধুয়ে মুছে রঙ-জ্বলে-যাওয়া পুরনো শাড়ীর মত বিবর্ণ, জীবনের চারিপাশে সেই প্রায় একশো বছর বয়সের জীর্ণ, সাঁতসেঁতে ভ্যাপসা-গন্ধ-ওঠা দেওয়ালের পরিবেষ্টনী ; —তার সেই জীবনের চারিপাশে এত রঙের আয়োজন, এত রঙীন কাপড় ; এত আভরণ সাজানো ; এত সুরভিত প্রসাধন সম্ভার ; এমন সুন্দর রঙীন-দেওয়ালের ঘের, এমন খাট, এমন বিছানা, মেঝেতে সতরঞ্জি পাতা, ওপাশে ড্রেসিং টেবিল, একপাশে একটি সোফা সেট ; মাথার উপর পাখা, এমন সুন্দর শেড-দেওয়া আলো। তার জীবনে একি আবেগ, একি উল্লাস ! এত মূল্য ? আয়নার ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখেও সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। গাল দুটি তার এমন রক্তিম হয়ে উঠেছে ! চোখের দৃষ্টিতে এমন মাধুরী !

সে বলেছিল—কেন ? কাল চলে যাবে কেন ? কোথায় যাবে ?

—কোথায় তা ঠিক করি নি। তবে যাব। তোমার বাবা বেতো-মানুষ, বুড়ো, কিন্তু তোমার দাদারা ? পাড়াটা কাঁপে ওদের হুঙ্কারে। তারা তোলপাড় ক'রে বেড়াবে।

—না। দু তিন-দিন তা করবে না। কাল রাত্রে দুর্দান্ত ঝগড়া করেছি। ছোড়দা খেতে পায়নি বলে লাথি মেরেছিল। বাবার মুখের উপর জবাব করেছিলাম, বলেছিলাম—পারব না সারাদিন খেটে দাসীবৃত্তি করতে। বাবা বলেছিল—যা কোথায় রাণী-গিরির গদী তোর জন্যে পাতা আছে ! আমার মন তখন হু হু করছে। আমি বুঝতে পারছি তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না ; সব তেতো,

সব তপ্ত, সব অন্ধকার। ঝগড়া মধ্যে মধ্যে কেন, প্রায়ই হয়। কিন্তু এমন কখনও হয় না! ঝগড়া বেশী হলে আমি রাগ ক'রে চলে যাই, কখনও নারী-মন্দিরেই থাকি, কখনও আমার মাসীর বাড়ী গিয়ে থাকি। দুদিন ওরা খোঁজ করে না। মা রোগা, বারমাস অম্বলের ব্যাধি, আগুনতাতে যাওয়া সয় না, মা দুদিন তিনদিন রাঁধে, তারপর কলিক ওঠে, বিছানা নেয়। তখন খোঁজ করে আমার। আমিও ফিরে যাই!

ম্লান হাসি দেখা দিয়েছিল মায়ার মুখে ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ। ম্লান হাসিটাই যেন উস্কে দেওয়া প্রদীপের স্তিমিত শিখার মত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। বলেছিল—আর যাব না। আমাকে এত অহঙ্কার দিলে তুমি, রাণী-গিরির গদী দিয়েছ। বেঁচেছি আমি! আঃ!

তারপরই লুকোচুরি খেলায় লুকোনো ছোট মেয়ের মত ঘাড় নেড়ে কৌতুকের হাসির সঙ্গে বলেছিল—দুদিন তিনদিন ভেবো না। দু দিন তো বটেই। তারপরও খোঁজ খোঁজ করে একটা দিন। এ সুন্দর ঘর। সুন্দর জায়গা! দু দিন এখানে থেকে—তারপর, তারপর যেখানে হয় যাব।

সন্ধ্যার আগে বেনারসী পরে অতি যত্নে প্রসাধন ক'রে তারা বেরিয়েছিল কালীঘাটে। পুরোহিত ইত্যাদি ঠিক করাই ছিল। মায়াকে হোটেলে রেখে মলিন গিয়ে ঠিক ক'রে এসেছিল। বিবাহের পর ফিরেছিল ফুল কিনে।

ঘরের সব আলো জ্বেলে দিয়ে—দরজা বন্ধ ক'রে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা! স্বপ্নের মত। মায়ার মুখে সে কি সুন্দর হাসি!

বিষ থাকলে মলিন সেদিন মায়াকে খাইয়ে নিজে খেয়ে মায়াকে সবল আলিঙ্গনে বেঁধে ওই ফুলের বিছানায় শুয়ে পড়ত। এ ঘুম যেন না ভাঙে। এ বন্ধন যেন আর না খোলে! এ আবেগ যেন ফুরিয়ে না যায়।

মলিন এমনি উন্মাদ হয়ে থাকতেই চায়; এ নইলে সে হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় তার মৃত্যু হচ্ছে। বেদনাহত হয়ে শুধু হায় হায় করে! তৃষ্ণা ফুরিয়ে গেলে মানুষ বাঁচে! কেন এ উন্মাদনা ফুরিয়ে যায়?

॥ চার ॥

তিনদিন পর ওরা চলে গিয়েছিল।

সময়টা ছিল আশ্বিন মাসের প্রথম। মলিনের খেয়ালের কৈফিয়ৎ এক মলিনই দিতে পারে। একদিন গঙ্গার ধারে স্ট্রাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে স্থির করেছিল—ট্রেনে যাবে না তারা, স্টীমারে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল একটা স্টীমার এ সময় পাটনা পর্যন্ত যায়।

সেই স্টীমারে পাটনা গিয়ে উঠেছিল।

পাটনাতেই বাসা পেতেছিল। সুন্দর বাসাটি। ছোট্ট বাসা; তবে খানিকটা জায়গা দেখে সে নিয়েছিল। শহরের একটেরে। শহর ওইদিকে তখন বাড়ছে। ভাড়া সস্তা। মনের মত করে সাজিয়েছিল। নানান বিচিত্র টুকিটাকি কিনে এনে অপূর্ব পরিবেশ তৈরি করেছিল।

লম্বা গড়নের প্যাকিং বাক্স কিনে এনে সাদা রঙ দিয়ে, তার

উপর উজ্জ্বল রঙের বিছানার চাদরের মাপ-করা টুকরো বিছিয়ে যখন বসবার আসন তৈরী করেছিল—তখন মায়ার চোখেও বিস্ময় ফুটেছিল। সেও শিল্প-শিক্ষার্থিনী, তারও শিল্প-বোধ কিছু ছিল। এবং এ জিনিষ না দেখাও নয়। কিন্তু কই, তার মনে তো হয় নি! ভাঁড়-খুরি-দীপগাছা এবং ওখানকার পোড়ানো গ্রাম্য পুতুল কিনে এনে তাকে রঙ করে অপরূপ করে তুলেছিল মলিন। এ সবই তাদের পাড়ার বিখ্যাত শিল্পী রায়ের বাড়ীতে সে দেখেছে। মলিনও দেখেছে। কিন্তু এমন সুন্দর অনুকরণ মলিন করতে পারবে তা মায়া ভাবে নি। একদিন কয়েকখানা ছোট মাদুর কিনে নিয়ে এসেছিল মলিন। মায়া বলেছিল—ছেলেদের মাদুর? আর ওগুলো? শোলার খেলা-ফুল! কি হবে এসব?

—দরকার হবে।

মায়ার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মলিন সে দিকেই যায় নি, ভাবেও নি; মায়ার মুখ দেখেও মনে হয় নি; সে তার আরক্তিম মুখের দিকে চেয়ে আবেশ মত্ত হয়ে পা-পা করে এগিয়ে এসে তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছিল। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার পড়েছিল মাদুর ক'খানা নিয়ে। চারদিকের দেওয়ালে চারখানা মাদুর পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। খেলা-ফুলগুলি ঝুলিয়ে দিয়েছিল মাদুরের মাথায়। তার শোভা দেখে মায়া বলেছিল—তুমি ম্যাজিক জান। তুমি যাদুকর!

তারপর আরম্ভ করেছিল কাজ!

মূর্তি গড়তে আরম্ভ করেছিল। তিনজনে—সে, মায়া আর ফড়িং।

ফড়িং ভালবাসত পুতুলের কাজ। সে বলেছিল—ভাঁটাঃ করিঃ, পুতুলঃ করঃ। পুতুলঃ ভালঃ।

—কর, তুই কর। ছাঁচ আমি এনেছি। ভুলি নি।

মূর্তি তৈরী ক'রে সে বড় বড় বাঙালীদের বাড়ী নিয়ে দেখিয়ে এনেছিল। বিক্রী হতে সুরুও হয়েছিল। ব্যবসায় বুদ্ধিতেও সে চতুর। গান্ধীজী, দেশবন্ধু, মতিলালের মূর্তির সঙ্গে বিহারের নেতাদেরও মূর্তি তৈরী করতে ভুল হয় নি তার। উপার্জনের পথ তার খুলে গিয়েছে।

সেই দিন দশটি মূর্তি ছু শো টাকায় বিক্রী করে ওখানকার একজন জমিদারের মূর্তি গড়ার অর্ডার নিয়ে ফিরে এসে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—আমি কখনও হারব না মায়া। জিতে আমি যাবই।

—নাও। টাকা নাও। ভাবছিলে, খরচ বেশী হচ্ছে। মজুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই সুরু।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! তাদের মূর্তি গড়ার জায়গা করেছিল বারান্দা ঘিরে, দেবদারু কাঠের ফ্রেমে ক্যাম্বিস এঁটে—সাদা রঙ ক'রে ছোট্ট একটি স্টুডিয়ো; ধবধব করত; তারই মধ্যে তুজনের কলহাস্য ধ্বনিত হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। সময় সময় স্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে টুকরো কথা। কখনও অকস্মাৎ একজন একজনের মুখে আঙুলের কাদা লাগিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেত। এ ছুটত ওর পিছনে। ধরত। এ বলত—লক্ষ্মীটি। বেশী না। বেশী দিও না। মলিন বলত—ঘাট মানছি। আর করব না। কখনও বলত—দাঁড়াও না, মুখ পেতে দিচ্ছি। মাখাও। মাখাও।

রাত্রিগুলি মধু রাত্রি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যেত। থাকত

শুধু ওরা দুজনে। দিনে দিনে আশ্চর্য রূপ খুলছে মায়ার। মায়া যেন—মোহিনী মায়া! বিশ্বসংসারে যেন নেমে এসেছিল একটি শরৎ পূর্ণিমার রাত্রি। কোজাগরী পূর্ণিমা। সে রাত্রে তারা দুজনে চোখে মোহাঞ্জন প'রে জেগেই ছিল—জেগেই ছিল—জেগেই ছিল।

অকস্মাৎ কোথা থেকে এল যেন মেঘ আর ঝড়। যেন আশ্বিনের সাইক্লোন। অন্ধকার হয়ে গেল সব, দরজা জানালা সশব্দে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল, চমকে উঠল মলিন। ঘোর কেটে গেল। একদিন মায়া বললে—একবার ডাক্তার দেখাতে হবে।

—কি হল? শরীর খারাপ? কি হয়েছে? কপালে হাত দিলে সে।

হেসে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলেছিল মায়া—লেডী ডাক্তার!

—লেডী ডাক্তার?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কি বোকা তুমি। হেসে সে চলে গিয়েছিল।

মলিন হাতের কাঠের ছুরিটা ফেলে দিয়ে তার অনুসরণ করে ঘরে এসে অপলক দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল কিছুক্ষণ। তার সে দৃষ্টি দেখে মায়া বিস্মিত হয়েছিল, তবু হেসে বলেছিল—দেখছ কি এমন ক'রে?

—কিছু না। বেরিয়ে চলে গিয়েছিল সে।

ভাল না লাগার সুর বেজে উঠেছিল। দীর্ঘক্ষণ ঘুরে বাড়ী ফিরেছিল।

মায়া সরাসরি এসে বলেছিল—কি, সুরু হল?

—কি?

—অনাদর? ভাল না-লাগা? বল, আমার পথ আমি জানি।

—পথ জান ?

—গঙ্গার ঘাটের পথ আমি চিনি।

শিউরে উঠেছিল মলিন। চন্দননগরের মলিন পালটেছে। সে বলতে পারে নি—এখন নয়, রাত্রে যেয়ো মায়া। লোকে যেন না দেখতে পায়। শব্দ যেন কারু কানে না ওঠে।

মলিন পালটেছে। সে শিউরে উঠল। বললে—না মায়া, না। না। তুমি পথের কথা বললে—বললে পথ জান। আমি ভাবলাম—তুমি পালিয়ে যাবে।

—কোথায় ? তুমি ভিন্ন আমার আর আশ্রয় কোথায় আছে বল ? বাপের বাড়ী ? তা—। হাসলে মায়া।

মলিন ভাবতে চেষ্টা করেছিল—ছোট্ট একটি ছেলের কথা। ছেলে। তার ছেলে। তার মত সুন্দর, মায়ার মত চোখ, তার মত তুলির হাত, মায়ার মত কথা। খলখল হাসি, গাল ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, আবোল তাবোল বকা, অপটু পায়ে নাচা, ছোট নরম হাতে রাগ ক'রে মারা ! নতুন রঙ, নতুন গন্ধ, নতুন স্বর !

তার আগেই কিন্তু মলিনের অসহ্য হয়ে উঠল। মায়া তখন পূর্ণ-গর্ভা। মায়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার উপর। বিছানায় শুয়ে থাকত। মলিন তাকাতে পারত না তার দিকে। অন্তরের ক্ষোভ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ত না, আক্ষেপের হাহাকারে ছড়িয়ে পড়ত। শীতের বাতাসে বাথরুমের ছিটকিনি-ভাঙা একটা জানলার কব্জায় গভীর রাত্রে একটা একটানা ক্যাঁ—ক্যাঁ শব্দ উঠত—সেই শব্দটা শুনে মলিন প্রথম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—ভিতরের সুরটি বাইরে বাজছে কোথায়, কেমন করে ?

মলিন রাগতে চেষ্টা করত। রাগলে সে পারে। সব পারে।

মদ খাওয়া বাড়িয়ে ছিল সে। মায়া প্রথম আপত্তি করেছিল, ঝগড়া করেছিল, মলিন রাগ করতে পারে নি, দৃঢ়ভাবে বলেছিল-না খেলে সে পারছে না। দেহ তার বইছে না।

মানতে হয়েছিল মায়াকে। মদ খেয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হত। কিন্তু মায়ার সামনে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। শান্ত ধ্যানমগ্নার মত শুয়ে থাকত মায়া। বেরিয়ে এসে অকারণে মারত ফড়িংকে।

ফড়িং বাধা দিত না। বলত—অঃ ছাড়ঃ, লাগছেঃ অঃ খুবঃ লাগছেঃ। মায়া বেরিয়ে আসত শ্রান্ত পদক্ষেপে, ক্লান্তস্বরে মান হেসে বলত—ছাড়। ছিঃ, কি করছ ? ছাড়া পেয়ে ফড়িং বলত—শোঃও, ঘুমিয়েঃ পঃড়ঃ। বাঃতাস করিঃ।

জীবনে যে সাইক্লোন উঠেছে—সে সাইক্লোন কাটছে না। দিন দিন যেন বাড়ছে।

ফড়িংই তাকে ঘুম পাড়াত।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন। এক মুহূর্তে মলিন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, তিক্ত হয়ে উঠল ; একটানে বন্ধন যেন ছিঁড়ে গেল। তিক্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছিল—কেঁদো না, কেঁদো না। সইতে আমি পারি না। ভারী আমার ভাই ! কি হবে ? গুণ্ডার ফাঁসী হবে না তো হবে কি ? তার জন্য কান্না কিসের ?

মায়া অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

খবরের কাগজ পড়ছিল সে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে—'হত্যাপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ড ; বেশ্যাগৃহে বন্ধুতে বন্ধুতে কলহের শোচনীয় পরিণাম !'

মায়ার ছোড়দা ছ'নে—বিমল, এক বন্ধুকে ছুরি মেরেছিল, বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। মেয়েটা চীৎকার করেছিল, তাকেও সে ছুরি

মেরেছিল কিন্তু সে মরেনি। আশপাশ ঘরের লোকজন এসে তাকে ধরে ফেলে পুলিশের হাতে দিয়েছিল। 'জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আসামী বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দোষী ঘোষণা করায়—তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া বিচারক প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।'

মায়া কেঁদে উঠতেই কাজ ছেড়ে ছুটে এসেছিল মলিন—কি হল?

খবরটা দেখিয়ে দিয়েছিল মায়া কাঁদতে কাঁদতে।—আমার জন্যে। আমার জন্যে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল মায়া।

'বেশ্যালয়ে মদ্যপান করিয়া হতব্যক্তি আসামী বিমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কলহ প্রসঙ্গে তাহার ভগ্নীর প্রসঙ্গ তুলিয়া কুৎসিৎ কথা বলিয়াছিল।'

কাগজখানা ফেলে দিয়ে মলিন বলেছিল—ছ'নের এই পরিণাম সুনির্দিষ্ট। কেঁদো না ওর জন্যে।

—আমার জন্যে। আমার জন্যে।

—না। তোমার জন্যে নয়। বেশ্যাবাড়ী গিয়ে মদ খেয়ে ছ'নে যে কোন কথা নিয়েই ঝগড়া করে এই করত। কেঁদো না। কান্না আমার ভাল লাগে না। আমি নিজে কাঁদি না, কাঁদতে পারি না।

অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল মলিন—আমার মা মরলে আমি কাঁদিনি।

মায়া উঠে প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাধা দিয়ে মলিন বলেছিল—কোথায় যাবে?

—কাঁদতে। কাঁদতে যাচ্ছি আমি। গঙ্গার ধারে।

—না। ওই ঘরে গিয়েই কাঁদ। যত পার কাঁদ।

সে তাকে প্রায় ঠেলেই ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিয়েছিল দুরন্ত ক্রোধে। দুরন্ত ক্রোধ হয়েছিল তার। ক্রোধ হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। কারণ কি সে বুঝতে পারেনি। আজও পারে না। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে শীর্ণদেহ আসন্নপ্রসবা মায়ার কান্না দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সটান গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, সেখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে ষ্টেশনে, কাশীর টিকিট কেটে গিয়েছিল কাশী। কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ। চার মাস পর ফিরে এসেছিল পাটনায়। পাটনার বাসা শূন্য। সেখানে শুনেছিল যে মাস কয়েক আগে মায়ার একটি মেয়ে হয়েছিল। মায়ার খুব অসুখ করেছিল। কিছুদিন আগে মায়ার ভাই চিঠি পেয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছে কলকাতা। ফড়িংও সঙ্গে গিয়েছে। এখানকার বাসা তুলে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে।

কলকাতায়—বাড়ী ফিরে গিয়েছে মায়া?

মায়াকে সে চিঠি লিখেছিল। মায়া লিখেছিল—তুমি ফিরে এস। আমাকে আর একবার উদ্ধার কর। আমি নিজে আসিনি। আমার তখন অসুখ, ফড়িং কাকে দিয়ে বাবাকে খবর দিয়েছিল। তখন প্রসবের পর আমার বড় সংকটের অবস্থা। বড়দাদা এসে নিয়ে গেলেন। আমাকে বাবা প্রায় বন্দিনী করে রেখেছেন। তুমি আমায় বাঁচাও। তুমি ভিন্ন আমি বাঁচব না।

বাঁচবে না? হেসেছিল মলিন। মরা যত সহজ তত কঠিন। কিন্তু প্রথমটা সত্য নয়, সত্য শেষেরটা। মায়া! মায়ার উপর সে আকর্ষণ আর নাই। না—নাই। মুক্তি পেয়ে সে বেঁচেছে। না, তা ঠিক নয়। তবে সে ফিরে এল কেন? মায়া ঠিক টিয়ার মত নয়। মায়া দেহে দেউলিয়া হয়ে গেছে, রূপশ্রী তার ঝলসে গেছে,

তবু মায়াকে মনে পড়ে। মায়ার একটা মন আছে। আছে। সেই মনটা। অবশ্য ওইটেই সব নয়; মায়ার কাছে তার কতকগুলো মূল্যবান জিনিষ আছে। সেগুলো তার চাই। টাকা পয়সা তার ফুরিয়ে এসেছে। টাকা কিছু মায়ার কাছে থাকার কথা। গহনাও তাকে সে কম দেয়নি। কিন্তু সে তা ফিরে চায় না। সে মায়ারই থাক। মায়াকে সে মূর্তি গড়ার কাজও শিখিয়েছে। করে সে ওতে খেতে পারবে। সে চায় শুধু তার সার্টিফিকেটগুলো। তার প্রশংসা-পত্রগুলো। লক্ষ্ণৌ ঘুরে এসেছে সে। ওখানে ভাল পুতুল হয়। সে লক্ষ্ণৌয়ে যাবে। সেখানে বসবে। সার্টিফিকেটগুলো তার চাই।

ফিরে এল সে কলকাতায়। নামবে পুরনো আস্তানায়। জানে না সে আস্তানাগুলো আছে কি না। তবে বাড়ীওয়ালাকে সে এক সঙ্গে অনেক টাকা দিয়েছিল, পাঁচশো টাকা। বাড়ীতে ভাঁটা করার জন্য ছ মাসের ভাড়া অগ্রিম দেবারই কড়ার ছিল। বাড়ীওলার প্রয়োজনে পাঁচশো টাকা দিয়ে ভাড়াটা কিছু কমিয়ে নিয়েছিল সে। ত্রিশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা, বারো মাসে ষাট টাকা কম। সে সুযোগ সে ছাড়ে নি। তার রসিদটা তার স্যুটকেসে আছে। গালিফ স্ট্রীটে সে ট্যাক্সি থেকে নেমে বাসায় এসে ঢুকল।

বাসাটা আছে। কিন্তু হাঁ-হাঁ করছে, খাঁ-খাঁ করছে। লোক-জন কেউ নেই। ভাঁটাগুলো ভেঙে গেছে, চিমনীটা ভেঙে পড়েছে। দরজাগুলো খোলা। একটা ঘর শুধু ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিলে সে।—কে আছ? কে আছ? কে?

বেরিয়ে এল ফড়িং।

—ফড়িং!

—কাঃরিগঃরঃ! মুখখানা এমন হয়ে গেল যে তার চেয়ে ফড়িং কাঁদলে কি হাসলে ভাল ছিল। মলিন বুঝতে পারলে না—সে হাসতে চায়, না কাঁদতে চায়।

—রাখ জিনিস তুলে। বসবার কিছু থাকে তো দে। মায়াকে খবর দিতে হবে।

জিনিষ সামান্য। একটা স্যুটকেস, একটা বিছানা। বসবার কিছু নেই। মলিন রুমাল দিয়ে ঝেড়ে দাওয়ার উপরই বসল। জিজ্ঞাসা করলে—মায়ার সঙ্গে তোর দেখা হয়? কেমন আছে সে?

উত্তর না পেয়ে ডাকলে—ফড়িং। এবারও উত্তর পেলে না। ছোঁড়া কি— ?

অস্বস্তি অনুভব করলে মলিন। চীৎকার করে গোল না বাধায় হাবা।

পাশের বস্তী থেকে উঁকি মারছে কে।—কম্পাউণ্ডার নৃপেন!

—রায় মশায়, কেমন? কখন? মর্তধামে কখন পদার্পণ হল! বলিহারি বলিহারি! ও শ্যাম, মলিন রায়, বিখ্যাত মলিন রায় এসেছে হে। দেখ-দেখ!

কথার সুর ভাল লাগল না মলিনের। গ্রাহ্যও করলে না সে। একটা সিগারেট ধরালে। ঠিক এই সময়েই হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরল ফড়িং। তার পিছনে ও কে। মায়া? সেই রুগ্ন, দেহে রূপে দেউলিয়া মায়া? এ যে মায়ার নতুন রূপ। এ কি রূপ! অপরূপ! কোলে তার শিশু!

মায়া থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখে তার জল, মুখে হাসি। ঠোঁট কাঁপছে। কথা বলতে চাইছে সে, কিন্তু পারছে না।

—মায়া! সে এগিয়ে গেল। কিন্তু পিছনের দিকে কিছু যেন

পড়ল, মায়ার চোখে আতঙ্ক ফুটল, দেখেই সে মুখ ফেরালে, ঘুরে দাঁড়াল। পাশের বস্তী থেকে নৃপেন, শ্যাম, আরও দুজন লোক বেড়া ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে।

—খবরদার। তোমাকে কেটে তোমার লাস ভাসিয়ে দেব খালের জলে। বেটা বদমাস।

মলিন ভয় করে না। ভয় তার নাই। তার উপর সে অনেক ঘুরে অনেক শিখেছে—ওদের চেয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে—কি চান আপনারা? খুনোখুনি?

ওদিক থেকে বর্বর চীৎকার উঠল; ভাঙা বার্দ্ধক্যশীর্ণ কাঁপা গলায় একটা জান্তব চীৎকার।—তার সঙ্গে মিশে গেল মায়ার কণ্ঠস্বর—বাবা!

বাতগ্রস্ত বঙ্কিম ভটচাজ তার স্থবির দেহ নিয়ে চীৎকার ক'রে মলিনের উপর গা ঢেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।—শয়তান, পাষণ্ড! এত বড় পাপ—এত বড় অন্যায়—! পিশাচ! খামচে ধরলে তার চুলের মুঠো।

মলিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—না কোন পাপ, কোন অন্যায় আমি করিনি।

—করিস নি? আমার বিধবা কন্যাকে—। ওরে—। এত বড় অন্যায়—

—ভাল লেগেছিল, তাকে ভালবেসেছি। বিয়ে করেছি। কোন অন্যায় আমি করিনি।

—তুই জোচ্চোর। তুই জাতিহীন! তুই—তুই—জারজ!

চীৎকার করে উঠল মলিন—না—!

—না ? এই দেখ—যোগেশ পালের চিঠি। কেষ্টনগর তোর বাড়ী নয়। তোর বাড়ী দেবীগ্রাম। তোর, তোর—।

আবার চীৎকার করে উঠল মলিন—না। এবং ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। সে ঝটকা বৃদ্ধ বঙ্কিম ভটচাজ সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল। মুহূর্তে চারটে লোক ক্ষুধার্তের মত লাফ দিয়ে পড়ল মলিনের উপর। মায়া চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

বঙ্কিম ভটচাজ ফেটে পড়ল—কুলটা, কলঙ্কিণী—। চুপ কর।

মায়া চীৎকার করে বললে—না।

লোক জমছিল! একটি দুটি ক'রে নয়, অনেক। তখন রটে গিয়েছে—মলিন ফিরেছে। লোকে জানে—বঙ্কিম ভটচাজ চীৎকার করে জানিয়েছিল, সে সময় ছ'নে বেঁচেছিল—সেও আস্ফালন করে জানিয়েছিল মলিন-মায়ার কাহিনী। যাদের জানতে বাকী ছিল—ছ'নের ফাঁসীর মামলায় তারাও জেনেছে সে ইতিবৃত্ত। জেনেছে মলিন কারিগর বিধবা মায়াকে নিয়ে পালিয়েছে। জেনেছে, মলিন ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ দূরের কথা—মলিনের জাতি নাই—মলিন জারজ! গোটা কলকাতা জেনেছে। আক্রোশে তারা ফেটে পড়ছে। ছ'নে ফাঁসী গিয়েছে।

মলিন শয়তান—মহা পাষণ্ড মলিন!

মায়া কুলটা—মায়ার লজ্জাহীনতার তুলনা নাই।

মলিনকে তারা বিপর্যস্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হল না। বাঁধলে।

—বাঁধ ওকে।

মায়াকে ক'জনে টেনে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে বন্ধ করে দিলে।

মায়া চীৎকার করছিল—না—না—না। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। আমার স্বামী। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাব।

বস্তির মুখ থেকে প্রতিধ্বনি তুলে মায়ার আর্তনাদ সেই গলিটার ভিতরে—জীর্ণ ঘরখানার অন্ধকূপের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

মলিন বন্ধনের মধ্যে ভয় পায় নি। সে কাঁদে নি। দাঁতে দাঁত টিপে পড়েছিল। তারা তাকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে। করুক। খুন করে করুক। খুন যদি করে তবে মায়াকেও যেন করে। দুজনে একসঙ্গে যাবে। খুন হতে একমাত্র তার আপত্তি—মায়া। মায়া অপরূপ হয়ে উঠেছে। এ এক নূতন রূপ! অপরূপ। কি শ্রী! কি শান্তি! সে আবার নূতন করে পাগল হয়ে গেছে! এই নির্যাতনের মধ্যেও সে মায়ার দিক থেকে সাধ্যসত্ত্বে চোখ ফেরায় নি। মায়া চীৎকার করেছিল, না—না। আমার স্বামী, আমার স্বামীর সঙ্গে যাব। তারা ধরে নিয়ে গেল তাকে। তখন তার মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়েছিল। রাশিকৃত কোঁকড়া চুল ফুলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার পিঠের উপর।

অপরাহ্নের দিকে ঘর খুলে এসে ঢুকল অমল, তার সঙ্গে বাড়ীওয়ালা। অমল ভটচাজ মায়ার বড় ভাই। যে থিয়েটার করে। অমল ঘরে ঢুকে নীরবে মলিনের পাশে বসে বাঁধনটা তার খুলে দিলে। বললে—তুমি চলে যাও। পালাও। মায়া বড় কাঁদছে। আর তুমি তার ওপর অন্যায় খুব করনি। আমি দেখে এসেছি, পাটনায় তুমি তাকে সুখেই রেখেছিলে। কিন্তু তাকে ফেলে এমন ক'রে চলে গেলে কেন? কি বলব? রোজগার করিনে। তার ওপর বিয়ে করেছি। দুজনকে খাওয়াচ্ছে বাবা পুরুতগিরি ক'রে।

বউটা রান্না করে জোর এইটুকু। মা বেঁচে থাকলে হয়তো তাকেও ভাত দিত না। মা মরাতেই তার ঠাঁই হয়েছে। আমার রোজগার থাকলে, বাসা থাকলে, মায়াকে এনে ওখানে তুলে দিতাম না! তোমাকেও এ লাঞ্ছনা সইতে হত না! কি করব? এখন তুমি চলে যাও। পাড়ায় খুব জটলা চলছে।

মলিন অবাক হয়ে গেল প্রথমটা। এ লোকটাকে এমন ভাবে বুঝতে পারেনি আগে। আগে দেখেছে। খেত আর চুল আঁচড়াতো, পকেটে চিরুনী রাখত, পথ চলতে চলতেও চুলে হাত দিয়ে ঢেউ তুলত। হা-হা করে উচ্চ কণ্ঠে হাসত। বক্তৃতার ঢঙে কথা কইত। মলিন ভাবত এও ছ'নের মত। কিন্তু এ লোকটি তো তা নয়।

বাড়ীওলা বললে—কাজটা তুমি অন্যায় করেছ। জাতটা ভাঁড়ানো তোমার অন্যায় হয়েছিল। ছ'নেটার ফাঁসী হয়ে গেল।

অমল বললে—ছ'নের ও পরিণাম ওর কুষ্টির ফল ভাই। ওর স্বভাবের ফল। আর জাত নিয়ে হৈ চৈ-টা তোমরা বেশী করছ, বাজে করছ। মায়া বলছে, সে তার শ্বশুরের নাম জানে—বলছে ওরা সত্যিই বামুন।

মলিন বাধা দিয়ে বললে—জাত আমার থাক না থাক, মায়া আমাকে নইলে বাঁচবে না, আমি মায়াকে ছাড়ব না। মায়াকে এনে দিন। আমি তাকে নিয়ে চলে যাব। তার গহনাগাঁটি সব আপনারা নিন। তাকে ছেড়ে দিন।

হেসে অমল বললে—আমি চাই না। ও লোভ আমার নাই। বাবার আছে। কিন্তু সে বলাও মিছে কথা। মায়া যখন বাড়ীতে এসে ঢুকেছে তখন সে সব তো পাওয়া হয়েইগেছে। ও আশা

তুমি করো না। তবে তুমি আর এখানে থেকো না। আমাদের ওদিকেও যেয়ো না। পাড়ার ছেলেদের তো জান। তারা আগলে আছে, বাড়ীর উপর কড়া নজর রেখেছে। পাড়ার সাধারণে তোমাকে ছেড়েই দিতে বলছে। মানুষকে খুন করা তো যায় না। কিন্তু ওই দলটা এখনও রাজী হয় নি। তারা তোমার আরও লাঞ্ছনা করতে চায়। কেউ বলে, নাক কান কেটে ছেড়ে দাও। কেউ বলে, মাথা কামিয়ে গুড় তুলো মাখিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে তবে ছেড়ে দাও। কেন সে সব পোয়াতে যাবে? চলে যাও তুমি। একটা মেয়ের জন্যে—কাজ কি? বরং চলে যাও। কোথায় থাকবে, ঠিকানা জানিয়ো আমাকে, পরে সুযোগ বুঝে দেব মায়াকে পাঠিয়ে। এখানে আর থেকো না।

মলিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালে, স্যুটকেস নেই। স্যাণ্ডেল? একপাটি পড়ে আছে। আর একপাটি? পেলে না খুঁজে। কোথায় ছটকে পড়েছে। একটা পাটিই হাতে করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল। গলি পথে গালিফ স্ট্রীটে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। হাতে একপাটি স্যাণ্ডেল।

অমল হাসলে। মাথার ঠিক নেই বেচারার!

গঙ্গার জল তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। ওপারে সূর্য নেমে গেছে বালি-বেলুড়ের বাড়ীঘরগুলির আড়ালে। আকাশে ছিল মেঘের ছিলকে, তার গা বেয়ে সূর্যের ছটা কয়েকটি সুদীর্ঘ সরল রেখার মত উপরের দিকে ছুটে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। রাঙা হয়ে উঠেছে মেঘের ছিলকে; তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে গঙ্গার জলে। ওই দিক দিয়েই চলল সে। গায়ের কাপড় জামা ধুলোয় একেবারে ধূসর হয়ে গেছে, ভারী

লাগছে, ঝাড়লে ধুলো উড়ছে, ছিঁড়ে গেছে। মুখে কপালে কালসিটে পড়েছে। মাথার চুল ছিঁড়ে গেছে, তাতেও ধুলো লেগেছে। সেদিকে তার খেয়ালই নেই। লজ্জা তার নেই। যা ছিল তা আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে বস্তির উঠোনের ধুলোর মধ্যে। দুর্জয় ক্রোধ,দুরন্ত সংকল্প তার মনের মধ্যে। তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে সে। এ ক্রোধ তার মেটাবার উপায় নাই। কতজনের উপর প্রতিশোধ নেবে? পারে এক বঙ্কিম ভটচাজকে খুন করতে। তা পারে। লুকিয়ে থেকে কোনদিন নির্জন অবসরে ঘরে ঢুকে ছুরি মারতে পারে। আর কি পারে? আর কিছু পারে না। আর পারে—নাম যশ অর্থ অর্জন করে এই পাড়াতে সকলের চোখের সামনে মায়াকে নিয়ে বাস করতে। মায়াকে তার চাই। মায়াকে পেতেই হবে। বুকের মধ্যে এমন উত্তাল আবেগ কারও জন্য সে কখনও অনুভব করে নি। মায়াকে তার চাই। কি ক'রে? কোন উপায়ে? ভাবতে হবে! সেই ভাবতেই সে চলল গঙ্গার দিকে। লাল ছটা মাখা গঙ্গার দিকে চেয়ে সে ভাববে। তারপর—।

মরতে তার ভয় নেই। শেষ পর্যন্ত গভীর রাত্রে ঘরে ঢুকে মায়াকে বঙ্কিমকে ছুরি মেরে সেও মরবে।

—কাঃরিগঃর! কাঃরিগঃর! কাঃরিগঃর!

পিছন থেকে শেষে গায়ে হাত দিয়ে ফড়িং ডাকলে—কাঃরিগঃর!

ফিরে তাকালে মলিন।—ফড়িং।

—কোথায় ছিলি? পালিয়েছিলি? প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠলো মলিনের বুকে। একটা লাথি মারবার দুর্নিবার ইচ্ছে জেগে উঠল।

তার চোখ দেখে ফড়িং পিছিয়ে গেল খানিকটা। সে মলিনের ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চোখের প্রতিটি শিরার রক্তাভ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বোঝে।

পিছিয়ে যেতে যেতেই বললে—পাঃলাবঃ কেন ? বউদিঃদির কোঃল থেঃকেঃ মেয়েটা যেঃ পড়েঃ যাঃচ্ছিল। আমিঃ কোলেঃ করেঃ নিঃয়ে সরেঃ গেঃলাম। নঃইলেঃ যেঃ মঃরে যেঃত।

—কই ? কই মেয়ে ?

—দিয়েঃ এসেছিঃ।

—কাকে ? ওদের বাড়ীতে ?

—হ্যাঃ। বউদিদিঃকে দিঃয়েছিঃ। আঃর কারুঃর হাঃতে দিঃইনি। বঃললামঃ তাঃ দোবঃ নাঃ আমি। মেরেঃ ফেঃললেঃও দোব নাঃ। তঃখন নিঃয়ে গেল ঘরেঃ। তাঃর হাতেঃ দিঃলাম। সেঃ তোঃমাকেঃ থাকতেঃ বঃলেছে। ফাঁক পেঃলেই বউদিদিঃকে বার করেঃ দেবেঃ।

—আয়।

—কিঃছু খাঃও। পঃয়সা আছেঃ আমাঃর কাছেঃ। মুড়ি তেঃলে ভাঃজা আনিঃ।

মুড়ি তেলে ভাজা সে আজ বোধ হয় চার পাঁচ বছর খায় নি। আজ গঙ্গার ধারে বসে গোগ্রাসে গিললে। গঙ্গার জল আঁজলা পূরে খেলে। ঝোলানো উনোনের উপর পিতলের কেতলী বসিয়ে যারা পথে পথে চা বিক্রী করে—তাদেরই একজন যাচ্ছিল, তাকে ডেকে একভাঁড় চা খেলে। সে পয়সাও দিলে ফড়িং। টাকা পয়সা তার আছে। গোপন সঞ্চয় সে রাখে। মোটা সোল্ বোম্বাইয়ের স্যাণ্ডেল পরে সে। নতুন স্যাণ্ডেল। কিনেই অত্যন্ত গোপনে সোলের পাশের সেলাই কেটে তার মধ্যে রাখে এক একখানা দশ টাকার নোট। একপাটি স্যাণ্ডেল আছে। আরও আছে। হাতে সে একটা মোটা তামার তারের তাগা পরে—তার সঙ্গে আছে একটা চৌকো তাবিজ।

বেশ বড়। তার মধ্যে দেবতার নির্মাল্য কি মন্ত্রলেখা ভূর্জপত্র নেই, আছে একশো টাকার একখানা নোট! সেটা হাতেই আছে। তামার তাবিজ তামার তারের ওপর নজর কারুর পড়ে নি। একশো দশ টাকা তার আছে। কিন্তু সে এখন থাক। দশ টাকার নোটটা সে বের ক'রে নেবে একটু অন্ধকার হলেই।

ফড়িংকে মলিন আবার পাঠালে, তুই যা! কোন রকমে বলে আয়, আমি এখানে বসে আছি। সারা রাত থাকব। লোকজন কমে গেলেই, গিয়ে দাঁড়াব,—অন্নপূর্ণা ঘাটে। ঠিক দাঁড়িয়ে থাকব। সে যেন আসে। যে কোন রকমে পারে চলে আসে যেন। পাহারা থাকলে—ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বলবি। মেয়েটা পড়ে থাকে থাক। পরে দেখব। পুলিশ নিয়ে মেয়ে নিয়ে যাব।

সে যেন আসে। মায়া। মায়া যেন আসে। মেয়ে না-পায় না-পাবে। কত মরছে; আবার হবে। মায়াকে না-নিয়ে সে যাবে না।

গঙ্গার কল্লোল বাড়ছে; জোয়ার আসছে।

বসে আছে সে গালিফ স্ট্রীটের পাশের মারহাটা-ডিচ খালটার সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম-মুখটার কাছে, লক-গেটটার পাশে, একটা গাছের তলায় গুঁড়ির আড়ালে। উপরের রাস্তাটা সরু; সামনে লক-গেটের সঙ্কীর্ণ ব্রিজ। এ দিকে লোক হাঁটে কম। রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ, তার উপর দুর্গম। নিতান্ত দায় না হলে কেউ হাঁটে না। কদাচিৎ দু চারটি দুঃসাহসী ছেলে শখ ক'রে অথবা গোপন পরামর্শের জন্য এসে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় ধ্বজার মত। ধ্বজা দেখে দ্বিতীয় জন এলেই তারা নেমে গিয়ে বসে গাছতলায়। কখনও কখনও দুঃসাহসীরা দাঁড়িয়ে বান দেখে।

গঙ্গার জলে লাল রঙের সঙ্গে কালো রঙ মেশাচ্ছে। ঢালছে, ঢালছে, ঢালছে! মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ পালটে পালটে গাঢ় বেগুনী থেকে সীসের মত হচ্ছে। আরও গাঢ় হয়ে কালো হতে হতে মিলিয়ে গেল সারা গঙ্গাটাই। শুধু এখানে ওখানে জ্বলে উঠল আলো। নৌকার আলো। ওপারে ওদিকে হাওড়া-স্টেশন-ব্রিজ-থেকে দূর ওয়েলিংডন ব্রিজ পর্যন্ত আলোর সারি জ্বলছে। মাঝে মাঝে খুব উঁচুতে এক একটা আলো। হাওড়া স্টেশনের মাথার বড় বড় জুটমিলের মাথার আলোগুলি। অন্ধকার গঙ্গায় তার প্রতিবিম্বগুলি কাঁপছে।

মলিন স্থির দৃষ্টিতে ওই দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। গঙ্গার কল্লোল শোনা যাচ্ছে আর শুনতে পাচ্ছে—তার নিজের বুকের ধ্বক ধ্বক শব্দ। ভাবছে মায়ার কথা।

মায়া আসবে। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ তাকে দেখা যাবে গলিপথের মুখে। চিৎপুর রোড পার হয়ে এসে পোর্ট কমিশনারের লাইনের মাল গাড়ীগুলোর ছায়াতে এসে দাঁড়াবে। মুহূর্তে সে ইসারা দিয়ে চলতে আরম্ভ করবে। কোন দিকে? বাগবাজার ধ'রে নয়, চিৎপুর ধরেও নয়। কলকাতা দিন রাত্রির মধ্যে ঘুমোয় না। তার চোখ লক্ষ লক্ষ। যত লক্ষ লোক কলকাতায় তার দ্বিগুণ চোখ কলকাতার। কয়েক শো চোখ জেগে থাকেই। পুলিশ আছে, গুণ্ডা আছে, হাজার হাজার আলো আছে; ওসব পথে হাঁটবে না। উত্তরের পথে। এই দিকে।

কাঃরিগঃর! ফড়িং এসে উপরে দাঁড়িয়ে ডাকছে।

—ফড়িং! এখানে! গাছতলায়!

ফড়িং বললে—বঃড্ডঃ ভিঃড়ঃ। লোঃকেঃ খুঃবঃ বঃকঃছে। তোঃমাঃকেঃ গাঃলঃ দিঃচ্ছে।

—দেখা করতে পেরেছিস কি না বল !

গাল দিচ্ছে ! দিক। কি গাল দেবে ? গালিগালাজ নির্যাতন সে গ্রাহ্য করে না।

—তাঃর দেঃখা পাঃই নাঃই। তঃবে ওঃদেঃর বাঃড়ীঃর বঃউয়ের দেঃখা পেঃয়েছি। ভাঃরী ভাঃল লোকঃ। খুঃব চাঃলাকঃ।

ফড়িং তার জড় জিহ্বায় যা বললে মলিন তা বুঝলে।

ওদের দরজায় পাড়ার লোকের একটি দল জুটেছে। গাল দিচ্ছে তাকে, গাল দিচ্ছে মায়াকে। মায়া জলস্পর্শ করে নি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দরজায় বসে আছে বঙ্কিম ভটচাজ নিজে। সেই গাল দিচ্ছে মায়াকে। আর গাল দিচ্ছে অমলকে। কেন ছেড়ে দিলে তাকে। কেউ কেউ বলছে ধরে আনা হোক তাকে। কোথায় যাবে ? দু চার জনে খানিকটা খোঁজাখুঁজিও করেছে। অমলের বউ খুব লোক ভাল আর খুব চালাক। মায়ার সঙ্গে ফড়িং ও বাড়ীতে দিন পনের কুড়ি ছিল। মায়ার তখন অসুখ ! সে খুকীকে নিয়ে থাকত আর মায়ার সেবা শুশ্রূষা করত। বিনা পয়সার চাকরে আপত্তি হয় নি ভটচাজের। সে সময় মায়ার বউদি খুব যত্ন করত মায়াকে, ফড়িংকে সে-ই মিষ্টি কথা বলত, খেতে দিত। পনের কুড়ি দিন পর মায়া খানিকটা সুস্থ হতেই ভটচাজ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ফড়িং এই পড়ো বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মোট ঘাট বয়ে পেট চালাত। কিন্তু অবসর পেলেই ওদের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াত। মায়ার কাজ-কর্ম ক'রে দিত। ভটচাজও মধ্যে মধ্যে তাকে দিয়ে তামাক সাজাতো। পা টেপাতো। ওই বউটি ফাঁক পেলে তাকে ডেকে খাবার দিত। বউটি লোক ভাল। আজ সে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকে তাকেও মারতে এসেছিল। কোথায় সে, কোথায় তোর

মনিব বল? সে বলেছিল—আমি জানি না। কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

তবু লোকে তাকে চেপে ধরেছিল।

ফড়িং বললে—তাঃ ওঃই বঃউটিই বঃললেঃ—

বউটিই বলেছিল—ও কি ক'রে জানবে? ও তো মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সকলের আগে ছুটে পালিয়ে এসেছে। সেই তাকে মুক্ত করেছিল। ভটচাজও বলেছিল--না-না, ওটা জানে না। ছেড়ে দাও ওকে। সাজ রে হাবা, একবার তামাক সাজ।

তামাক সাজবার অবসরে চতুর বউটি এসে জিজ্ঞাসা করেছিল—জানিস সে কোথায়? চুপি চুপি সব কথা ফড়িং বলেছিল তাকে।

সে বলেছিল তাকে—ঠিক আছে। ওখানেই থাকতে বলিস! আমি মায়াকে ঠিক বার ক'রে দোব। এগারটার পর। যখন হোক!

শুনে মলিন আশ্বস্ত হলো—মায়া আসবে। মনে মনে পরিকল্পনা শুরু করে দিলে সে। এইবার সর্বাগ্রে পরিচ্ছন্ন হতে হবে তাকে, নিজের ধুলি ধূসর কাপড় চোপড়ের পানে চেয়ে ফড়িংকে বললে—

—তোর গামছাটা দে।

ফড়িংয়ের গামছাটা নিয়ে সে নামল গঙ্গার জলে। স্নান করলে। কাপড় জামা কাচলে, শুকুতে দিলে। বসে রইল গামছা পরে। এখনও অনেক দেরী। এখন সবে সাড়ে সাতটা আটটা। ঘাটের মুখে কালীতলায়, শনি-সত্যনারায়ণতলায় অন্নপূর্ণাতলায় কাঁসর-ঘণ্টা সবে বাজতে সুরু করেছে। অনেক দেরী এখনও। ফড়িংয়ের কাছে ছুরি নিয়ে স্যাণ্ডেল কেটে নোটখানা বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—ভাঙিয়ে নিয়ে আয়, আর বিড়ি নিয়ে আয়। সিগারেট

নয়। সিগারেট পরে। এই নির্জনে সিগারেটের গন্ধ লোককে কৌতূহলী করে তুলবে। কাপড় জামাটা ময়লা হয়ে ভাল হয়েছে। এখন গামছা প'রে আরও নিরাপদ। মায়ার কাপড়টাও ময়লা হ'লে ভাল হয়।

মায়া আসবে। নিশ্চয় আসবে। মায়ার মন সে জানে। নিজের মন থেকে সে বুঝতে পারছে। যম এসে তার পথ রুখলেও সে যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে হে'রে তবে ক্ষান্ত হবে। ভয়ে থামবে না, পিছিয়ে ঘরের কোণে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদবে না।

ফড়িং ফিরে এল বিড়ি দেশলাই নিয়ে, ভাঙানী নিয়ে।

আর এনেছে ওর নিজের একখানা ধোয়া কাপড় আর হাফ সার্ট একটা।—পঃরঃ।

বাঃ। বাঁচল মলিন।

ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজছে কোথায়। পেটা ঘড়ি। চঞ্চল হয়ে উঠল মলিন। ক-টা? মায়ার আসবার সময় হয়নি? না। ন'টা। সবে এখন ন'টা। ঘাট এখান থেকে দূর হলেও দেখা যাচ্ছে। এখনও ওখানে অনেক লোক। ফড়িংকে বললে—তুই যা। তুই এখন থেকেই ওখানে যা। একবারে বাড়ীর কাছেই কোথাও থাকবি। বের হলেই চলে আসবি। যা।

ফড়িং চলে গেলে মলিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর অস্থিরের মত ব্রিজের উপর উঠে দাঁড়াল। কি নিষ্ঠুর উদ্বেগ! ওঃ, এত তুরন্ত উদ্বেগময় প্রতীক্ষা মলিনকে কখনও করতে হয় নি। কাঁধের নিচে তু পাশে কণ্ঠার কাছটা যেন কন্ কন্ করছে। বুকের মধ্যে কি হচ্ছে! উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। আর সে পারছে না। আসবার সময়ের অনেক দেরী, তবু

বিস্ফারিত পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। চোখ জ্বলছে। কখন বাজবে এগারটা ?

*   *   *

বাজল এগারটা। একটা বিড়ি মুখে পুরেছিল মলিন, হাতে দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স ; ধরাবার অবসর হয় নি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুণে যাচ্ছিল, এক—দুই—তিন। এগারটার শেষ ঘণ্টা বাজতেই ফস করে কাঠিটা জ্বেলে বিড়িটা ধরালে। তারপর অগ্রসর হল। এসে দাঁড়াল পোস্তা-বাঁধানো সুদীর্ঘ ঘাটটার মুখে। প্রায় জনহীন হয়ে গেছে ঘাট। উঁচু লাইট-পোস্টের মাথার আলোটা পর্যন্ত যেন স্তব্ধ স্পন্দনহীন ; মানুষের ছায়ার চঞ্চলতায় চঞ্চল নয়, প্রতিবিম্ব নিথর হয়ে পড়ে আছে। দু চারটে পোকা উড়ছে শুধু। হন হন ক'রে এগিয়ে এল সে। ওয়াচ ম্যান্ আছে, কনস্টেবলও একটা দুটো কোথাও আছে। থাক। ওরা একটু পরেই ঢুলবে। সে এসে ঘাটের উপর পথের দিকে মুখ করে বসল।

না। সদর রাস্তায় না এসে যদি দক্ষিণের গলি পথে আসে ? হ্যাঁ, তাই আসবে। অন্ধকারে অন্ধকারে এসে শুধু চিৎপুর রোড পার হয়েই আবার গলি পথ, পথটা ধরে একেবার গঙ্গার ধার। পোর্ট কমিশনারের তারের বেড়া। ওই পথ! বুকটায় আঘাতের পর আঘাত পড়ছে, থেঁতলাচ্ছে যেন। সমস্ত বুকটা জুড়ে উদ্বেগের যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। মায়া কখন আসবে ? মায়া শ্বেত বস্ত্রাবৃতা দ্রুতচারিণী রহস্যের মত কখন অকস্মাৎ এসে পড়বে ; যে কোন মুহূর্তে। ঘাট থেকে সে উঠল, এসে দাঁড়াল গলিপথটার মুখটায়। অন্ধকার গলির মুখে একাগ্র নিস্পলক দৃষ্টিতে ওপারের গলির মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজে সে স্থির নিস্পন্দ ;

নিস্পলক তার দৃষ্টি; নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তাও যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। কই? কই? দৃষ্টির সামনেও সব মধ্যে মধ্যে ঝাপসা বা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মায়া! মায়া! মায়া আসছে। কই? একেবারে বোধ করি বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার অথবা হয়তো ঢুল এসেছিল, শুধু মায়া আসছে কথাটি জেগেছিল, সে চমকে উঠল!

মায়া!

তার পাশ দিয়ে লঘু দ্রুত পদক্ষেপে সে গলির মধ্যে এগিয়ে চলে গেল। কখন এল? কিন্তু সে ভাববার অবসর নেই। সেও পশ্চিম মুখে ফিরে অগ্রসর হল। ওই মায়া চলছে। শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা রহস্যের মত লঘু দ্রুতপদে চলেছে, যেন উড়ে চলেছে। ডাকতে সাহস নাই নয়, ইচ্ছে করেই সে ডাকলে না। চলুক। চলুক, চলেছে। ডানদিকে উত্তর মুখে দু'সারি মালগাড়ীর মাঝখানের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সাদা-কাপড়-পরা মায়া ঠিক চলেছে। উত্তর মুখে। চলেছে। মলিনও চলল! চলল! চলল! নিশীথ রাত্রির নিথরতার মধ্যে মায়াকে অনুসরণ করে উদ্‌ভ্রান্তের মত চলল মলিন।

একটা একটা ক'রে লেবেল ক্রসিং পার হয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রেল লাইন, স্লিপার, ডগনেল, সিগন্যালের তার, শান্টিং পয়েন্টের বাধা বিঘ্ন ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে পার হয়ে চলল সে তাকে অনুসরণ করে। সামনে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। মায়া সেটা পেরিয়ে কোনদিকে যাবে? ইঞ্জিন পার হয়ে ব্রিজ পার হয়ে বরানগরের দিকে? হ্যাঁ তাই সে ফিরল। পেরিয়ে গেল ইঞ্জিনটা।

মলিনও মুহূর্তে ঘুরল। সে ইঞ্জিনটার পিছনের ওয়াগনটার পিছন দিয়ে লাইনটা পার হবে।

সেই মুহূর্তেই ইঞ্জিনটা সিটি দিয়ে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল সামনের সার্চ লাইট। একজন লোকও চীৎকার ক'রে উঠল—কোন হ্যায় ?

ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলে মলিনকে।—কাঁহা যায়েগা ?

—মায়া ! উচ্চ চাপা গলায় মলিন বললে—মায়া !

—কেয়া ?

—মায়া যাচ্ছে—আমি যাব।

কোথায় ? কে ? কই ? কেউ নেই কোথাও। সার্চ লাইটের তীব্র আলোতে সমস্ত সামনেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে কোথায় ? কেউ কোথাও নেই! জনহীন গঙ্গার তটভূমি—বড় বড় গাছগুলোর ছায়ায় যেন ভয়াল হয়ে উঠেছে, স্তব্ধতা থমথম করছে—কেউ কোথাও নেই—খাঁ-খাঁ করছে; শুধু চলছে গঙ্গার জল—কলকল খলখল। নৈশ প্রকৃতির ক্রূর হাসির মত। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মলিন। সশব্দে একরাশি বাষ্প উদ্গীরণ করে নড়ে উঠল ট্রেণটা, চলতে লাগল। দীর্ঘ মাল গাড়ীটা একঘেয়ে উচ্চ যান্ত্রিক শব্দ তুলে তাকে ক্রমাগত অতিক্রম ক'রে শেষ গাড়ীটি যখন লাল আলোর বিপদ সংকেত দেখিয়ে পার হয়ে গেল তখন সে থর থর ক'রে কেঁপে পড়ে গেল সেইখানে। আর সহ্যের শক্তি তার ছিল না।

মায়া নয়। তার মনের ভ্রম। তার বুকের বাসনা তার বুক থেকে বেরিয়ে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। মলিনের বুকের দুর্দান্ত বাসনা।

পঞ্চম পর্ব

॥ এক ॥

দুর্দান্ত বাসনার অনির্বাণ চিতার আঁচে ঝলসে গিয়েও মানুষ মরে না; মরতে পারে না। তার উপর এ মানুষ মলিন দাস, মলিন কারিগর, মলিন রায়। তবে আঁচের ক্রিয়া যাবে কোথায়?

এ ঘটনার দীর্ঘদিন পর এই আঁচে ঝলসে ঝলসে প্রায় প্রেতমূর্তি হয়ে কলকাতায় ফিরল সে।

তার জীবনের ওই চরমতম নির্যাতনের দিনটি—যেদিন ওই গভীর রাত্রে আপনার মনের অত্যুগ্র বাসনার চরমতম তৃষ্ণায় অলীক মায়ার পিছনে পিছনে ছুটে রেল-ইঞ্জিনের চাকা থেকে সামান্যের জন্য বেঁচে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তার দীর্ঘদিন পর।

আজ উনিশশো পঞ্চান্ন সালের অক্টোবরের বারই তারিখ, এর ক'বছর আগে—আটচল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে প্রেতমূর্তির মত আকৃতি নিয়ে ফিরে এল মলিন।

সেদিন সেই রাত্রে ভোরবেলা ফিরে এসেছিল ফড়িং। সে-ই তাকে খুঁজে বের করেছিল। তখন সে নিজেই চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসেছিল; কিন্তু বুঝতে পারছিল না তার কি হয়েছিল, কেন সে সেখানে? সব যেন জড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। শিবের জটায় পথ হারানো গঙ্গার মত তার স্মৃতি ওই জটের পাকের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে গোলক ধাঁধায় ঘুরছিল।

ফড়িং তাকে দেখে তার কাছে এসে কোনো প্রশ্ন করেনি—সে ওই

রেললাইনের উপর কেন ? শিউরে ওঠেনি—যদি ট্রেণ আসত তবে কি হ'ত ভেবে। এমনকি কি হয়েছে তাও জিজ্ঞাসা করেনি। জড়বুদ্ধি ফড়িঙের মাথায় এ সব প্রশ্ন জাগেনি। সে শুধু এসে তার সামনে বসে সকরুণভাবে বলেছিল—আঃসেনি। সাঃরাঃ রাত ঠাঃয় দাঃড়িঃয়ে ছিলাঃম। ভোঃর বেঃলা সেই বঃউটি বললে সেঃ যাঃবে না। আঃমি দুঃবার ডেঃকেছি, দঃরজাঃ খোঃলেনিঃ। ঘঃরেরঃ ভিঃতরঃ থেঃকে একঃ বাঃর বলেঃছে যাঃব না আঃমি। একঃবাঃর সাড়াঃ দেঃয়নি। এঃখনও ঘুঃমুচ্ছে।

—কে ? কে আসেনি ? ও! মায়া!

চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল সব। সব। মায়ার সেই ছায়া-মূর্তি দেখার কথা মনে পড়ে শিউরে উঠেছিল সে। ফড়িংকে বলেছিল—একটা রিক্সা ডাক।

রিক্সায় চড়ে বাগবাজার থেকে এসে উঠেছিল হাওড়ায়। হাওড়ায় স্নান করে সুস্থ হয়ে কাপড়-জামা-জুতো কিনে এসেছিল পাটনা। থাক মায়া। মায়ার মোহ তার কেটে গেছে। কয়েকটা দিন অবশ্য সে মুসড়ে ছিল। লাঞ্ছনা অপমানের স্মৃতি, মায়াকে না পাওয়ার ক্ষোভ, তাকে মুহ্যমান করে রেখেছিল। তারপরই সে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিছু না। ও কিছু নয়। প্রথম প্রথম মনে হ'ত সে হেরে গেছে জীবনে এই প্রথম, তারপর সে মাথা তুলে পরাজয়ের সকল চিহ্ন, সকল গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে বলেছিল—কিসের হার ? লড়াই এখনও শেষই হয়নি তার। হার কিসের ? আবার সে ফিরে যাবে কলকাতা। এখন তার চাই টাকা, প্রথম টাকা চাই।

অর্থ সঞ্চয় করে কলকাতায় ফিরে গিয়ে সে মামলা করবে স্থির

করেছিল। মামলা করবে, মায়াকে এবং তার কন্যাকে ফিরে পাবার জন্য। প্রকাশ্য আদালতে মুক্ত কণ্ঠে বলবে তার পরিচয়। একটু মিথ্যাই বলবে—এ জেনেই মায়া তাকে বিবাহ করেছিল। এবং বলবে, মা তার ব্রাহ্মণ কন্যা ; সে জানে না তার পিতৃ পরিচয়—তবে তার বাপ যে ব্রাহ্মণ ছিল এ কথা সে জানে। সুতরাং সে ব্রাহ্মণ।

মস্তিষ্ক শীতল হ'লে ভাবত, না, অর্থ হোক, তারপর কিনবে সে ওই লোভী ব্রাহ্মণটিকে—ওই বঙ্কিম ভটচাজকে। টাকার বিনিময়ে লুব্ধ ব্রাহ্মণ নিজে কন্যার হাত ধ'রে এনে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

প্রচুর অর্থ চাই তার। নতুন করে সে কাজে লাগল।

মধ্যে মধ্যে নির্জন অবসরে শিউরে উঠত। মনে পড়ত তার সে রাত্রির সেই ছায়া-মায়ার কথা। কি? কি দেখেছিল সে? কি? অবিকল মায়া। ভ্রান্তি? ভ্রান্তির পিছনে পিছনে সে এতখানি বন্ধুর পথ, দুদিকের মালগাড়ীর মধ্যে অন্ধকার, কঠিন লোহার সারি সারি লাইন, কাঠের স্লিপার, লোহার নেল, তারই মধ্যে দিয়ে এক মাইল পথ চলে গেল! চোখের সামনে থেকে একবার হারায় নি, একবারও না, তার চোখের উপর এখনও ভাসছে। চোখ বুজলে এখনও সে দেখতে পায়—সেই ছায়া-মায়াকে ;—চলছে—চলছে, অবলীলাক্রমে চলছে।

সে কি? ভুল, তার মনের ভুল? ভুল নয়, ভুল সে বলবে না।

সে মায়া তার মনের মায়া ; মন থেকে বেরিয়ে গঙ্গার জলে—না গঙ্গার জলে নয়—খালের জলে ডুবে গিয়েছে। যাক্।

তার মনের বাসনার খেলা বলেও মাঝে মাঝে মনে হত এবং

শিউড়ে উঠত সে। ভাবত—না, ওর চেয়ে রূপের হাট ভাল। মুছে দেবে, দিদির মুখের-ছাপটা সে মুছে ফেলে দেবে; দিদির মুখের ছাপ ওদের মুখে নেই, আছে তার মনে, চোখের আয়নায় ছটা বাজিয়ে সেই ফেলে তাদের মুখে সে আদল। মন থেকে মুছে ফেলে দেবে।

পাটনায় আবার জেঁকে বসতে খুব দেরী হয়নি তার। প্রতিষ্ঠা তার ছিলই, সে ফিরে পেতে ক'দিন লাগে? এবার সে পুতুলে মন দিয়েছিল প্রথম। সস্তা জিনিষ চলতে দেরী লাগে না। ফড়িং তার সঙ্গে ছিল—সুতরাং বেগ তাকে পেতে হয় নি। সে বসে ছাঁচ তৈরি করে খালাস, বাকী যা করবার সে সব করত ফড়িং। দেখতে দেখতে দু তিন মাসের মধ্যে আবার সে যে-মলিন রায় সেই মলিন রায় হয়ে উঠেছিল। এবার সে এক নতুন ছক পাতলে, বুদ্ধি খাটিয়ে। মোগলসরাইয়ে স্টেশন স্টলে সে দেখে এসেছিল ছোট সাজির মধ্যে মেয়েদের খেলাঘরের গৃহস্থালীর সেট—উনোন, কড়াই, হাঁড়ী বালতী, খন্তা; জন্তু জানোয়ারের সেট; পিতলের, কাঠের। চুনারের-তৈরী পাইপ্-ক্লের সেট। কল্পনাটা তার ভাল লেগেছিল। এবার সে সেটা কাজে লাগালে। ঘরে, বিশেষ ক'রে ড্রয়িংরুম সাজাবার নানান সেট সে তৈরী করলে। চার চারটির সেট। চারটি রঙ করা ছোট কলসী, তার উপর চারটি কাঁচা ডাব; চারটি রঙ করা পিলসুজ। চারটি জানোয়ার—বাঘ, সিংহ, ভালুক, মহিষ। চারটি শীকার—হাতীর হাওদায় শীকারী ও হাতীর মাথায় বাঘ; বাঘ লাফ দিয়ে ধরেছে মহিষ, অজগর সাপ পাক দিয়ে ধরেছে হরিণ, কুমীর ধরেছে মাছ। চারটি পদ্ম—পদ্মের কুঁড়ি এবং পাতা, আধ ফোটা পদ্ম, সম্পূর্ণ ফোটা

পদ্ম তার উপর ভ্রমর, আর ঝরে পড়া পদ্ম ; চারটি পুতুলী—বৈষ্ণবী, কনেপুতুল, মোহন চুড়িওয়ালী, মোহিনী মায়া। এবার সে মায়ার পুতুল তৈরী করলে। ওই সেই রাত্রের দেখা রূপ। সেই ছায়ার মায়া। সে যেন শূন্যে ভেসে চলেছে—একটি পা মাটিতে মাত্র ঠেকে আছে, ঈষৎ কাৎ হয়ে মুখ ফিরিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। ড্রয়িংরুমে চার কোণে ব্রাকেটের উপর যার যেমন পছন্দ চারটি পুতুল সাজিয়ে দেবে। দাম চার টাকা, আট টাকা, ছ টাকা, দশ টাকা। মেয়েদের পুতুলগুলি আকারে করেছিল বড় এবং পুতুলগুলি রং করতে তার বেশী সময় লাগত, এগুলিতে ফড়িংকে তুলি চালাতে সে দিত না।

রং যখন রূপ হয়ে ফোটে তখন সে মোহ বিস্তার করে, চোখই তখন ভোলে না মনও তখন মুগ্ধ হয়। মন মুগ্ধ হলে তখন আর রক্ষা থাকে না, সে তাকে পাবার জন্য পণ করে বসে। সে বস্তু পণ্য হলে তার বিক্রী হতে কতক্ষণ ?

কয়েক মাসের মধ্যেই মলিন নতুন মলিন হয়ে উঠল। সে হল এম. রায়। পোষাক-পরিচ্ছদে, ভাবভঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় নতুন, এতকালের মলিনের সঙ্গে অমিল না-থাকলেও তফাৎ অনেকখানি। একটা বিচিত্র বাঁকা হাসি ফুটল তার মুখে। ব্যঙ্গ বক্র ধারালো হাসি। কথাবার্তাগুলিও বাঁকা চেহারা নিলে ; সাজ-সজ্জায় সে ধরলে পশ্চিমী ধরণ, ঢিলে পা-জামা, ঝলমলে পাঞ্জাবী, দাড়ী গোঁফ রাখলে, চুল রাখলে।

একজন একদিন ড্রয়িংরুম সেট কিনতে এসে মেয়েদের ওই পুতুলগুলি দেখে বলেছিল—পুতুলগুলি—

—কি ?

—কি বলব ? একটু—রঙ্গিনী !

—কি—রূপের চেয়ে রস বেশী ? রঙের চেয়ে ঢং চড়া ? একটু বাঁকা হাসি হেসেছিল সে।

—হ্যাঁ কতকটা তাই।

—রস আর ঢংয়েই তো মানুষ স্যার ; নইলে ফুলের রূপ আর রংয়ের কাছে মানুষ কি লাগে ? শুনেছি—রাধা নাকি জন্মেছিলেন পদ্মের মধ্যে। রাধা যতই সুন্দরী মোহিনী ছিলেন না কেন—পদ্মটির রূপ রঙের সঙ্গে কসট করলে নিশ্চয়ই পদ্মের জিত হবে। কিন্তু রস আর ঢং এতেই তো রাধা—রাধা। কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি পুতুল গড়িয়ে কারিগর, আর সত্যিই বলছি মুখ্য মানুষ। ওই দুটো বাদ দিয়ে কি ও রূপ ফোটে ?

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি ও-সেট কেনেন নি।—নাঃ, ও থাক।

—থাক।

—আপনার দেবমূর্তি নেই ?

—নাঃ।

—কেন ?

—জানিনে কেন। তবে গড়িনে।

—কেন তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

—একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না স্যার !

—আচ্ছা, তা হলে চলি। বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মলিন বলেছিল—কিছুই নিলেন না স্যার ?

—নাঃ, এ সব আমার পছন্দ হল না। গড়ে দিতে পারেন তো নিই।

—কোন দেবতা গড়তে হবে, তাকে আমাকে একবার দেখাবেন? তা হ'লে গড়ে দেব।

—আচ্ছা, আমার কাছে ছবি আছে, দেখাব।

—ছবি? ছবি না, ছবিতে হবে না। আসলটিকে দেখাতে পারেন? গম্ভীরভাবে কথাটা আরম্ভ করেছিল—শেষ ক'রেছিল বাঁকা হাসিতে।

ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। পাটনার বাঙালীরা পুজোর সময় প্রতিমা গড়ে দিতেও তাকে অনুরোধ করেছিল। সে জোড় হাত ক'রে বলেছিল, আমি স্যার নিতান্তই ছাগল ভেড়া যা বলেন তাই, আমার দ্বারা কৃষিকর্ম হবে না। ধোবার গাধা বললেও রাগব না, কিন্তু বলদের কাজ আমার অসাধ্য। ও আমার আসে না।

এর পরই সে পাটনা থেকে চলে গিয়েছিল। শুনেছিল— নবদ্বীপ বা কেষ্টনগর থেকে কারিগর আনার কথা হচ্ছে। পরিচয় প্রকাশ হবার ভয়ে ঠিক নয়; সে ইদানীং বলত, কোন প্রসঙ্গে জাতের কথা উঠলেই বলত, জাত আমার কাছে দুটি, সদ্‌জাত আর বদ্‌জাত। অন্য জাত আমি মানিনে, পৈতে ছিল, ফেলে দিয়েছি। এখন আমার একটি জাত—বদ্‌জাত।

মায়ার কথা উঠলে সোজা বলত—বনল না তার সঙ্গে। ওই, ওই জাত নিয়ে। সে সদ্‌জাত, আমি বদ্‌জাত—বনল না; আলাদা হয়ে গেল। ছেলেবেলা যাত্রার দলে গান শুনেছিলাম—

সুজনে কু-জনে প্রেম পদ্মপত্রে জলের ফোঁটা।

(তবু) জলেই ভাসে পদ্মপত্র পুষ্প বৃন্তে তীক্ষ্ণ কাঁটা।

বলে তীক্ষ্ণ হাসি হেসেছিল। একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এসে

তাকে দায় উদ্ধারের জন্য ধরেছিল। সে বলেছিল—আমার এক বিবাহ আছে আপনি জানেন না ?

—জানি। কিন্তু সে তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে শুনেছি আপনাদের।

—তাও শুনেছেন ?

—সেই শুনেই এসেছি।

—আমি জাতি মানিনে এটা শুনেছেন ?

—কিন্তু জন্ম তো আপনার ব্রাহ্মণ কুলে।

—হ্যাঁ তাতে ভুল নেই। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।

—আমার মেয়েটি সুন্দরী।

—ভাল বিয়ে হোক তার। গঙ্গার দুটো ধারা—পদ্মা আর ভাগীরথী, পদ্মা দিয়েই সব জল যায়, নদী হিসেবে সেই বড় কিন্তু তার নাম কীর্তিনাশা ; তার জলে গঙ্গার জলের কোন মাহাত্ম্য মহিমা নেই। ব্রাহ্মণের রক্ত আমার দেহে আছে—কিন্তু তবু আমি পদ্মার মত কুলনাশা। মেয়েকে জলে ফেলতেই হবে—পূজো শেষ হওয়া প্রতিমার মত, ঘরে রাখবার উপায় নেই। ফেলা ভিন্ন যখন পথ নাই তখন কুলনাশার জলে ফেলবেন না। কলকাতার ধারের অনেক পচা নর্দমার জল পড়েও ভাগীরথী ভাগীরথী। ওই, ওই ভাগীরথীর মত একটি নদী দেখে তাতেই ঝুপ করে ফেলে দেবেন।

কথা শুনে ভদ্রলোক দুঃখিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। সে দিন সে সারাটা দিন উন্মনা হয়ে ছিল। বুকের দিগন্তে ঝড় যেন উঁকি মেরেছিল। মনে হয়েছিল—মেয়েটিকে দেখতে দোষ কি ? পছন্দ যদি হয়—। আবার—আবার সে—

না। শুধু একবার বলেই ক্ষান্ত হয় নি। বারবার বলেছিল—

না—না—না—না—না—। কিন্তু ঝড়ের একটা নিজের বেগ আছে গতি আছে। বন্যার জলের মত তাকে বাঁধ বেঁধে বাঁধা যায় না। ক্ষুধার পীড়নকে রুদ্ধ করা যায়, নির্জীব হয়ে এলিয়ে পড়েও মরে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু রক্তমাংসের ক্ষুধা যার বুকে ঝড় হয়ে ওঠে,—যার জীবনে রুদ্রের তপস্যা নাই, সেই তৃতীয় নয়নের বহ্নি-প্রসাদ নাই, তার বুকে ঝড়ের তাণ্ডব তুলবেই। কিন্তু না। আর না। জীবনে পুতুল আর সে বাড়াবে না। তার চেয়ে সে মনের ভেতর থেকে দিদি মনোর সকল রঙ ধুয়ে মুছে ফেলে দেবে। দিদিকে এতদিন বলেছে—মর—মর—মর, মনোদিদি তুই মর। এবার সে তাকে মারবে। হত্যা করবে। রূপের হাটে নিজেকে সে বিকিয়ে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা মদ্যপান করে ভাল একখানা এক্কা ভাড়া করে ছুটল সে সিটির দিকে। পাটনা সিটির রূপের হাট। ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে বললে পল্লীটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। এখানে একটা আবিষ্কার সে করলে। বাংলাদেশে মনোদিদির ছাপ যাদের মুখে দেখত তাদের থেকে এরা বেশেভূষায় ভঙ্গিতে আলাদা। মিল নেই। মনোর ছাপ এদের উপর পড়েও যেন মিলছে না। সে আবার মদ্যপান করলে। পকেটেই ছিল তার একটা শিশি। হঠাৎ এক জায়গায় সে বলে উঠল—বাস্ করো, রোখো এক্কা। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি তরুণী। সে উঠল গিয়ে তার ঘরে। মনোদিদি মরেছে। মরে মনোদিদি যে পথটা মুক্ত করে দিলে জীবনের ঝড় তার সেই পথে উড়ে চলল।

॥ দুই ॥

পরদিন ফড়িংকে বললে, বেঁধে ফেল সব। আমি ঘুরে আসি।

ফড়িং সভয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোঃথায় যাবেঃ আবাঃর।

মলিন বললে—ভয় নেই। কদিন পরেই ফিরব। যাচ্ছি লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ—এবার লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ থেকে বাসা ভাড়া করে সে পাটনায় ফিরে এল।—চল্ লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ শহরের পুতুলের বাজার সে জয় করবে। লক্ষ্ণৌ তার ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগেছে লক্ষ্ণৌয়ের সুরতের মহল্লা, রূপের হাট। আর ভালো লেগেছিল লক্ষ্ণৌয়ের কৈসরবাগ, ছত্রমঞ্জিল, গোমতী নদী। আর ভালো লেগেছিল—তামাক ফুরসী। দাড়ী গোঁফ রেখেছিল সে, এবার সে চুলে বাবরী বানালে। মাথায় টুপী চড়ালে। আতর লাগালে। কস্‌মেটিক দিয়ে গোঁফ পাকালে। তার বাঙালী পরিচয়টা পর্যন্ত মুছে দিলে। সারাটাদিন রঙ, তুলি, ছাঁচ, মাটী, পুতুল—রাত্রে রূপের হাট—সুরতের মহল্লায় জীবনের ঝড়ে লুটোপুটি! সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট! মায়া তার সব মিথ্যে ক'রে দিয়ে গিয়েছে।

একাদিক্রমে বারো বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন, বিচিত্র মলিনের ভাগ্যে বিচিত্র ঘটনা ঘটল। বিচিত্র অবশ্য এমন কিছু নয়। এমন অনেক ঘটে। তবে তার পরিণতি মলিনের মত মানুষের জীবনে যে বিচিত্র রূপ নেয় সাধারণ মানুষের তা নেয় না। একদিন চৌকের কোঠা বাড়ীর বারান্দায় একটি সদ্য যুবতী মেয়েকে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঠিক টিয়ার মত! টিয়ার মত নয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, নখ থেকে চুল পর্যন্ত

আশ্চর্য সাদৃশ্য। দিনের বেলা। তবু এতটুকু পার্থক্য দেখতে পেলে না। টিয়া বিনিসূতোর মালা, ওতে বাঁধনের পীড়া নেই, বাঁধবার কোন আগ্রহই নেই বিনিসূতোর মালার, গলায় ঝোলে খসে পড়বার জন্যই। কখন খসে যায়—বুঝতেই পারা যায় না। টিয়া সত্যই টিয়া। যতক্ষণ তার কলকল ভালো লাগে শোন, তারপর ছেড়ে দাও, সে উড়ে যাবে। আপনমনে আকাশে পাখা মেলার আনন্দে উড়ে চলে যাবে। জীবনের ঝড়ে সেদিন নেমে এসেছিল তাণ্ডব। সঙ্গে সঙ্গেই মলিন সেখানে গিয়ে উঠল। বসল, পান খাবার জন্যে পাঁচটা টাকা ফেলে দিলে।—কি নাম বেগমের?

—হামিদন্ নেসা।

—বহুত মিষ্টি আর সুন্দর নাম তো! যেন ঠুমরির আলাপের একটি কলির মত শোনাচ্ছে কানে।

হামিদন্ নেসা সদ্য-যুবতী হলেও সে হল জাত-কসবীর মেয়ে। ওর মা বললে—লক্ষ্ণৌএর শের, হিন্দুস্থানের সেরা সৌখীন আর সায়ের অর্থাৎ কবি আর দরিয়ার মত দরাজ দিল যাঁর সেই নবাব আমীরউল্ মুল্ক্ ওয়াজেদ আলি শার আমলে তার মায়ের মায়ের মা শাহের নজরে পড়েছিল। গাঁয়ের মেয়ে ছিল, ঘাগড়ী পরে গাগ্রী মাথায় গোমতী থেকে জল নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছিল। ওয়াজেদ আলি শা—তাঁর বাজ পাখী ছেড়েছিলেন একটা উড়ন্ত হাঁস দেখে। সেই বাজের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ দেহাতী মেয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর প্রসাদ দিয়েছিলেন। তারা যেমন তেমন ঘর নয়। তরিবৎ, কথাবার্তার কায়দাকানুন এসব আর কোন ঘরে পাবে না। হামিদন্ নেসা সেটা প্রমাণ করেছিল, জবাব দিয়েছিল, জনাবআলির

কথাবার্তা যেন ঠুমরীর গানের সঙ্গে সারেঙ্গীর সঙ্গত। গাইয়ের গলা যতই মিঠে কামদার হোক, তারের সুর আর ছড়ির কায়দায় নিখুঁত পর্দার বাহার অনেক বেশী কদরের।

মলিনের নেশা ধরে গেল। যে বুনো টিয়াকে সে ছেড়ে দিয়েছিল সেই টিয়া যেন বুলি শিখে ফিরে এসেছে। মলিন এরপর আসর পাতলে সেখানে। যেন পাকা আসর। আবার যেন পুতুল গড়তে হবে তাকে। না। নতুন পুতুলের দরকার নেই। এ অবিকল টিয়া। অবিকল। একদিন তার চুড়িওয়ালী পুতুলটা এনে তার হাতে দিয়ে বললে—দেখ তো। ঢংটা তোমার মত কি না।

সে বলেছিল—তাই তো। এ জনাবআলি পেলেন কোথায়।

—আমার গড়া।

—হঁা! আপনার এমন হাত?

—চল। একদিন দেখবে আমার গরীবখানা। কত পুতুল দেখবে। যত চাও আনবে।

—যাব। কবে? আজই? আজই চলুন। দেখে আসব আপনার দৌলতখানা। আর আঁচল ভরে নিয়ে আসব এই পুতুলের দৌলতের ছু এক মুঠো।

—যাবে? আচ্ছা। কিন্তু আমি তোমাকে নতুন সাজে সাজিয়ে নিয়ে যাব।

—নতুন সাজে? কৌতুক উথ্‌লে উঠেছিল হামিদনের—সেই টিয়ার মত ছুটি ছোট চোখে। মলিন তৎক্ষণাৎ বাজার থেকে পছন্দ ক'রে শাড়ী কিনে এনেছিল। টিয়া যেমন শাড়ী পরত, তেমনি শাড়ী—তারপর সাজিয়ে তাকে ক'রে তুলেছিল অবিকল টিয়া। আর বলেছিল—তোমার নাম এখন টিয়া, কেমন?

তারপর এসে উঠেছিল বাসায়।

দরজায় ধাক্কা দিতেই ফড়িং দরজা খুলে দিয়েছিল।

মলিন তাকে সকৌতুকে বলেছিল—চিনতে পারছিস? কে বল তো?

এই কৌতুকটুকু করবার জন্যই সে হামিদন্‌কে টিয়া সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল।

জড়বুদ্ধি ফড়িংয়ের পক্ষে এ রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় নি। এতো মিল! হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিল সে। স্তম্ভিতের মতই দাঁড়িয়েই ছিল। টিয়া? তার দিদি? এখানে?—হ্যাঁ সেই তো! মলিন হামিদনের হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ফড়িং স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হামিদনের খিলখিল হাসি শুনে সে ঘরে ঢুকল এবং ঘরে ঢুকেই বর্বর ক্রোধে চীৎকার করে উঠল। মলিন তখন হামিদন্‌কে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। জড়বুদ্ধি হলেও ফড়িং আর বালক নয়, সে পূর্ণ পরিণত যুবা, যুবা কেন—তারও বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ওই বর্বর চীৎকার করে মূর্তি পালিশের একটা ছুরি তুলে নিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মলিনের উপর ঠিক একটা পশুর মত। মলিন পড়ে গেল।

মুহূর্তে এবং যেন চকিতের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল ঘটনাটা। ফড়িংয়ের বর্বর চীৎকার শুনে মলিন চমকে উঠেছিল কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান ক'রে সতর্ক হ'তে সময় পায় নি সে। যখন ফড়িং ঝাঁপিয়ে পড়ল—তখনও না। ওদিকে তখন ভয় পেয়ে হামিদন্ চীৎকার ক'রে উঠেছে; মলিন ভেবেছিল ফড়িং হামিদন্‌কেই বোধ হয় আক্রমণ করবে। সে হামিদন্‌কে আগলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল। ফড়িং যখন তার উপর পড়ল তখন সে বুঝলে, শুধু বুঝলে নয়, চকিতে

ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়েছিল—মনোর বাড়ীতে যখন 'মনোসুন্দরী' বলে ডেকে আগন্তুক আসত—তখন—। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই একটা তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর আঘাত অনুভব করেছিল। পিঠে। জন্তুর মত ফড়িং ঘাড়ে পড়েছে, নিজের দেহ দিয়েই মলিনের সামনেটা ঢেকেছে, পিঠটাই সে পেয়েছিল ছুরির মুখে।

সে একটা আশ্চর্য নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। এমন বলশালী দেহ তার আঘাতের ফলে একটা নিদারুণ চমকে চম্‌কে উঠে যেন এলিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব পাক খেতে খেতে ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।

অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে।

॥ তিন ॥

জ্ঞান হয়েছিল হাসপাতালে। তখন বোধ হয় মধ্য রাত্রি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়েছিল তার। নার্স কখন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ খোলা এবং খোলা চোখের স্থির চাউনি দেখে সে বোধ হয় ভয় পেয়েছিল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মলিন একটু হেসে তাকে আশ্বস্ত করেছিল।

নার্স জিজ্ঞাসা করেছিল—কেমন বোধ করছে সে।

সে বলেছিল—যন্ত্রণা রয়েছে। তবু ভাল।

মনে পড়ে জল চেয়ে খেয়েছিল।—তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও। আর যন্ত্রণা কমবার কোন ওষুধ দাও।

জল খাওয়ার পর নার্স ওষুধ খাইয়েছিল তাকে—এতেই যন্ত্রণা কমবে।

এবার সে জিজ্ঞাসা করেছিল—আর একটা কথা বলতে পার? আমার সঙ্গে কোন মেয়েছেলে এমনি ছুরি খেয়ে এসেছে? খুব সুন্দরী মেয়ে!

নার্স বলেছিল না তো। তোমাকে যখন স্ট্রেচারে করে বয়ে আনে তখন আমি-ই ছিলাম।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে চেষ্টা করেছিল। ফড়িংয়ের কথাও সে ভেবেছিল। সে কি ধরা পড়েছে? তার চীৎকার মনে আছে। আর কিছু নেই। ধরা যদি না-পড়ে থাকে ফড়িং তবে যেন ধরা না পড়ে! সে জানে, সে জানে, ফড়িংয়ের যন্ত্রণা সে জানে। ফড়িংয়ের কাছে তার অনেক ঋণ। খানিকটা রক্ত দিয়ে তা শোধ হয় না। অন্তত টিয়ার জন্য ফড়িংয়ের ঋণ। টিয়ার ঋণ তার নেই। সে শোধবোধ হয়ে গেছে। কিন্তু টিয়ার ভাই ফড়িংয়ের কাছেও তার ঋণ ছিল ও জন্যে।

ফড়িংয়ের খবর এনেছিল পুলিশ। একদিন পরেই। একখানা ফটো নিয়ে তার কাছে এসেছিল। —দেখিয়ে তো ফটোগ্রাফ্।

ফড়িংয়েরই ফটোগ্রাফ। রেললাইনের পাথর কুচির উপর ফড়িং বীভৎস মূর্তিতে পড়ে আছে। পা দুটো কাটা, ঠিক জানুর নিচে থেকে কেটে গেছে; তার উপরের দিকটা যেন থ্যাঁতলানো, অক্ষত আছে শুধু মুণ্ডটা।

ট্রেনে কাটা পড়েছে ফড়িং।

ছুটে পালাচ্ছিল সে উন্মাদের মত। কারিগরকে ছুরি মেরে উন্মাদই হয়ে গিয়েছিল সে। বোধ করি রেল লাইন ধরে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে—এই ধারণা থেকেই সে লাইনে-লাইনে ছুটছিল।

তারপর— ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল সে। জীবনে ঋণ তার কারও কাছে নেই। রয়ে গেল শুধু ফড়িংয়ের কাছেই।

হাসপাতালে দিনের পর দিন মনে পড়ত ফড়িংয়ের কথা। বিশেষ করে বিকেল বেলা, যখন রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা দেখতে আসত ; আপন-আপন প্রিয়জনকে ঘিরে বসত। কথা বলত। সে একলা চুপ ক'রে শুয়ে থাকত, আর ভাবত ফড়িং থাকলে সে আসত। ফল নিয়ে আসত, ফুল নিয়ে আসত।

সংসারে আপন মানুষের মূল্য এমন ক'রে কখনও বুঝতে পারে নি। —কিন্তু কে আপন জন ?

একদিন সে নার্সকে ব'লে পোস্টকার্ড আনিয়ে চিঠি লিখলে কলকাতায়। মায়া রায়, কেয়ারফ—বঙ্কিম ভট্টাচার্য। পাঁচ ছ দিন অধীর হয়ে রইল। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে টাঙা এক্কার শব্দের মত কোন শব্দ পেলেই সে উদগ্রীব হয়ে উঠত। কে এল ?

সাতদিন চলে গেল।

মায়া—মায়াবিনী। সব মিথ্যে। কে আপন জন ?

—সিস্টার !

—ফরমাইয়ে।

তার দীর্ঘদেহ, সুগৌর বর্ণ, কথাবার্তার ঢঙ, সর্বোপরি তার অপরিসীম সহ্যগুণ এই মেয়েগুলির কাছে তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। বোধ করি তার সঙ্গে করুণাও ছিল। লোকটির কেউ নেই। কেউ তাকে দেখতে আসে না।

—একটা আর্জি আছে আমার, শুনে যেন ঘেন্না করো না। আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না, রাগ করো না।

—না-না-না। কি বল?

—এই ঠিকানায় হামিদন্ বেগম বলে এক বাইজী আছে। তোমাদের জমাদার টমাদার কাউকে যদি একবার তার কাছে পাঠিয়ে একটা খবর দাও। বলবে রায় সাহেব তোমাকে একবার দেখতে চায়! আমি জমাদার সাহেবকে এক্কাভাড়া ও কিছু মজুরীও দেব।

একটুক্ষণের জন্য ও নার্স টি চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বলেছিল—বেশ তো। কিন্তু একটা খত লিখে দেবে না?

—দরকার নাই। আর আমি তো উর্দু লিখতে জানি না! মুখে বললেই হবে।

নার্স চলে গিয়েছিল। জমাদারকে ডেকে তার সামনে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে—পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হামিদন্ও আসে নি। জমাদার এসে বলেছিল—বেগম তো আনে নহি সকেগী। বড়া ভারী শেঠ আয়া হ্যায়। মাইফেল চলতা হ্যায়। মুলাকাত ভি নহি হুয়া!

তখন ঠিক সন্ধ্যার মুখ।

হাসপাতাল থেকে বাইরের লোক সব চলে গেছে।

সুদীর্ঘ ওয়ার্ডটার মধ্যে রোগীরা শুধু কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; কেউ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে—অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—এক একটা গোঙানী বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

সমস্ত পৃথিবীর চেহারাটা তার কাছে ঠিক এমনি হয়ে গেল সে দিন।

*　　　*　　　*

না। পৃথিবী হাসপাতাল নয়। সেখানে অন্তত সেবা আছে।

পরিচ্ছন্নতা আছে। শৃঙ্খলা আছে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ী এসে, পৃথিবীটা তার কাছে শেষরাত্রির ভাঙা জলসার আসর বলে মনে হল।

আলো নিভে আসছে, কতকগুলো নিভে গেছে। যে যার বাড়ী চলে গেছে আপন আপন পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে। ধুলোয়-উচ্ছিষ্টে-শূন্য ভোজনপাত্রে, পানের পিচে নোংরা হয়ে গেছে সব। নিজের সর্বাঙ্গে অবসাদ। কেউ নেই, কিছু নেই, সে একা বসে আছে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। আকণ্ঠ তৃষ্ণা, একবিন্দু জল নেই। শূন্য সুরাপাত্রগুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে। সূর্যোদয় আর হচ্ছে না। হয়তো হবে না।

তবু বাঁচতে হবে। হ্যাঁ বাঁচতে হবে।

দেহ তার ভেঙে গেছে। একটা আঘাত তাকে যেন দুমড়ে বেঁকিয়ে দিয়েছে। যেন ভূমিকম্পে খানিকটা মাটিতে ব'সে যাওয়া, ফেটে যাওয়া একটা স্তম্ভের মত হয়ে গেছে সে। রক্তপাত প্রচুর হয়েছিল। সে বেঁচেছে তার অসাধারণ সবল স্বাস্থ্য আর অপরিমেয় জীবনী-শক্তির বলে; তার সঙ্গে ধন্যবাদ দেয় সে ডাক্তার নার্সদের। পেনিসিলিন ব্লাডব্যাঙ্কের রক্ত তাকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

সেদিন প্রায় সারাটা রাত্রিই সে জেগেছিল। ঘুম আসে নি।

হঠাৎ একসময় মনে হয়েছিল—না, জীবনটা ভাঙা জলসার শেষ রাত্রিও নয়—। তার মনে পড়ে গিয়েছিল সেই গঙ্গার ধারের সেই রাত্রির কথা। যে রাত্রে ছায়া-মায়া তাকে বিভ্রান্ত মোহগ্রস্ত ক'রে সেই রেললাইনে রেললাইনে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে উদ্যতগতি ইঞ্জিনটার সামনে ফেলতে চেয়েছিল। মায়া মরীচিকার পিছনে পিছনেই সে সারা জীবন ছুটছে।

আশ্চর্য, তবু সে বাঁচছে। বিচিত্রভাবে সে বাঁচছে।

না। বিচিত্রভাবে নয়। সে বাঁচছে তার প্রাণ শক্তির প্রাচুর্যে—তার দুই আর দুইয়ে চার হিসেব বোধের জোরে।

জানালার ধারে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভোর হয়ে আসছিল। সেই দিকে তাকিয়ে—আবার সে সংকল্প করেছিল বাঁচবে। সকালে উঠেই সে লোক খুঁজে নিয়ে আসবে। ফড়িং আর হবে না। তবু লোক চাই। যে লোকটা মজুর হিসেবে খাটত ফড়িংয়ের সঙ্গে—দেহাতের এক খাপরা ব্যবসায়ীর বাড়ীর ছেলে—তাকে পাকা পোক্ত ক'রে রাখবে—সঙ্গে আরও দুজন লোক নেবে। নিজের সেবার জন্য—।

হঠাৎ মনে হল—ওই নার্সটিকে নিয়ে এলে কি হয়?

আবার নতুন খেলা! আবার নতুন পুতুল!

নার্স পুতুল চমৎকার হয়। সুন্দর।

অকস্মাৎ যেন দেহে তার জোয়ারের ইসারা জাগছে। মস্তিষ্কের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। দেহের রক্ত তার ক্ষয়িত হয়ে গেছে তবু যেন জোয়ারের তরঙ্গ জাগছে—ঢেউ উঠছে।

তাকে সে অনেক দেবে।

অর্থের অভাব তার নেই।

এই বারো তেরো বছরের মধ্যে একটা বিরাট যুদ্ধ চলে গেছে। যুদ্ধের কোন কিছু তাকে স্পর্শ করে নি। তার কানে আসে নি। যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। এখনও জের মেটেনি—জার্মানী হেরেছে। জাপানও হারবে হারবে করছে। এদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো একটা রক্ত গঙ্গা হবে। হোক। তাতে তার কিছু আসে যায় নি—কিছু আসবে যাবে না। সে পেয়েছে শুধু অর্থ। প্রচুর

তার বিক্রী হয়েছে। হবেও এখনও। ও নার্সটি যা চাইবে তাই দেবে। অনেক অর্থ তার লক্ষ্ণৌয়ের রূপের হাটে গিয়েছে। শেষ এই ক'মাসে টিয়াও কম নেয় নি। তবুও এখনও অনেক আছে।

শুধু অর্থ নয়—অনেক সমাদর—অনেক—অনেক ভালবাসা—অফুরন্ত জীবনের উত্তাপ তার আছে। ও মেয়েটাকে সে ননীর মত গলিয়ে দেবে।

স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে সেজেগুজে সে টাঙা নিয়ে বিকেলে গেল হাসপাতালে। সঙ্গে নিয়ে গেল অনেক পুতুল। কিন্তু পথ থেকে সে ফিরে এল।

—ঘুরে চল— বাড়ী পৌঁছে দাও, টাঙাওলা সাহেব।

বড় ক্লান্ত সে। কিছু ভাল লাগছে না।

একদিন নয়। দিনের পর দিন। কোন দিন পথ থেকে ফিরেছে, কোন দিন ওদের সঙ্গে দেখা করেছে। পুতুল দিয়েছে। কুশল জিজ্ঞাসা করেছে। সুখদুঃখের খোঁজ নিয়েছে। চলে এসেছে। যে উল্লাসে পুরুষের মন নারীর মনে তরঙ্গ তোলে, সে উল্লাস যেন তার কোথায় হারিয়ে গেছে। অন্তত ওই মেয়েটিকে দেখে সে উল্লাসকে সে খুঁজে পায় নি। তাই বা কেন? কতদিন সে চৌক বাজার ঘুরেছে, উপরের বারান্দায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকা বিলাসিনীদের দিকে চেয়ে দেখেছে—তাতেও তার মন উল্লসিত হয় নি।

মদ তার বিস্বাদ লাগে। সহ্যও হয় না। মাথা ধরে অল্প একটুতেই।

তবে তার কি ভাল লাগবে?

বাইরে বের হওয়া সে বন্ধ করে দিলে। চুপচাপ ঘরে বসে ভাবত।

বাঁ হাতে পুতুল—ডান হাতে তুলি ধ'রে বসে বসে ভাবত। ভাবত ঠিক নয়—মন যেন শূন্য হয়ে যেত। সব শূন্য—ভিতর—বাহির সব শূন্য। আকাশ মাটী আলো অন্ধকার মানুষ জন—সব অর্থহীন। তার চোখের সামনে থাকা না-থাকা সব সমান। নিরর্থক।

এরই মধ্যে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দিবাস্বপ্নের মত চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই ছায়া-মায়া। গোটা ছবিটা নয়। মনে ভেসে উঠত সেই গভীর রাত্রে গলি মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ তার পাশ দিয়ে যেন চলে গেল শ্বেতবস্ত্রাবৃতা মায়া। আবার ভেসে উঠত দুপাশে মালগাড়ীর ছায়ায় গাঢ় রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মায়া চলে যাচ্ছে, লঘুপদক্ষেপে, হয়তো বা পা তার মাটিতে পড়ছে না। আর দেখতে পেত ইঞ্জিনটার সামনে দিয়ে সে পার হয়ে চলে গেল। কোথায় গেল—কে জানে? এই স্বপ্ন মায়াই তার জীবন। সব মায়ার মত মিলিয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে ক্ষোভ আক্ষেপ সব স্তব্ধ হয়ে আসে। হাহাকার না, বেদনা না, কিছু না—থাকে শুধু একটা প্রশ্ন। —কি? কি দেখেছিল সে?

ভ্রম? তার অতি ব্যগ্র মনের মিথ্যা সৃষ্টি? এই পুতুল-গুলোর মত?

এগুলোও তার কাছে মনের এই অবস্থায় মিথ্যা মনে হয়। এক-এক সময় জলে-ডুবে-যাওয়া মানুষের মত তার ভিতরের মানুষটার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হয়। সব ভেঙে চুরমার ক'রে দেবার বাসনা উগ্র হয়ে ওঠে।

কিছু নাই—কেউ নাই—এরা সব ফাঁকি—সব মেকি—সব মিথ্যে হয়ে গেলে সে বাঁচবে কি ক'রে? অথচ তার চাই। জীবন চাই।

তার প্রাণ-মন-ভরা জীবনের স্পর্শ চাই, কান জুড়ানো নয়—প্রাণ মাতানো কথা চাই, কান্না নয়—হাসি চাই, এই দুঃখ নয়—সুখ চাই ; জীবনের এই অন্ধকার ঘুচানো আলো চাই। এ যেন সেই ছায়া-মায়া দেখা রাত্রিটাই আজও তাকে ঘিরে রেখেছে—এর আর শেষ হল না। না—তাই বা কেন?—দেবীগ্রামের সেই রাত্রিটা সেই উজ্জ্বল আলোয় ভরা নাট মন্দিরে মহালক্ষ্মীর প্রতিমা যোগেশ কারিগরের তুলিতে ফুটে উঠেছে—চোখ মেলেছে—জাগছে—আর সে পঙ্কজিনীর ছেলে মলিন—সে দূরে সেই অর্জুন গাছটায় উঠে বসে দেখছে—তার চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার, তার সর্বাঙ্গ বিষাক্ত পোকায় ছেঁকে ধরেছে, তার দেহ জ্বলে গেল। চীৎকার করতে ইচ্ছা হয়, পারে না। চীৎকার সে করবে না।

হঠাৎ একদিন। সাজানো শোবার ঘরটা খুলে ঢুকল। অনেকদিন এ ঘরে সে ঢোকে নি। এ ঘরটা তার নারী নিয়ে বিলাসের ঘর। কতদিন বিলাসিনীকে নিয়ে এই ঘরে রাত্রি যাপন করেছে। কত বিচিত্র নগ্ন নারীমূর্তি দিয়ে সাজানো। তার নিজের হাতে গড়া।

এই ঘরে ঢুকেই সে হামিদন্‌কে আলিঙ্গন করেছিল এবং হামিদনের হাসি শুনে ফড়িং ঘরে ঢুকে তাকে ছুরি মেরেছিল।

সামনেই বড় ড্রেসিং টেবিল। ঘরে ঢুকেই বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। ও কে? সে? ওঃ! এই কয়েক মাসেই সে এমন হয়ে গেছে? এ কয়েক মাস তার ভাল ক'রে নিজেকে দেখবার অবকাশ হয় নি। চোখ ছিল না। সাধারণত স্নানের পর একবার ছোট একখানা আয়না সামনে ধরে চুলটা আঁচড়ে নিত। কোনদিন বা আয়না সামনে ধরতও না। —আজ বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

এই কয় মাসেই—তার চুলে এমন পাক ধরেছে! মুখে এমন রেখা পড়েছে! ভাঙা শরীর জোড়া তো লাগেই নি উপরন্তু আরও যেন ভেঙেছে! বয়স তার আর কত? পঞ্চাশ এখনও হয় নি। সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বোধ হয়। জন্ম সাল সে জানে না। কি করে জানবে? হতভাগিনী ব্রাহ্মণ কন্যা পঙ্কজিনী কর্ম ফেরে বোষ্টুমি হয়ে দাসী বৃত্তি করত। হিসেবে গোলমাল করে নিজের কলঙ্ক কাহিনী ছড়িয়ে হতবাক হয়ে অপ্রতিভ হাসি হাসত। সেই জীবন-তছরূপের ভুল হিসেবের অঙ্ক ফল সে। নিজের জন্ম সাল সে জানবে কি করে! তবুও পঞ্চাশ এখনও হয় নি, এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত। অথচ—।

অথচ ক'মাস আগে, এই ঘটনাটা ঘটবার আগেও তার দেহে ছিল যৌবনের জোয়ার। প্রথম আশ্বিনের ভরা নদের মত ছিল তার রূপ। তার সবল দেহ পশ্চিমের জলে হাওয়ায় আরও সবল সুদৃঢ় হয়েছিল; তার গৌরবর্ণ রঙ আরও উজ্জ্বল হয়েছিল; গালের উপরে কপালে একটা রক্তাভা যেন আনারের দানার রঙের মত ফেটে পড়তে চাইত। শুধু চোখের কোলে কালি পড়েছিল। রূপের হাটের জোর-জৌলুষ আলোর কালি। আর মদ খাওয়ার জন্যও বটে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসত আর বলত—চন্দ্রের কলঙ্ক!

সাধারণ লোকে চুস্ত পায়জামা পাঞ্জাবী পরা তাকে দেখে বিশ্বাসই করত না বাঙালী বলে। বললেও বিশ্বাস করত না। নিজেই নিজের বাঙালী পরিচয়টা গোপন রেখেছিল এই সুযোগে। বাঙালী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি। ইচ্ছে হয় নি তার। রায় উপাধিটাকে রাও করে নিয়েছিল। সেই দেহ, সেই রূপ তার

কয়েক মাসের মধ্যেই ভেঙে গেল—বিবর্ণ হয়ে গেল। কিসের একটা যেন ছায়া পড়ল। কিসের ছায়া? উপবাসী অন্তরের ছায়া? পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া মনের ছাপ? মনের আগুনের কালী! কোন জলে তার এ আগুন নিভছে না। কি করবে সে? কাঁদতে চায়, কিন্তু কাঁদতে পারে না। অকস্মাৎ সে দিন সে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। উন্মত্তের মত ক্রোধে ওই একটা নগ্ন মেয়ের পুতুল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল—সামনের আয়নাটাতে। ঝন ঝন শব্দে আয়নাটাও ভেঙেছিল, পুতুলটাও ভেঙেছিল। পুতুলগুলো ছিল বড় এবং ভারী। পোড়ানো নয়; প্লাষ্টার দিয়ে তৈরী করেছিল সে। বর্দ্ধমানের গোলাপবাগের মার্বেল মূর্তির মত।

তারপরই সে বসেছিল বোতল নিয়ে। মদ খেয়ে সে আজ মনকে বেঁধে বের হবে। নতুন হামিদন্ বের করবে। কিংবা কি চায় বের করবে। কিন্তু যাওয়া হয় নি। মদ খেয়ে সে অল্পক্ষণেই সংজ্ঞা হারিয়েছিল।

সংজ্ঞা ফিরেছিল শেষ রাত্রে। উঠে বসে স্তব্ধ হয়ে সে বসেছিল সকাল পর্যন্ত।

সকাল হ'তে স্নান করে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ফিরতে হয়েছিল প্রায় তিনটা। অনেক কাজ করতে হয়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করা, বাড়ী-ওয়ালাকে এক বছরের বাড়ী-ভাড়া জমা দেওয়া, টিকিট করা অনেক কাজ!

॥ চার ॥

তুনিয়া খুঁজে—প্রয়োজন হলে তুনিয়ার বুক চিরে খুঁজে দেখবে। যা পেলে মন ভরে, প্রাণ ভরে—জীবন জুড়িয়ে যায়—তাই নিয়ে তবে সে ফিরবে!

বৃন্দাবন থেকে শুরু করলে। বৃন্দাবন থেকে মথুরা। ভাল লাগল না তার। দেবতাতে তার বিশ্বাস নাই, মন ওঠে না। ওই ত্রিভঙ্গঠামের ঠাকুরের চেয়ে মন্দিরের গায়ের মূর্তি অনেক ভাল।

আগ্রা—ফতেপুর সিক্রী।

বিরাট। সুন্দর। কিন্তু তাও ভাল লাগল না। ঠিক তারই মত—খাঁ-খাঁ করছে—হা-হা করছে।

হঠাৎ মনে হল—না—এর চেয়ে মন্দিরগুলো ভাল। ওগুলো এমন খাঁ-খাঁ করে না—হা-হা করে না।

পাথরের ঠাকুর—কাপড়ে চোপড়ে অলঙ্কারে আভরণে সেজে—ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে ভরাট করে রেখেছে। মানুষ কাঁদছে, হাসছে। কলরব করছে। ঢেলে দিচ্ছে! মিথ্যে সবই—তবু বিচিত্রভাবে শোকের সান্ত্বনার সাজানো কথার মালার মত সেজে রয়েছে।

ওই ছায়া-মায়ার মত।

হঠাৎ তার মনটা ব্যগ্র হয়ে উঠল—কোন সত্যকারের সাধুর জন্য। জিজ্ঞাসা করবে—এই ছায়া-মায়ার কি অর্থ? কিছু অর্থ আছে কি?

চললো সে হরিদ্বার। ওখানে অনেক সাধু আছেন। তার মধ্যে সত্যকারের সাধু আছেন। শুনেছে সে। তাঁদের মতের সঙ্গে

মিলুক আর নাই মিলুক—মিথ্যা তাঁরা বলেন না। তাঁরা জানেন অনেক।

মিলল এক সাধুর সন্ধান।

ভাল লাগল সাধুকে। স্থবির উদাসী ছোট্ট একটি কুটীরের সামনে—একটি ধুনি-জ্বেলে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। বসেই আছেন। যেন অনন্ত কাল বসে আছেন। দৃষ্টি চলেছে—চলেছে—দূর থেকে দূরান্তর—সীমাকে অতিক্রম ক'রে আরও চলেছে। কোটী কোটী যোজন দূরবর্তী কোন গ্রহের রশ্মির ধারার মত—যা ছুটে আসছেই আসছেই—সৃষ্টির আদিকাল থেকে—কিন্তু আজও এসে পৌছয় নি পৃথিবীতে।

মলিন গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল; আরও লোক দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখলে তারপর সামনে গিয়ে প্রণাম করে বসল। সাধু একবার হাত তুললেন শুধু। অনেকক্ষণ পর ভিড় কমল, যারা ফিরবে তারা ফিরতে সুরু করলে, যারা এগিয়ে যাবে তারাও অগ্রসর হল। মলিন চেষ্টা করলে কথা বলতে। কিন্তু কোথায় যেন বাধছে।

সাধুই প্রশ্ন করলেন—কেয়া ভাই? তুমি ফিরবে না?

মলিন মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—মুখ তুললে।

—কিছু বলছ আমাকে?

—কুছ পুছনেকা আছে বাবা!

পুছনেকা? আশ্চর্য একটি হাসি সাধুর মুখে ফুটে উঠল। তারপর বললেন—সনসারমে, সৃষ্টিমে—পুছনাই আছে ভাই—জওয়াব—। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন—নেহি।

—নেই? মলিন যেন কেঁদে উঠল।

মৃদুস্বরে সন্ন্যাসী বললেন—পুছনা—প্রশ্ন! জ্ঞাতুম ইচ্ছাই তো প্রশ্ন। জানাতেই তার জওয়াব। শোনাতে নয়। দুনিয়ায় সব জানাই হয় আপনা জিন্দগী থেকে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—আমার নিজের প্রশ্নের জবাবই আজও মিলল না। সেই শুরু করেছি কবে থেকে। প্রশ্নের জবাব আমি কি ক'রে দেব বেটা?

বলেই তিনি ধূনি থেকে একখানা কাঠ তুলে নিয়ে চলে গেলেন কুটীরের মধ্যে।

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলেছে। অপরাহ্নের আলো রাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মলিন উঠল, দ্রুতপদে ফিরল।

সারা রাত্রি তার ঘুম হল না।

পরের দিন সকালে উঠেই আবার চলল সে।

জিজ্ঞাসা করবে, বলবে—তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব। নিজের খুঁজবার শক্তি আমার নাই। তুমি বল।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হল না। পথ থেকেই সে ফিরল। পথের ধারে একটা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করছিল, বিশ্রামের তার প্রয়োজন ছিল না, বিশ্রামের উপলক্ষ্য করেই বসে সে ভাবছিল। ছায়া-মায়ার কি ব্যাখ্যা করবেন সন্ন্যাসী? ভ্রম? মনের বাসনার ছলনা? কিন্তু সে তো সবই ওই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। সে যে চোখে দেখেছে; বিষের ক্রিয়ার মত তার ক্রিয়া যে আজও চলছে তার দেহে-মনে! যার এত বড় ক্রিয়া তা মিথ্যে কি করে হবে?

ছায়া-মায়া কি বলে গেছে—কি ইঙ্গিত দিয়ে গেছে? ইঙ্গিত দিয়ে গেছে—মায়ার মোহ ছাড়! সে আমারই মত মিথ্যা!

না—বলে গেছে—কায়া ধারিণী মায়াই তার জীবনের একমাত্র সত্য !

পথ ধরে যাত্রীরা চলেছিল। কেউ উপরের দিকে কেউ নিচের দিকে। হঠাৎ একটা খিল খিল হাসিতে পার্বত্য পটভূমি যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। নারী কণ্ঠ। একটি দল নিচের দিকে নামছে। দুটি মেয়ে আর জন দুয়েক পুরুষ। একটি ছেলে। কাঁধে ঢোলক রয়েছে।

আশ্চর্য প্রাণবন্ত মেয়ে। উজ্জ্বল পার্বত্য ঝর্ণার মত। পার হয়ে তারা চলে গেল। নিচের দিকে তারা নামছে। ওরা অনর্গল হাসতে হাসতে চলেছে। সে হাসি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ভেসে ভেসে আসছে। তারপর মিলিয়ে গেল। সে বসেই রইল। অনেকক্ষণ পর সে উঠল। কিন্তু উপরের পথ ধরলে না। নিচের পথ ধরলে। সাধুর কাছে সে যাবে না। সে ওই দলটার খোঁজে চলেছে।

কি বলবে সাধু ? তার নিজের প্রশ্নেরই জবাব সে পায় নি, তার প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে ? তার চেয়ে ওই মেয়েটার ডাক তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

ভাবে ভঙ্গিতে পোষাকে পরিচ্ছদে মেয়েটা দেহাতি নাচওয়ালী। মন্দ হয় না। ওই মেয়েটার সঙ্গে ঢোলক কাঁধে নিয়ে দেশ দেশান্তরের পথে ঘুরে বেড়ালে। কি গাইবে—? গজল ?—ইশক পর জোর নহী—

ন লগায়ে ন লগে—আওর বুঝায়ে ন বনে—
ঈশক পর জোর নহী—।

নামতে লাগল সে। নামতে নামতে হরিদ্বারে এসে পৌঁছুল।

কিন্তু দলটাকে আর পেলে না। পেলে দু দিন পর। সে তখন রওনা হচ্ছে হরিদ্বার থেকে। পথের ধারে ওদের আসর পড়েছে। লোক জমেছে। কি গাইছে?

রোয়েঙ্গে হম হজারো বার
কোই হমে মনা ন কিও।

মেয়েটাকে আজ অত্যন্ত কুৎসিৎ লাগল। বলছে—আমি হাজার বার কাঁদব—আমাকে কেউ মানা করো না।

অথচ মেয়েটা বাঁকা চাউনিতে কটাক্ষ হানছে এবং মুচকি মুচকি হাসছে। বিশ্রী! কুৎসিৎ! অতি কুৎসিৎ! দুনিয়াটাকে মিথ্যে বানিয়ে দেয় এরাই।

রোয়েঙ্গে হম হজারো বার
কোই হমে মনা ন কিও।

একথা যখন বলে মানুষ আর সত্যিই কাঁদে তখন ওই চোখের জলে আর ওই গানের সুরে মরুভূমিতে ফুল ফোটে—শিউরে ওঠে মরুভূমি মানুষের দেহের রোমাঞ্চের মত—মরুভূমির বুক অকস্মাৎ সবুজ ঘাসের কণায় ভরে যায়। রোয়েঙ্গে হম হজারো বার কোই হমে মনা ন কিও।

এ গান সে শোনে নাই কিন্তু এ কথা সে শুনেছে—এ কান্না সে দেখেছে পাটনায়।

মায়ার কান্না; শীর্ণ দেহ আসন্নপ্রসবা মায়া সেদিন ছনের ফাঁসীর হুকুমের খবরের ছুতো ধরে কাঁদছিল।

সে বলেছিল—কেঁদো না, আমার কান্না ভাল লাগে না।

মায়া অকস্মাৎ উঠে বাড়ীর বাইরের দরজার দিকে চলতে সুরু করেছিল। বাধা দিয়ে মলিন বলেছিল—কোথায় যাবে?

মায়া বলেছিল—কাঁদতে। কাঁদতে যাচ্ছি আমি গঙ্গার ধারে।

রুয়েঙ্গে হম হজারো বার

কোই হমে মনা ন কিও।

সে তাকে একটা ঘরের মধ্যে পুরে তালা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে সেই ঘরের মধ্যেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। ছনের ফাঁসীর হুকুমের সংবাদটা উপলক্ষ্য। আসল কথা ছিল—সে। সে তখন তাকে সহ্য করতে পারছিল না। না। মিথ্যে। ঝুট। সব ঝুট। মায়ার কান্না ঝুট। মিথ্যে। ছায়া-মায়া তাকে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে সব ঝুট। মায়ার কান্না মিথ্যে। এ মেয়েটার এই গান মিথ্যে। সত্য ওই হাসি আর কটাক্ষের অন্তরালের দুনিয়াদারী! বানিয়াগিরি!

যে গান-লিখনেওলা এই গান লিখেছিল—তার এই গান লেখাও হয়তো ঝুট—মিথ্যে। দুনিয়ার লোকের তারিফের জন্যই হয়তো লিখেছিল। তারই খেলনার পুতুলের মত।

না তার চারটে পুতুল অন্তত তা নয়। মিথ্যে নয়। না—মিথ্যে নয়!

তার বোষ্টুমী পুতুল, কনে পুতুল, চুড়িওয়ালী, ছায়া-মায়া, এ তার মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয়। কতদিন এই পুতুলগুলিতে তুলি চালাবার সময় হঠাৎ এক এক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়েছে। কেউ জানে না। রঙের মধ্যে তার চিহ্ন আছে। লোকে জানে সে কখনও কাঁদে নি। সে নিজেও বলে—কান্না তার ভাল লাগে না।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে মেয়েটা নাচতে নাচতে এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে একটা হাত গালে দিয়ে অন্য হাতখানি নেড়ে—গাইলে—

দিলহী তো হৈ ন্ সঙ্গয়া খিশ্‌ত,
দর্দ সে ভর ন আত্র কিঁও?

এতো মানুষের হৃদয়, পাষাণ তো নয়, পোড়ানো মাটি ইঁটও নয়, বেদনায় ভরে উঠবে না কেন?

সুতরাং—রুয়েঙ্গে হম হজারো বার, হমে কোই মনা ন কিও।

মেয়েটার হাতে একটা টাকা দিয়ে হেসে সে বললে—অব উধর।

বলেই সে ফিরল।

মিথ্যে। ঝুট!

চলো মুসাফের। আর ঝুট কিছুর পিছনে নয়। সাচ্চা কিছু চাই। সত্য কিছু। সাদা হোক কালো হোক—যা চিরকালই সাদাই থাকবে, অথবা কালোই থাকবে। মায়া ছায়া হবে না।

কলকাতার দিকে পিছন ফেরো। চল, খোঁজ।

দীর্ঘ দেড় বছরেরও বেশী কেটে গেল।

দিল্লী, আজমীঢ়, জয়পুর, চিতোরগড়। সেখান থেকে বোম্বাই। বোম্বাই থেকে সারা দক্ষিণ। এরই মধ্যে মন তার যেন খানিকটা লেগে গেল। বেশ লাগল।

বড় বড় মন্দির, মসজিদ, পাহাড়ের উপর পাথরের কেল্লা, কত মতিমহল, নূরমহল, হাওয়ামহল, রত্ন মঞ্জিল; কত বাহারের নক্সা, কত অপরূপ সুন্দর পাথরে খোদাই পুতুল। গুহা দেখলে। অজন্তা ইলোরা। কি অপরূপ ছবি!

বিচিত্র ভাবনা মনে জাগত। এ বেলা একটা ও বেলা তার বিপরীত।

এ বেলা তারিফ করত।—কি স্বর্গই না তৈরী করে গেছে!

ও বেলা মনে হত—ও স্বর্গে যারা বাস করত—তারা কি সব পেয়েছিল ? কোন দুঃখ ছিল না ? যারা তৈরী করেছিল—তারা ?

দুনিয়ার লোকের মন ভেজাবার জন্যে গান-লিখ্‌নেওয়ালার গানের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায় ?

মধ্যে মধ্যে মদ খেতে ইচ্ছে হত। চেষ্ট করত। কিন্তু দেহে সহ্য হত না, আর মুখের কাছে এনে মনেও ভাল লাগত না। কখনও কখনও মন চঞ্চল হয়ে উঠত,—রূপের হাটের দিকে ছুটত। কখনও কোন নারীকে দেখে কয়েক দিন ঘুরত তার পিছনে। হয়তো বা কয়েক ঘণ্টা। আবার মাঝপথ থেকে ঘুরত। এবং চলে যেত সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায়।

হরিদ্বারে সাধুর কাছে তার কথার ঠিক জবাব পায় নি! তিনি বলেছিলেন নিজের জবাব নিজের জীবন থেকে খুঁজে নিতে। কিন্তু দক্ষিণে এসে একজন পাগলা সাধুর কাছে একটা জবাব পেয়েছে। পাগলাকে তার ভাল লেগেছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পার ?

পাগল বলেছিল—প্রশ্ন মানে দুঃখ। সুখ যখন আসে তখন তো মনে হয় না—এটা কি হল! দুঃখ এলেই মনে হয়—কেন এমন হল ? দুখ হল সুখের অভাব-অসুখ। সুখ যাতে মেলে তাই কর ভাইয়া, দুখ ঘুচে যাবে, কোন প্রশ্ন মনে জাগবে না। তবে দেখো ভাই, সুখ বলে এমন কিছু ধরো না যা পরে দুখ দেবে। ভুখ লাগলে খাও বাবা, কিন্তু এমন কিছু খেয়ো না যাতে অসুখ করে। সংসারে কিছু খেয়ে জাত যাবার ভয় ঝুট কিন্তু অসুখের ভয় সচ্। আনন্দ রহো ভাই। আনন্দ। বস্। যাতে আনন্দ—তাই দুনিয়ায় সব প্রশ্নের জবাব। আনন্দ। মদ খেয়ে আনন্দ মেলে তাই খাও। তবে

ভবিষ্যৎ খারাপ না হয়, দিল না দুখায়। বস্। প্রশ্ন মানেই ভুখা, খাও ভাই খাও। খাবার একমাত্র চিজ হল আনন্দ। বস্।

তাই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি ভাল লাগবে? কিসে আনন্দ?

ঘুরতে ঘুরতে তার কাঁচা সোনার মত গৌর বর্ণ পুড়ে তামাটে হয়ে গেল, একদিন এসে দাড়াল রামেশ্বরমের সমুদ্রের ধারে। আর যাবার জায়গা নেই। অথৈ সমুদ্র। দেবে ঝাঁপ।

নাঃ। মরতে তার ভয় নেই। রঘুর সঙ্গে লড়েছে সে, বাগবাজারে বঙ্কিম ভটচাজের দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। রেল ইঞ্জিনের সামনে এনে ফেলতে চেয়েছিল ছায়া-মায়া—উল্লাসের সঙ্গে সে অনুসরণ করেছিল। ফড়িং তাকে ছুরি মেরেছিল তাতেও তার মরবে বলে ভয় হয় নি। কিন্তু মরার মধ্যেও সুখ নাই। কষ্ট আছে।

নাঃ—। মরবে না সে।

ফেরো মুসাফের।

ফিরল সে। ফেরবার সময় তার খেয়াল হল দেশে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। অনেক বদল। সে দিন একত্রিশে জানুয়ারী উনিশ শো আটচল্লিশ। সন্ধ্যের সময় সে স্টেশনে বসে চমকে উঠল। গান্ধীজীকে গুলি ক'রে মেরেছে!

দেশে দাঙ্গা হয়েছে। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা।

দেশ ভাগ হয়েছে। ইংরেজ চলে গিয়েছে।

যা হয়েছে—তার তাতে কিছু যায় আসে নি। এই গান্ধীজীর মৃত্যুতে সে দুঃখ পেয়েছে। ক্ষতি তার কিছু হয়েছে। সায়েবরা চলে গিয়ে তার ক্ষতি হয়েছে। ওরা তার পুতুল কিনত অনেক।

পথে একবার সে দিল্লীতে নামল। ঘুরে দেখলে স্বাধীন দেশের রাজধানী। একদিন মিটিংয়ে নেহেরুজীকে দেখলে, প্যাটেলজীকে দেখলে, মাউণ্টব্যাটনকে দেখলে। আর দেখলে কি ভিড়! কি ভিড়! পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু। ছেলে মেয়ে—মেয়ে ছেলে! কে বললে—সুন্দরী যুবতী মেয়ে বিক্রী হচ্ছে।

চৌকবাজারের আশে পাশে অলিতে গলিতে, পার্কে পার্কে, কুতুবমিনারের ওখানে নির্জনে হাট বসে যায়।

সে বের হল। কিনুক না-কিনুক দেখবে। দেখে পছন্দ হলে কিনবে। কাউকে দেখে যদি উল্লাস জাগে—আবার ঘর পাতবে। বাস্! এই ঠিক।

এল। একজন, দু জন। তিন চার দিনে দশ বারোটি মেয়ে। গরীবের মেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে—শহরের মেয়ে। মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, চতুরতার ছাপ; উদাসীন দৃষ্টি; ঈষৎ চঞ্চল কটাক্ষের সঙ্গে একটু হাসি। কারুর হাত নিজের হাতে টেনে নিতে গেলে চকিত হয়ে হাত টেনে নিতে চায়, কেউ ছেড়ে দেয় চেতনাহীনের মত, কেউ জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে; কারও স্পর্শ শীতল; কারও স্পর্শ জ্বরোত্তপ্ত; কারও হাত ঘর্মাক্ত কম্পিত।

নাঃ। হল না। পছন্দ হয় নি, হবেও না। আর এনো না। নাঃ।

না-না। আর আনতে হবে না! চাই না। আমার চাই না।

কি? চাই না যদি তবে আনতে বলেছিলাম কেন? কি? ছুরি? হাসলে মলিন। মেরে ফেলতে চাও? না টাকাকড়ি কেড়ে নিতে চাও? আমার কাছেও ছুরি আছে। টাকা চাও তো নাও। মেরে ফেলতে চাইলে নিশ্চয় একবার লড়ে দেখব।

টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না। গায়ের দামী পাঞ্জাবী

আর কোটটাও নিয়ে গেল। যাও। মলিনের স্যাণ্ডেল জোড়াটা আছে। হাতে তামার মাতুলী আছে। আস্তানায় জিনিষপত্রের সঙ্গে আরও কিছু আছে। ব্যাঙ্কেও আছে। পড়ে আছে সেটা লক্ষ্ণৌতে।

ঠিক আছে। নমস্তে! চলে যাও সাহেব। চলে যাও!

* * *

দিল্লী থেকে ফিরেছিল লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থাও সে অবস্থা নেই। সব ভেঙ্গে চুরে গোলমাল হয়ে গেছে। হামিদন্ নেই। কেউ বলে সে পাকিস্তান চলে গিয়েছে —কেউ বলে ভয়ে পালিয়েছিল, অন্য মহল্লায় খুন হয়েছে। কেউ বলে পথে লুঠ হয়েছে। যাক। কত গিয়েছে—কতজন গিয়েছে। যাক।

সে আবার আরম্ভ করলে কাজ।

হঠাৎ একদিন আবার বন্ধ করে দিলে সব।

নাঃ। ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না। মূহূতে মুহূর্তে ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে। দু একজন পুরানো পাইকারী খরিদ্দার এসে বললে—নয়া জমানার নতুন পুতুল তৈরী করুন সাহেব! গান্ধী, নেহেরু, নেতাজী, পাটিল সাহেব, অশোক স্তম্ভ, ভারত মাতা।

মলিন বললে—নেহি। বন্ধ করে দিলাম কাজ। কাম আওর নহি করুঙ্গা। বস্।

নয়া জমানা, নয়া জমানা! বিলকুল ঝুট!

যার নয়া জমানা তার। তার নয়। তার সব জমানা ঝুট হয়ে গেল।

চলো মুসাফের।

এবার সে যাবে কলকাতায়।

তুনিয়ার সব জমানার মধ্যে একটি রাত্রি তার কাছে শুধু সাচ্চা। সে ছায়া-মায়া দেখার রাত্রি।

সেই অন্নপূর্ণার ঘাট। সেই আশ্চর্য রাত্রি। জীবনে একটি মাত্র তুর্জ্জয় প্রশ্নের মত তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া নয়। মায়াকে সে আর খুঁজবে না। মায়াকে তার আর প্রয়োজন নেই। সে তো আজ প্রৌঢ়া। মোহিনী মাধুরী আজ গলিত হয়ে গেছে।

সেই ছায়া-মায়া সে চিরনবীনা। তাকে খুঁজবে সে। রাত্রির পর রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকবে সেইখানটিতে।

চলো কলকাতা। চলো চিরদিনের মত। চিরদিন আর ক' দিন ?

তবুও পুতুল ছাঁচ-তুলি-রঙ—এ সব সে নিলে। চিরদিনের বাকী কটা দিনও বাঁচতে হবে, খেতে হবে তো!

এক সময় মনে হয়েছিল ওইটেই আসল। খাওয়া-পরা। খাওয়া পরাতেই সব সুখ। আজ উল্টেছে পাশা। এবার দানের অঙ্ক বলছে—না, ঝুট।

তা বলুক। কিন্তু বাঁচতে হবে তো। মরলে তো রামেশ্বরমেই ঝাঁপ খেতে পারত।

বাঁচবার জন্যে খেতে হবে তো!

॥ পাঁচ ॥

কলকাতায় এল সে। নামল আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস থেকে। এরই মধ্যে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা পথটুকুর মধ্যে তার অনেক বদল হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে নেমে পড়েছিল কাশীতে। গঙ্গাস্নান করেছে। পায়জামা ছেড়েছে, পরেছে থান ধুতি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছে। বাবরী চুলও ছেঁটে ফেলেছে। তার সে গৌর বর্ণ আর নেই, তবুও লক্ষ্ণৌতে মাস দেড়েক বিশ্রাম করে অনেকটা ফিরেছে; থান ধুতি সাদা পাঞ্জাবীতে দীর্ঘকায় মানুষটিকে সুন্দর মানিয়েছে। চোখে একটা নীল চশমা।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিক চেয়ে দেখলে। ১৯৩৭।৩৮ সালের সঙ্গে অনেক তফাৎ। আর কি ভিড়। অগণিত মানুষ। অসংখ্য যানবাহন। ঘোড়ার গাড়ী নাই। ট্যাক্সি-মোটর-মোটর বাস-লরী। বাইরে এসে আরও চেনা যায় না সে হাওড়া স্টেশনকে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে নতুন হাওড়া ব্রিজটা। সে তৈরী-হচ্ছিল অবস্থায় দেখে গিয়েছিল। ব্রিজটার দিকে তাকিয়ে সে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। হাওড়া ব্রিজটার একটা পুতুল করলে কেমন হয়?

চমক ভাঙল তার কিছুক্ষণ পর। একটা কর্কশ তীক্ষ্ণ ধাতব আর্তনাদ—তারপরই একটা প্রচণ্ড উচ্চশব্দ; সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ শব্দ। একখানা ট্যাক্সি আর বাসে ধাক্কা খেয়েছে। কোলাহল করে লোক ছুটছে। সে সচেতন হয়ে ডাকলে একখানা ট্যাক্সি।

চলো—হোটেলে চলো এখন।

হোটেলে উঠে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কলকাতা! এ হোটেল সেই হোটেল যে হোটেলে বিয়ের দিন মায়াকে নিয়ে উঠেছিল। ঘরখানা সেই ঘরখানা নয়, তার ঠিক পাশের ঘর। সবই এক প্রায়। তবে ঘরগুলি আগের থেকে সৌখীন হয়েছে—আরামের উপকরণ বেড়েছে। দেওয়ালের রঙ পাল্টেছে। নিওন লাইট হয়েছে। আসবাবপত্রে নতুন ফ্যাশনের ছোঁয়াচ। ভাড়াও অনেক বেড়েছে! টাকা তার আর বেশী নেই। সবই প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আছে মাত্র শ কয়েক টাকা। চার অঙ্কের এক অঙ্ক ক্ষয় হয়েছে।

কলকাতায় জনারণ্য। বাসা পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু পেতে হবে তাকে। পেতে হবে ওই অন্নপূর্ণা ঘাটের কাছে। নিত্য রাত্রে সে গিয়ে দাঁড়াবে।

হঠাৎ সে উঠল। দরজায় তালা দিয়ে নেমে এল। বেন্টিঙ্ক-স্ট্রীটের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। এখনি সে ট্রামে চড়ে একবার ঘুরে আসবে। বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটটা দেখে আসবে। ঠিক তেমনি আছে? বুকের মধ্যে বিচিত্র অনন্ত তৃষ্ণা—সে তৃষ্ণা মিটতে পারে এক ওই অন্নপূর্ণা ঘাটের জলে। প্রাণের মধ্যে তার মর্মান্তিক ঘৃণা। সে ঘৃণার পাত্রী আছে ওই বাগবাজারে, নিষ্ঠুর ক্রোধে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে মধ্যে মধ্যে। বঙ্কিম ভটচাজ থাকে ওই বাগবাজারে।

ঘুরে এল।

তেমনি আছে অন্নপূর্ণা ঘাট। পোর্ট কমিশনার'স অফিস। লক গেট। তেমনি আছে।

বিকেল বেলা আবার এসে ঢুকল। এবার শ্যামবাজারের দিক থেকে।

বাগবাজার আর নেই। বিস্ময়ের কিছু নাই তবু বিস্মিত হল সে। এত পাল্টে গেছে! বাড়ী ঘর দোকান আর চিনবার উপায় নাই। ঢুকতেই মোড়ে উত্তর দিকের সে বস্তীটাই আর নেই। কি একটা বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। একটু এগিয়ে বোসেদের বাড়ীর সামনে দোকান উঠেছে। খোলার-চাল বাড়ীগুলো আর একটাও নেই। আনন্দ চাটুজ্জে লেনে ঢুকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, পত্রিকা বাড়ীর সামনে। পত্রিকা আপিসের বিরাট মেসিনটা চলবে তার উপক্রম হচ্ছে। একটু এগিয়ে শিল্পী রায়ের বাসা! কই? শিল্পী রায় নেই। কে যেন বললে—রায় এ বাড়ীতে নেই, উঠে গেছেন বালীগঞ্জে। পার হয়ে সে চলল। আঁকে-বাঁকে গলিতে গলিতে এসে দাঁড়াল সেই বাড়ীখানার সামনে। কই? সে বাড়ীখানা? জীর্ণ একতলা বাড়ী! বাড়ীখানাই নেই! এ যে ভেঙে নতুন বাড়ী হয়েছে!

তারা কোথায় গেল? কে বলবে? গলি থেকে বেরিয়ে এসে সে দাঁড়াল বাগবাজারের উপর। চারিদিকে অনেক পরিবর্তন। নিকিরি পাড়াটার চিহ্ন নাই। নতুন নতুন বাড়ী। লোক, আর লোক। কিন্তু চেনা লোক কই?—ওই একটা চায়ের দোকান—এসে দাঁড়াল দোকানটার সামনে। এখানে আগে একটা আড্ডা বসত। মায়ার ভাই ছনের আড্ডা ছিল। হ্যাঁ এখনও বসে। ওই যে সব বসে আছে। এদের দলই সেদিন তার উপর নির্যাতনে সব থেকে বেশী হাত চালিয়েছিল। চেনা মুখও রয়েছে। ওই যে। যৌবনে ভাটা পড়ে এসেছে। তবু চিনলে সে। তাকে চিনতে

পারবে না সে জানে। সে মলিন রায় মরে গেছে। এ তার শীর্ণকান্ত প্রেতাত্মা। তৃষিতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে; খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জীবনকালের প্রিয় লীলাভূমিগুলি। সামনে বসেছিল যে—সে শচী ঘোষাল। ছনের বন্ধু। তাকেই সে নমস্কার ক'রে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি দয়া ক'রে উত্তর দেন।

শচী—তারও সে উদ্ধত রূঢ়তা আর নেই। তার দিকে আপাদমস্তক ভাল ক'রে চেয়ে দেখে বেশ সম্ভ্রম করেই বললে—বলুন

—এই গলিতে বঙ্কিম ভটচাজ থাকতেন—

—বঙ্কিম ভটচাজ—ও ছনের বাবা! হ্যাঁ—হ্যাঁ। তা বঙ্কিম ভটচাজ তো মারা গেছেন।

—তাঁর ছেলে অমল ভটচাজ? থিয়েটার করত। আর তাঁর বাড়ীর—

—অমল? সে অনেকদিন উঠে গেছে। ওদের বাড়ীতে সে একটা কাণ্ড ঘটল। তারপরই সে স্ত্রী নিয়ে বাপকে ফেলে উঠে চলে গেল। থিয়েটারও আর করে না। কোথায় থাকে ঠিক বলতে পারব না। বঙ্কিম ভটচাজ তারপরও কিছুদিন বেঁচে ছিল। বুক চাপড়ে বেড়াত! কিন্তু কেন বলুন তো? কি দরকার?

—দরকার! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মলিন। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে—দরকার একটু ছিল। আমার বাড়ী বাঁকড়ো-বিষ্ণুপুরে। ওঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক কালের আত্মীয়তা। আমরা অবশ্য দেশ ছাড়া অনেকদিন, তুপুরুষ—লক্ষ্ণৌতে থাকি। বাংলাদেশে এসেছি, তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম ওঁদের।

একটু থেমে আবার বললে—হঠাৎ তার মাথায় খেলে গেল,

বললে,—আমার মা আজও বেঁচে আছেন, খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর দেখবার-শোনবার একটি লোকের প্রয়োজন। মা বললেন—বঙ্কিম ভটচাজ আত্মীয় আমাদের, ওর একটি মেয়ে আছে ওরই পোষ্য—সে যদি আসে তো দেখিস। তাই—। কিন্তু খোঁজ তো পাচ্ছি না।

—ওঃ! সেই মেয়ে! সে তো বেঁচে নেই। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে। কি কাণ্ডই যে করলে বঙ্কিম ভটচাজ! ওঃ! শেষে আবার বুক চাপড়ে চাপড়ে বেড়াত।

পায়ের তলায় পৃথিবী দুলে উঠল। আবছা অন্ধকার তখন, আলো জ্বলেছে, কিন্তু খোলে নি এখনও। মায়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে? বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সে বললে—গঙ্গায় ডুবে মরেছে! বঙ্কিম ভটচাজ—

শচী বলে গেল—বঙ্কিম ভটচাজ ওইরকমই লোক ছিল! ওঃ! মেয়েটাকে তো প্রথম বিয়ে দিয়েছিল একটা বুড়ো দোজপক্ষের পাত্রের সঙ্গে। বিয়ের দু বছর না যেতেই বিধবা হল। মেয়েটাকে কাজকর্ম শিখতে দিয়েছিল নারী-মন্দিরে। সেখানে মাটীর মূর্তির কাজ শিখাত মলিন রায়। ভদ্রলোক গুণী লোক—আমাদের এই পাড়াতেই থাকত। যেমন হাত তেমনি দিলদরিয়া মানুষ! আমার সঙ্গে আলাপ খুব ছিল না, তবে শুনেছি, যে দু চারজনের সঙ্গে আলাপ ছিল তারা বলত।

শচী বলে যাচ্ছিল বিবরণ। তার কিছু কানে যাচ্ছিল কিছু যাচ্ছিল না, মলিন শুধু ভাবছিল মায়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে তবু তার সঙ্গে গেল না? এল না? সেও শেষটা তাকে অবিশ্বাস করেছিল, ভালবাসা ঠুনকো কাচের বাসনের মত একটা ঘায়ে ভেঙে গিয়েছিল।

শচী বললে—কথায় আছে—চিলে কান নিয়ে গেল ব'লে কে

যেন চিলের পিছনে ধাওয়া করেছিল। ঠিক তাই করেছিল বঙ্কিম ভটচাজ। ওরা বিয়ে করে পাটনা গেল; ভটচাজ তাকে খুঁজতে গেল কেষ্টনগর। সেখানে কে বলেছিল—ওর বাড়ী কেষ্টনগর নয়, ও বামুনও নয়—মানে মলিন রায়। বামুন তো বামুন ওর জাতই নেই, বাপেরই ঠিক নেই। সেই নিয়ে ভটচাজ আর কোন খোঁজ না করে পাড়াময় রটনা করলে। সেই রটনা নিয়ে ছনেকে—ভটচাজের ছোট-ছেলেকে—গাল দিলে আমাদের সুরো, ছনে তাকে ছুরি মারলে—সুরো মল, ছনের ফাঁসী হল। এ একদফা। তারপর মেয়েটার অসুখ হতে পাটনা থেকে চিঠি পেয়ে তাকে অমল নিয়ে এল। কিছুদিন পর মলিন রায় এল—তাকে নিয়ে সে বিশ্রী কাণ্ড। লোকটাকে মেরে ধরে বেঁধে অপমান ক'রে সে যে কি লাঞ্ছনা করলাম আমরা—আমিও ছিলাম মশায়, ছনে আমার বন্ধু ছিল, প্রাণে বড় লেগেছিল। আঃ, এখন আপশোষ হয়—গুণী লোক, ব্রাহ্মণের ছেলে—। মেয়েটা মশাই, স্বামীর ওই অপমানে দুঃখে ভোরবেলা গঙ্গায় এসে—সে দু হাত ধরে মশাই—মা নাও আমাকে, বলে ঝপ ক'রে লাফ দিয়ে পড়ল। মস্ত চিঠি লিখে গিয়েছিল। তাতে শ্বশুরে নাম লিখে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—লিখেছিল, আমি জানি আমার শ্বশুরের নাম ঈশ্বর রায়, তাঁর বাপের নাম ভগবান রায়—গোত্র বন্দ্যঘাটী। তাঁরা আমার স্বামীর মতই সুন্দর ছিলেন। আমার স্বামী ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ। তাকে যে অপমান আমার বাবা করলেন—তারপর তাঁর কাছে যাবার আমার মুখ নাই। আমার জন্য এত লাঞ্ছনা হল তাঁর—এ যখন আমার মনে পড়বে তখন কি ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকাব। তাই আমি মরব। মানুষ কম দুঃখে মরে না। বড় দুঃখ আমার। পৃথিবীতে

ধরছে না দুঃখ। কিন্তু আমার স্বামীর যেন আর লাঞ্ছনা কেউ না করে। তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি গুণী, দেবতার মত কান্তি। দেবতার মত অহঙ্কার। তিনি কি অব্রাহ্মণ হতে পারেন!

মলিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে। চঞ্চল হল না, পা টলল না, চোখে জল কোনদিনই তার নেই, আজও এল না। এর মধ্যে বেশ একটি ভিড় জমেছিল—চারিদিকে। মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মলিন। রাস্তার আলোয় চুলগুলি তার ধব ধব করছিল, সকলের উঁচুতে উঠেছিল তার মাথা। কেউ তার কোন চাঞ্চল্য দেখতে পেলে না। শচীর কথা শেষ হতেই সে একটি নমস্কার ক'রে সেখান থেকে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলে গেল মোড়ের দিকে।

মায়া মরেছে। বড় আঘাত সে পেয়েছিল। কিন্তু সে মরল কেন? চলে এল না কেন? লড়াই করলে না কেন? জাত! জাত! জাত! ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! মনে পড়ল বিয়ের সময় পুরোহিত যখন বাপ-ঠাকুরদাদার নাম বলতে বলেছিল তখন—ভেবে নিয়ে বলেছিল—ভগবান রায়ের পৌত্র—ঈশ্বর রায়ের পুত্র; গোত্র বলেছিল—বন্দ্যঘাটী। নবদ্বীপের বুড়ো রতন রায় কেষ্টনগরের রাজাদের ঘরে অন্নপূর্ণার আবির্ভাবের গল্প বলত। কবিতা আউড়ে বলত। ঈশ্বরী পাটনীকে ছলনা করে যে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই কবিতা।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
শুনহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥

তাতেই শুনেছিল—'পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য-বংশজাত।' রতন বুড়ো বলত বন্দ্য-বংশ আসল মানে হল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুজো

পায় এমন কুল। পাটনী বুঝলে 'বন্দ্যঘাটী' মানে বাঁড়ুজ্জে। সেও সেদিন তেমন করেই বলেছিল—বাবা তার ঈশ্বর। ঈশ্বরের পিতা কে তা সে জানেনা, বলেছিল—ভগবান। গোত্র বলেছিল—বন্দ্যঘাটী।

মায়া তাই ঘোষণা করে মরল।

হঠাৎ সে চমকে দাঁড়াল।

তবে কি সেদিন রাত্রে যাকে দেখেছিল—সে মায়ার প্রেতাত্মা? সে কি তাকে সঙ্গে নেবার জন্য সেই রাত্রে ছায়া-মূর্তি হয়ে—? না—। না। তা কেমন ক'রে হবে? মায়া যে জলে ঝাঁপ দিয়েছে পরের দিন সকালে। সমস্ত অন্তরাত্মা তার চীৎকার ক'রে উঠল—মায়া—মায়া—মায়া!

হায় মায়া! এ তুমি কি করেছ মায়া? ছি—ছি—ছি! এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পার নি? প্রশ্ন করেছিলে, কি ক'রে মুখ দেখাবে? মুখ মানুষ দেখায়, মায়া, নিজের রূপের জোরে। বাবার অপরাধের কালী তুমি মুখে মেখে মুখ কালো করে গঙ্গায় ঝাঁপ খেলে কেন?

সে আবার ফিরল। আবার ফিরল। ধরল গালিফ স্ট্রীটের পথ।

যাবে সে এখন লকগেটের ব্রিজের কাছে। তারপর যাবে অন্নপূর্ণার ঘাটে। সে মায়ার প্রেতাত্মা নয়। সে এক বিচিত্র ছায়া-মায়া। সে যদি আজ একবার আসে!

সারা রাত্রি ব্যর্থ জাগরণের পর—সে ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরল হোটেলে। জিনিষ পত্র ছাড়িয়ে এনে সারা দিন ঘুমুলে। আবার যাবে রাত্রে। সে দিনও ফিরে এল। কোথাও কিছু না। সারাটা রাত্রি খাঁ খাঁ করেছে পাথরের পিচের নির্জীব রাস্তা চিৎপুর; আলো জ্বলছে স্থির হয়ে; পোর্ট কমিশনারের রেললাইনে মধ্যে মধ্যে

গাড়ী চলেছে, বাকী সময়টা রাত্রির পৃথিবীর নিথরতা থম থম করেছে। কোন দূর মাথায়-দাঁড়ানো ইঞ্জিনটায় ষ্টীমের একটা একটানা সোঁ সোঁ শব্দ উঠেছে। আর গঙ্গার কলকল শব্দ উঠেছে।

সেদিন সকালে ফিরল সে বিচিত্র মন নিয়ে।

কায়াময়ী পৃথিবী ছায়া ছায়াই। সে অলীক! সে মিথ্যা। মিথ্যার পিছনে সে আর ঘুরবে না। এই ভাবতে ভাবতেই ফিরছিল। হঠাৎ তার মন চীৎকার করে উঠল। না—মিথ্যা নয়। ও ছায়া ছায়া নয়, ও মায়াও নয়, সে তার মুখ দেখে নি। সে তার অন্তরের ভালোবাসা। অন্তরের তৃষ্ণা মায়া—মায়া—মায়া! মায়াকে জড়িয়েই ধরে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল। সে দিন গঙ্গার জলে জীবনের সব ভালোবাসা সব তৃষ্ণা—ডুবে গেছে।

তবুও বাঁচতে হবে। মায়া নেই! তার জীবনের তৃষ্ণা—ভালবাসা সত্যই আর নেই। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে, কই—আর কাউকে তো ভালবাসতে পারলে না! অন্নপূর্ণা ঘাটের সেই এক যুগ আগের সকাল থেকে আজকের সকাল পর্যন্ত এতকালের শুষ্ক অধীর জীবনের স্মৃতি এক মুহূর্তে যেন ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। চলো মুসাফের। ফিরে চলো। এ পথে আর হেঁটো না। এই ঘাটের পথে। ছায়া-মায়া তার মনের ভ্রমই হোক আর জীবনের তৃষ্ণাই হোক—সে সেই রাত্রে গঙ্গার জলে ডুবে ভেসে গেছে। মায়া মরেছে। বঙ্কিম ভটচাজের সব ধুয়ে মুছে গেছে। থাকবার মধ্যে অমল—আর তার বউ—কোথায় গেছে কেউ জানে না। কি হবে ও পথে হেঁটে? সত্যিই সে ছেড়ে দিলে ও পথে হাঁটা।

মন দিলে সে নতুন আয়োজনে।

বাঁচতে হবে। ভাঙা দেহ, তৃষ্ণা জর্জর ক্লান্ত মন নিয়েই বাঁচতে হবে।

মায়ার মত জলে ঝাঁপ দিতে সে পারবে না।

বাঁচবে—আবার সে হৈ হৈ ক'রে বাঁচবে। শুধু কাজ নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বাঁচবে। মস্ত বড় দোকান করবে। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে। ভালো শো-কেসে-কেসে সাজিয়ে দেবে নতুন নতুন পুতুল। নতুন পুতুলের পত্তন করবে হাওড়া ব্রিজের পুতুল তৈরী ক'রে। মস্ত বড় একটা হাওড়া ব্রিজ তৈরী ক'রে সামনে রেখে দেবে। গান্ধী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের বড় বড় মূর্তি ক'রে সাজিয়ে দেবে।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। চারিদিকে কাজের সমারোহ পড়ে গেছে। নিত্য নতুন কত কিছু খবর, কত কি হচ্ছে। কলকাতায় অগণিত মানুষ। কি কলরব! সেকালের যাঁরা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা এখন বড় বড় কর্তা। তার কাছে তাঁদের পরিচয় পত্র আছে। সে একেবারে অজানা লোক হবে না।

হোটেলের মালিককে বলে ছাদে খানিকটা স্থান সংগ্রহ করে আরম্ভ করে দিলে কাজ। হাওড়া ব্রিজ! কাজ নিয়ে মেতে গেল। সারাদিনের মধ্যে শুধু সন্ধ্যায় একবার বের হ'ত চৌরঙ্গীর দিকে। আলো—আলো—আলো। মানুষ মানুষ মানুষ। আলোতে রঙ, মানুষের পোষাকে রঙ, মেয়েদের গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ ; কি রঙের তৃষ্ণা! দেওয়ালে দেওয়ালে, বড় বড় বাড়ীর গায়ে আঁটা বিজ্ঞাপনের বোর্ডে—রঙীন ছবির বিজ্ঞাপন। রূপ হারিয়ে গেছে রঙের উগ্রতার মধ্যে। মধু যেন মদ হয়েছে। দৃষ্টি কটাক্ষ হয়েছে। হাসি লাস্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তৃষ্ণা—খোঁয়াড়ি হয়েছে

বারে হোটেলে নিওন লাইটের বিজ্ঞাপন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত—তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসত। ভাল লাগে না। ও আর ভাল লাগে না। সহ্যই যেন হয় না। দুনিয়া পাল্টালো কি সে পাল্টালো হিসেব করে ঠিক মেলাতে পারে না। কিন্তু সে যেন বেখাপ্পা হয়ে গেছে। মিলতে পারছে না—মিশতে পারছে না।

মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। ঠিক এমনি করেই সে মিলতে পারত না। দেবীগ্রামের পথে পথে—মাঠে মাঠে একা একা বেড়াত। দেবীগ্রাম থেকে এরই তাড়নাতে সে বেরিয়ে এসে দুনিয়ার বুকে দুর্দান্ত পরিশ্রমে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছিল। আবার হঠাৎ সে উল্কার মত অকস্মাৎ কক্ষচ্যুত হয়ে গেল। আজ আর দুনিয়ার দোষ নাই। আর দোষ হোক, দায় হোক যা হোক—সব তার, সব তার। ভাল লাগে না। কোন কিছু না।

ফিরে এসে আবার সে গড়তে বসে—হাওড়া ব্রিজ। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, উঁচুতে চার ফুট। বাখারী ছাতার শিক বেঁধে ফ্রেম তৈরী করে তার উপর প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে গড়ে তোলে দিনের পর দিন।

শেষ হল সে দিন। বাস।

এইবার ঘর একখানা চাই। ঘর চাই, পুতুল গড়ার কারখানার জায়গা চাই। লোক চাই। ফড়িংয়ের মত লোক চাই।

মিশন রোয়ের কাছে—বড় এ্যাভেন্যুটার উপর ঘর একখানা মিলল। ভাড়া অনেক। একশো টাকা। শুধু দোকান ছাড়া আর কিছু হবে না। তাই সে নিলে ভাড়া। একশো টাকা বায়না দিয়ে এল। কাল এসে তিন মাসের ভাড়া দিয়ে পাকা ক'রে যাবে।

হোটেলে এসে সে শুয়ে পড়ল। ওঃ--কি ক্লান্তি, কি অবসন্নতা তার দেহে মনে! সে আর পারছে না। আর পারছে না।

বয় এসে তাকে ডাকল—খানার সময় হয়েছে।

—নেহি। নেহি খায়েগা।

ভাল লাগছে না। কি হবে খেয়ে?

—এখানে এনে রেখে দেব—সাহেব?

—না। দরকার নেই।

কি খাবে? হোটেলের এই খাদ্যগুলো কিছু ভাল লাগছে না ক'দিন থেকে। বয় চলে গেল। ক্রমে নিচের তলায় হোটেলের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে এল। ঘরে ঘরে বাসিন্দারা শুয়ে পড়ল। বাইরে রাস্তায় আর গাড়ীর শব্দ নাই, হর্ণ বাজে না। উঠে গিয়ে দাঁড়াল সে জানালায়। রাস্তায়ও লোক নেই। খাঁ-খাঁ করছে। থমথম করছে। দরজা খুলে সে বাইরে এল—ছাদে গিয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে রইল তার হাতে তৈরী ব্রিজটার সামনে। হঠাৎ মনে হল তার—কি হবে? এইটেকে সামনে সাজিয়ে বড় দোকান ক'রে কি হবে?

ইচ্ছে হল—ওটাকে ভেঙে ফেলে দেয়। নাঃ, থাক। হোটেল-ওয়ালাকেই ওটা দিয়ে চলে যাবে। ও একদিন বলেছে—দিন না ওটা আমাকে, আমি নিচের হলে সাজিয়ে রেখে দেব।

তাই দিক হোটেলওয়ালা। ওর শ্রীবৃদ্ধি হোক দিন দিন। সমারোহের ওর প্রয়োজন আছে। মলিনের নাই। বড় কাজ, সমারোহ, কলরব—ভিড় এ সব তার চাই না। ভাল লাগছে না। অনেক তো চেষ্টা করলে—লাগল না ভাল।

বাঁচবার জন্য নিতান্ত ছোট—অত্যন্ত সামান্য আয়োজন।

রাত্রে শুয়ে শুয়েই সে ঠিক করে ফেললে। সব কল্পনার ওলোট পালোট হয়ে গেল। নতুন কল্পনা বড় ভাল লাগল তার। সামান্য বাঁচবার আয়োজন। শাক আর অন্ন। আলু ভাতে ভাত। একটু নূন। শুকনো-পরিচ্ছন্ন সামান্য একখানি ঘর—মাথা গুঁজবার আশ্রয়। অল্প খানিকটা কাজ করবার জায়গা। ওই গঙ্গার ধারে কোথাও। ছোট্ট এক টুক্‌রো দোকান—ওই কাছাকাছি কোথাও। যে কটা ছাঁচ তার আছে—ওই ছাঁচেই সে পুতুল তৈরী করবে। আর নতুন নয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, তার সঙ্গে ওই বোষ্টমী পুতুল, কনে পুতুল, চুড়িওয়ালী, ছায়া-মায়া। সারি সারি সাজিয়ে রাখবে। বেচবে। আর দেখবে। তাও দেখতে ক্লান্তি এলে দৃষ্টি তুলে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকবে।—দোকান থেকে দেখা না-যায় দোকান থেকে উঠে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আবার সে হঠাৎ উঠে চলে গেল ছাদে। একটা কাঠ নিয়ে আঘাত করলে ব্রিজ মডেলটার উপর। ভেঙে গেল ওটা।

ওটা থাকলে পাছে আবার তার মত পাল্টায় তাই সে ওটা ভেঙে দিল।

॥ ছয় ॥

যা চেয়েছিল তা সে পেলে। গঙ্গার ধারে একখানি পরিচ্ছন্ন অথচ অনাড়ম্বর ঘর। পাকা একখানি ঘর, খানিকটা উঠান, একেবারে গঙ্গার ধারে। বাড়ীটার খানিকটা গঙ্গায় ভেঙে নিয়েছে। তাই ভয়ে কেউ ভাড়া নেয় নি। কলকাতার ভিতরে নয়, বরানগরে। দোকানও একটা সে পেলে আহিরীটোলার কাছাকাছি চিৎপুরের উপর। দোকান তার একবেলা। সকাল থেকে একটা পর্যন্ত। বিকেল বেলা বাড়ীতে বসে পুতুল গড়া।

তাতেও তার বেশ চলল। মাসখানেকের হিসেবে লোকসান দাঁড়াল না তার। কিন্তু এও যেন ভাল লাগছে না তার। না। ভাল লাগছে না। মন ভরছে না। কি ভাল লাগবে তাও সে বুঝতে পারছে না। আবার বড় কাজ ? বড় দোকান ?

না।

আবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বে ?

এই কি সে চেয়েছিল ? নিস্তব্ধতাই তো শান্তি নয়। পরিশ্রম কম হওয়াই তো সুখ নয়! এ যে সে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে পথহারা জীবন-নদীর ধারার মত। দল বেঁধে মানুষ চলেছে—একটা নদীর বুকের কোটী তরঙ্গের মত—কল কল্লোল তুলে নরম মাটীর দেশে দেশে পথ কেটে কেটে সহস্র ধারায় লক্ষ ধারায় কোটী কোটী ধারায়—জোয়ারে ভাঁটায়—সমুদ্রের দিকে—আর সে এ কোন পথে চলেছে—এ যে শুধু বালি—শুধু বালি—যত দূর চোখ যায় শুধু বালি।

মলিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তাকে যেন শুষে নিচ্ছে।

বৈশাখের সূর্য প্রচণ্ড দহনে জ্বলছে, আকাশ পুড়ছে, মাটী শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে, গঙ্গার জল বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে। খাঁ খাঁ করে দুপুর বেলাটা। দোকানে বসে সেই দিকে তাকিয়ে মলিন অনুভব করে এমনই ভাবে সেও শুকিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের তৃষ্ণা নাই, সে শুধুই জ্বলে, সে জ্বলার মধ্যে জ্বালা নাই তার, আনন্দ আছে, জ্যোতি আছে। সে শুকাচ্ছে মাটির মত—নদীর মত। গঙ্গাকে সূর্য শোষণ করে কিন্তু সমুদ্র জোয়ারে ভরে দেয়। কৈলাস পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ গলে জল নেমে আসে। তার আদিতে পঙ্কজিনী অন্তে সব শূন্য। কিছু নাই কিছু নাই।

বৈশাখী দ্বিপ্রহর—শহরের ইট কাঠ পাথর উনোনের উপরে চাপানো চাটুর মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তবুও আজ এখন পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটে লোক চলাচল ক্ষান্ত হয় নি। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। সকালের দিকে বেশ ভিড় গেছে। আজ তার দোকানে বিক্রী গেছে খুব ভাল। সেই কারণেই এখনও বসে আছে সে। নইলে এতক্ষণ দোকান বন্ধ ক'রে চলে যেত বরানগর। এত রৌদ্রে আর যাবে না। বেলা প্রায় দেড়টা। পথ ঘাট ক্রমে জন বিরল হয়ে আসছে। একটা সময় আসবে, কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত, যখন একটিও লোক থাকবে না পথে। চিৎপুরের পূর্ব ফুটপাথে তার দোকান। পশ্চিম দিকে—সামনেই একটা গলিপথ চলে গেছে—গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। বরাবর দেখা যায়। শূন্য মনে তন্দ্রাতুর দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে সে বসেছিল ; মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা নেমে আসছিল তন্দ্রার গাঢ়তায়। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল

কোন চলন্ত ট্রামের শব্দে, ক্বচিৎ কখনও কোন মোটরের হর্ণে। তন্দ্রা ভাঙলেই জাগছিল চিন্তা।

চিন্তা তার একটি। ভাল লাগছে না। বেরিয়ে পড়তে হবে। পুতুলগুলো যা মজুত আছে—সেগুলো পাইকিরি দরে সস্তায় বিক্রী ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। আর না। শেষ করো এ পালা। চলো মুসাফের! ব'সে ব'সে জ্বলা যায় না। দহনের মধ্যে ছুটোছুটিই স্বাভাবিক। ওতে আগুন নেভে না—কিন্তু জ্বলার পালাটা শীঘ্র শেষ হয়।

চলো—মুসা—।

মনে মনে কথাটা শেষ হল না তার, অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ময়—বজ্রদীপ্তির মত ঝলসে উঠল তার দৃষ্টির সম্মুখে। তার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড ধ্বক ধ্বক ক'রে চলতে সুরু করল। থর থর ক'রে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ। গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

এ কি? এ কি? ও—কে? ও—কে? ও—কে রে? কে ওই মেয়েটি? কে? প্রশ্নটা তার সর্বাঙ্গ চঞ্চল করে তুলেছে।

সামনের গলিপথটায় ও প্রান্ত থেকে আসছে দুটি মেয়ে। সামনেরটি একটি কিশোরী; ঘন কালো চুলে ঘেরা মুখখানি যেন জ্বলতে জ্বলতে আসছে। সাদা মিলের লালপাড় শাড়ী পরনে, দীর্ঘাঙ্গী, হাতে একটি জলভর্তি ঢাকা দেওয়া পিতলের বালতী, সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে মহিমান্বিতার মত চলে আসছে। পিছনে আর একটি মেয়ে। মনে হচ্ছে প্রৌঢ়া।

চশমা! চশমা! চশমাটা কোথায় গেল!

এ কি রূপ! এ কি মহিমা! কে? কে?—এ কে? আশ্চর্য—মায়ার সঙ্গে এত অমিল—আবার এত মিল! মায়া ছিল মাথায় একটু খাটো, শীর্ণাঙ্গী—এ মেয়েটি সবল স্বাস্থ্য, দীর্ঘাঙ্গী। মায়া ছিল শ্যামবর্ণা—এ মেয়ে গৌরী,—তবু এরই মধ্যে মায়ার ছাপ, তার ছায়া মিশে রয়েছে—রঙের সঙ্গে ছটার মত, গন্ধের সঙ্গে স্বাদের মত। ফুলের সঙ্গে বোঁটায় সবুজ বেষ্টনীর মত। এ কে?

মেয়েটি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে—পিছনের মহিলাটির সঙ্গে। চকিতে মনে পড়ে গেল—ছায়া-মায়ার কথা। এমনি করে সে ফিরে ফিরে তার দিকে বার বার তাকিয়েছিল। তফাৎ তার মাথায় ছিল ঘোমটা—মুখ ছিল ঢাকা। এ কি সেই? সে কি এতকাল পরে কায়া ধ'রে গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসছে—অনবগুণ্ঠিতা হয়ে, প্রত্যক্ষ হয়ে?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ কে?

সে উঠে বসতে চাইলে। কিন্তু পারলে না। যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

ষোল সতের বছরের কিশোরী। আশ্চর্য মিল।

বুকের ভিতর তার ঝড় বইছে। প্রাণপণ শক্তিতে সমস্ত স্তম্ভিত অবসন্নতা কাটিয়ে সে উঠে বসল। মেয়েটি গলির মুখে ও পারের ফুটপাথে এসে পৌঁছেছে। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মলিনের বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে। সে উঠে দাঁড়াল। পৃথিবীতে আবার স্বাদ জাগছে। ভাল লাগছে। বৈশাখের ঝলসানো দুপুর ঝলমল করছে।

মেয়েটিও ওপারের ফুটপাথে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দোকানের দিকেই চেয়ে রয়েছে। প্রৌঢ়া মহিলাটিকে কি

বলছে। আঙুল দেখাচ্ছে। তার দোকানে সাজানো পুতুলগুলির দিকে। কিশোরী মন পুতুল দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

প্রৌঢ়া মহিলার হাতে শুধু দুগাছি শাখা, মেয়েটির হাতে কাঁচের চুড়ি। পুরোনো দিনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে পারছে এর পরই দৃষ্টি ফিরিয়ে সকলের অগোচরে একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়ার সঙ্গে সে চলে যাবে। কিনবার সামর্থ্য নাই।

মলিন ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি বলে ডাকবে? কি করে বলবে, তোমার যা খুসী নিয়ে যাও, যত খুসী নিয়ে যাও।

হঠাৎ মনে হয়ে গেল। —মা। মা বলে ডাকতে। জীবনে পঙ্কজিনীকে মা বলে এসেছিল—তারপর এ পর্যন্ত মা বলে সে আর কাউকে ডাকেনি। সে পরম আগ্রহে ডাকলে—আসুন মা, মা লক্ষ্মী—আসুন; পুতুল নিন। অনেক ভালো ভালো পুতুল আছে মা।

তাড়াতাড়ি সে সব রকমের পুতুল এনে বাইরে নামিয়ে দিল। বাঘে মহিষ ধরেছে, সাপে হরিণ জড়িয়ে ধরেছে। তার প্যাকিং-বাক্সে মজুত করা এ পুতুলগুলি এই পর্ব উপলক্ষ্যে আজই এনেছে। কিছু বিক্রীও হয়েছে। সমাদরের সঙ্গেই কেটেছে। এগুলি চোখে-ধরা পুতুল। এর মধ্যে খেলা আছে। পাখী নিয়ে খেলার মত; কুকুর বেড়াল পোষার শখের মত।

—অনেক পুতুল আছে মা। ভাল ভাল পুতুল আছে।

মেয়েটির দৃষ্টি কিন্তু স্থির হয়ে রয়েছে মেয়ে পুতুলগুলির উপর। সে সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে যেন মন্ত্র মুগ্ধের মত রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল—দোকানের ধারে। তারপর ভিতরে উঠে এল।

দোকানের ভিতরে চারদিক সে তাকিয়ে দেখলে। মলিনের বুকের মধ্যে ঘুমন্ত হৃদ্‌পিণ্ড যেন ঘুম ভেঙে জেগেছে আজ। দৃষ্টি তার বিস্ময় বিস্ফারিত, মেয়েটির মুখের উপর নিবদ্ধ। মেয়েটির মুখ ঘুরছে—তার দৃষ্টিও ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে।

—আশ্চর্য! দেখেছ মা। মেয়েটি বললে প্রৌঢ়াকে।

—নিন মা—যা পছন্দ হয় নিন। বলতে ইচ্ছা হল—দামের জন্য তুমি ভেবো না। তোমাকে দিতে পারলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহস হল না। এ মেয়ের কাছে যেতে তার যেন ভয় করছে।

—না। এ সবই আমার আছে।

—আছে?

—হ্যাঁ। এ সব পুতুল—এইগুলি—এই বোষ্টমী, কনে পুতুল, চুড়িওয়ালী আমার আছে। এটা নেই।

মোহিনী মায়া—ওই ছায়া-মায়া পুতুলটা সে দেখিয়ে দিলে। তারপর বললে—কিন্তু এ পুতুল আপনি কোথায় পেলেন? এ তো আর কোথাও দেখি নি? যে দেখে সেই বলে।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে অভিযোগ ফুটে উঠল।—এ সব পুতুল তো আমাদের!

প্রৌঢ়া মহিলাটি মেয়ের এই অলীক রূঢ় অভিযোগের জন্য লজ্জিত হলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—একজন একটা গড়লে—তাই দেখে পাঁচজনে নকল করে। উনি দেখে গড়ে থাকবেন।

মেয়েটি বললে—এ সব পুতুল আমার বাবাই প্রথম গড়তেন। আজও পর্যন্ত কলকাতায় আর কোথাও দেখি নি। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মহিলাটি বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। ওর বাবা একজন খুব ভাল কারিগর—

—না, কারিগর কি? শিল্পী। শিল্পী ছিলেন তিনি। এ সব পুতুল তাঁর নিজের কল্পনা। নিজে তৈরী করেছিলেন। ওই ব্যাঙ, ওই প্রজাপতি, ওই বষ্টুমি, কনে, চুড়িওয়ালী—এ সবের ছাঁচগুলো পর্যন্ত আমার কাছে আছে।

—তোমার—আপনার বাবা?

—আমার বাবা মস্ত শিল্পী ছিলেন—মলিন রায়। এম. রায়।

মলিনের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। সবল প্রশান্ত তার বুক, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে তাণ্ডব জেগেছে যেন। প্রচণ্ড একটা চীৎকার তার বুক ফাটিয়ে বের হতে চাচ্ছে। থর থর করে কাঁপছে। হাত পা ঘামছে। বিস্ফারিত দৃষ্টি আরও বিস্ফারিত হতে চাচ্ছে। ওর মুখখানা দু হাতে ধরে মুখের কাছে এনে পুঙ্ক পুঙ্ক মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।—কে তোমার বাবা? কে তুমি? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মনে পড়ছে—তাই তো, মায়ার মৃত্যু সংবাদ শুনে চলে আসবার সময় তো মায়ার মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে নি সে। শচী বলেছিল—মায়া মরল। সংসারটা তছনছ হয়ে গেল। অমল তার বউকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। বঙ্কিম ভটচাজ বুক চাপড়ে বেড়াত। ধুয়ে মুছে গেল সব। তারপর সেও মরে গেল। সে ভেবেছিল—ওই ধুয়ে মুছে যাওয়ার মধ্যেই মেয়েটিও ভেসে গেছে। মায়ার মৃত্যু হয়েছে—মায়া জলে ঝাঁপ খেয়েছে—তার অপমানের দুঃখে ক্ষোভে—এর পর আর কিছু জানবার ইচ্ছা হয় নি; মনে থাকে নি; মায়ার পর মায়ার মেয়ের দিকে ফিরে তাকাবার প্রবৃত্তিও বোধ হয় তার ছিল

না। ছিল না। স্বীকার করছে সে। অথচ, অথচ—একেই তো সে এতদিন খুঁজেছে। এই তো! এই তো সেই! যাকে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে খুঁজে এল। এই তো সেই। গঙ্গার জল থেকে লক্ষ্মী প্রতিমার মত উঠে এসে আজ দাঁড়াল।

মেয়েটি ঘুরে ঘুরে প্রতিটি পুতুল দেখছিল আর কথা বলছিল—বললে—এ হাত আর কারও হয় না। আমি দেখলেই চিনতে পারি। আমি নিজেও গড়তে পারি—আঁকতে পারি। আমার মাও গড়তে পারতেন। বাবা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। আমিও শিখব। ইস্কুল ফাইন্যাল দিয়েই আমি আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হব।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করলে মেয়েটি। তারপর আবার হঠাৎ প্রশ্ন করলে—কিন্তু আপনি এ সব কি ক'রে পেলেন বললেন না তো? এইটি নতুন। সে মোহিনী মায়া পুতুলটি তুলে নিলে।

নতুনই বটে। মায়ার মৃত্যুর পর ওটি তৈরী করেছিল মলিন।

মহিলাটি বললেন—কি বলবেন মলিনা? উনিও গড়েছেন দেখে দেখে। চল, বাড়ী চল। কিছু নেব না—অথচ কেন মিছি মিছি ওঁকে বিরক্ত করছিস?

—না-না-না। বলে উঠল মলিন। কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু কোনক্রমে সে বললে—না-না-না। সে কি কথা? নাও মা পুতুলটা। তোমার সেটটা পূরো হবে।

—না-না। পুতুল নিতে আমি চাই নি। সে জন্যে আমি দেখছি না। পুতুল আমি চাই না। নামিয়ে দিলে সে পুতুলটি।

—আমি দিচ্ছি তোমাকে।

—আপনি দিলেই বা আমি নেব কেন? বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—কেন আমি আপনার দান নেব? আমার বাবাকে লোকে অব্রাহ্মণ বলে সন্দেহ করেছিল। আমার মা—বাবা যে ব্রাহ্মণ তার প্রমাণ দিয়ে গঙ্গার জলে ঝাঁপ খেয়ে মরেছেন। আপনার দান আমি নিতে পারি না।—এ কি? কি হ'ল আপনার?

মলিন আর পারে নি। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে। পঞ্চাশ বৎসর পর আজ ভূমিকম্পে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার মত চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েছে সে।

অকস্মাৎ কেঁদে ফেলেছে মলিন। কেঁদে ফেলেছে নয়—কান্না যেন ভূমিকম্পে ফাটা মাটির বুক থেকে বের হওয়া জলের ধারার মত চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। অনর্গল চোখের জল বেরিয়ে আসছে। দুরন্ত আবেগ মাথা কুটছে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।

—উঃ! উঃ!

—কি হল আপনার? কি হল?

—চোখে কি পড়ল। ওঃ অসহ্য মনে হচ্ছে।

—জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন।—নিন, আমার বালতিতে জল আছে। নিন, ধুয়ে ফেলুন।

দুই হাত পাতলে সে। মেয়েটি বালতি থেকে জল ঢেলে দিলে। সেই জল দিয়ে সে চোখ ধুতে লাগল। ধুয়ে যাক চোখের যত কালী, ধুয়ে যাক। এবং প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করলে সে। সে মলিন রায়। সে শক্তি তার আছে।

মেয়েটি বললে—তা হলে আমরা যাই। একটা কথার উত্তর

কিন্তু দিলেন না আপনি। কেমন করে এসব পুতুল আপনি পেলেন? আমার বাবা,—তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন—আমি জানি। না হলে জিজ্ঞাসা করতাম আপনি, আপনিই কি তিনি? তিনি আরও সুন্দর। শুনেছি দেবতার মত দেখতে। আপনিও সুন্দর। কিন্তু দেবতার মত নয়। রাগ করলেন না তো!

মলিন হাসলে। তারপর বললে—তুমি ধরেছ ঠিক মা। এসব পুতুল তোমার বাবার তৈরী ছাঁচেরই পুতুল বটে। এখান থেকে তিনি যখন লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরে গেলেন পাটনায়—তখনই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কিছু দিন আমাদের ওখানে ছিলেন, আমি তাঁর কাছেই কাজ শিখেছিলাম—তিনি যাবার সময় ছাঁচগুলি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন!

এবার মেয়েটি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল—আর কি তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা হয় নি?—তিনি বেঁচে আছেন কি নাই —জানেন? আমার বড় দুঃখ জীবনে কখনও তাঁকে দেখলাম না। কখনও তাঁর কোল পেলাম না।

আবার, আবার বুঝি সব কিছুর বাঁধ ভেঙে যাবে। চোখ দিয়ে জল পড়ছেই—এইবার হয়তো চীৎকার ক'রে উঠবে সে—ওরে—। কিন্তু না, নিজেকে সম্বরণ সে করবেই।

মেয়েটি বলেই চলেছিল—আপনি তাঁর বন্ধু—তাই আপনাকে বলছি। এসব কথা তো বলি না—বলবার নয় কাউকে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতাম—আমার একটা খোঁজ করলেন না কখনও? এই মামীমা আর মামা যদি না-থাকতেন—

মেয়েটি হঠাৎ থেমে প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। মলিন বুঝলে—এই মেয়েটিই অমলের স্ত্রী। তিনি তাকে চোখের ইসারায় কিছু বলছেন। তিরস্কারের ইঙ্গিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এসব কথা বলতে বারণ করছেন। বলছেন বোধ হয়—না-না, এসব কার কাছে কি বলছ? চুপ কর—বলতে নেই।

সত্যিই মেয়েটি ওসব কথায় ছেদ টেনে একটু ম্লান হেসে শুধু বললে—আমরা যাই। কিছু মনে করবেন না। বাবার বন্ধু বললেন আপনি, তাঁর হাতের কাজগুলি রয়েছে—সব দেখে শুনে অনেক কথা বললাম।

মলিন কঠিনভাবে নিজেকে সংযত করে রাখলে। চুপ ক'রে রইল সে। বুকের ভিতরে কান্নার সহস্র তরঙ্গ উঠেছে। কিন্তু সে কাঁদবে না। মেয়ের সামনে কাঁদবে না। পরিচয় সে দেবে না। ভয় হচ্ছে তার। আতঙ্ক হচ্ছে। মুখে তার অসংখ্য রেখা পড়েছে, রেখায় রেখায় তার বিক্ষুব্ধ অসংযত জীবনের কথা লেখা রয়েছে শিলা-লিপির মত। ওর বাপ শিল্পী মলিন রায় ব্রাহ্মণ। তার গৌরবে তার অনেক গৌরব। বৈশাখ মাসে—অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সে কারও ক্ষুদ্রতম দান গ্রহণ করে না। সে কি তাকে—তার বাপ বলে মানতে পারে?

দু'জনেই তারা নামল দোকান থেকে। বললে—চললাম।

চলে গেল তারা।

মলিন হঠাৎ উঠল—মোহিনীমায়া পুতুলটা হাতে ক'রে ছুটল। —মা! মা! কি নাম তোমার? মা।

অল্প দূরেই গিয়েছেন তাঁরা। থমকে দাঁড়াল।—ডাকছেন? আমার নাম মলিনা। মলিন রায়ের মেয়ে।

—এইটি অন্তত তুমি নিয়ে যাও মা। আমি তোমার বাবার বন্ধু। এ তোমার বাবার হাতের গড়া। না-নিয়ে গেলে দুঃখ পাব।

—নোব ?

—নে বাপু, এত ক'রে বলছেন। বাপের বন্ধু, নিলে তোর বাপের নাম ছোট হবে না। নে।

—দিন।

—আরও কিছু নাও মা। সব পুতুল একটা একটা করে—

—কি করব নিয়ে ? রাখব কোথায় ? মামার কষ্টের সংসার—মোটে একখানা ঘর। ঠাকুর-দেবতা হলেও না-হয় লক্ষ্মীর আটনে রাখতাম।

—তাই তো মা ! ঠাকুর দেবতা তো আমার নেই !

—গড়েন না কেন ? একটি সুন্দর লক্ষ্মী মূর্তির আমার ভারী সাধ ! কিন্তু মনের মত কোথাও পাই না।

—আমি গড়ে দেব মা, তুমি নেবে ?

—গড়ে দেবেন ? কিন্তু দাম নিতে হবে। লক্ষ্মী প্রতিমা অন্যের কাছে ভিক্ষে নিয়ে ঘরে তুললে সে তো কোন ফলই দেবে না। ভিক্ষেয় তো লক্ষ্মী সদয় হন না। আর এটা নিলাম আপনার কাছে, আমার বাবার হাতের তৈরী ছাঁচে গড়া। আর তো নিতে পারব না।

—নেব মা। দাম নেব। যা দেবে তুমি তাই নেব।

—বেশ তা হ'লে গড়ে দেবেন।

—দেব। এক সপ্তাহের মধ্যে গড়ে দেব। কিন্তু। কিন্তু কি রকম লক্ষ্মী নেবে মা ?

—লক্ষ্মী যেমন হয়—

—আমি ছেলেবেলায় দেখেছি মা—আমাদের দেশে মহালক্ষ্মীর পূজা। কমলা। কমলেকামিনী। শতদল পদ্মের উপর মহালক্ষ্মী কমলা বসে আছেন— দুদিকে দুই সাদা হাতী শুঁড়ে কলসী ধ'রে ক্ষীর সমুদ্রের জল তুলে স্নান করাচ্ছে।

মলিনার চোখ শুনতে শুনতে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল।

মলিন বলে গেল—ছেলেবেলায় অপাংক্তেয়ের মত সেই গাছের উপর চড়ে দেখা সেই মহালক্ষ্মী প্রতিমার বর্ণনা।

—দেবেন। তাই দেবেন। বড় ভাল মূর্তি হবে। সাতদিন পর আমি—

—না-না-না। আমি যাব। মূর্তি নিয়ে আমি যাব।

বৈশাখী সূর্য তখন পশ্চিমে চলেছে। রৌদ্রে পড়ন্ত বেলার ছাপ পড়েছে। পথে মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে।

মলিনা বললে—আপনি যাবেন।

—হ্যাঁ। আমি যাব। আমি যাব। তুমি এখন যাও মা। মুখ তোমার শুকিয়ে গেছে। স্নান করেছ কখন। আমি তোমায় আটকে রেখেছি। তোমার ঠিকানাটা আমায় বল তো।

—নং বলরাম ঘোষের স্ট্রীট। একটু গলির মধ্যে। জিজ্ঞাসা করবেন—অমল ভটচাজ যিনি পুরোহিতের কাজ করেন—তাঁর বাড়ী। বাড়ীর দোরে আমারই নাম ধরে ডাকবেন।

চলে গেল তারা।

মলিন দাঁড়িয়ে রইল। ওদের পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘাঙ্গী মলিনার খোলা চুলের রাশি তার পিঠের উপর দুলছে। বাঁকের মোড়ে তারা মিলিয়ে গেল, জনতার আড়ালে ঢাকা পড়ল। সে ফিরে এল।

আঃ! জীবনের সব বিষ তার অমৃত হয়ে গেল। জীবনের সব শূন্যতা আজ সঙ্গীতে পূর্ণ হয়ে গেল। কিছু ভাল না-লাগা আজ সব ভাল লাগায় পরিণত হল। সব যেন মধু হয়ে গেল। আকাশে মধু বাতাসে মধু ধুলাতে মধু! সব বহ্নিদাহ শান্তিজল হয়ে ঝরে পড়ছে—যেন বর্ষণ হচ্ছে; এই বৈশাখের রৌদ্রের মধ্যে সে তাই অনুভব করছে। তার জীবনের সকল গ্লানি—সকল কলঙ্ক সকল কালি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। মায়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার সময় চীৎকার করে ঘোষণা করেছে—তার স্বামী ব্রাহ্মণ—ভগবান রায়ের পৌত্র ঈশ্বর রায়ের পুত্র—গোত্র বন্দ্যঘাটী।

মলিনা বলে গেল—তার বাবা ব্রাহ্মণ। শিল্পী। দেবতার মত রূপ—দেবতার মত গুণী! জীবন আজ ভরে গেছে। মা পঙ্কজিনী আজ সকল কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেলে। পঙ্কজিনীর গর্ভে জন্মেছিল অপরিচয়ের অন্ধকার জগতে; সেখান থেকে কোথা আলো কোথা আলো ব'লে উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে সে সেদিন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ছায়া-মায়ার আকর্ষণে অন্ধকার রাত্রে মৃত্যুর বন্ধ দ্বারের সম্মুখে আছাড় খেয়ে পড়েছিল—এতদিন সেই দুয়ারে মাথা কুটেছে,—আজ সেই দ্বার খুলে কায়াময়ী লক্ষ্মী অমৃত ভাণ্ড হাতে আবির্ভূত হয়েছে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল এ কোন সুন্দর মধুর পৃথিবীতে?

আঃ! আর সে আত্মসম্বরণ করতে পারছে না। জীবন আজ চোখের জলে ভেসে যেতে চাচ্ছে!

কান্নায় এত সুখ! এত তৃপ্তি! এত শান্তি!

হে ভগবান! হে ঈশ্বর! হে পিতামহ! হে পিতা!

কাঁদতে কাঁদতেই সে উঠল—স্নান করবে সে গঙ্গায়। গঙ্গায় স্নান

করে মাটী নিয়ে আসবে। মহালক্ষ্মী প্রতিমা সে গড়বে। ছেলেবেলায় গাছে চ'ড়ে দেখা সে মূর্তি তার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। পুতুল নয়—প্রতিমা সে গড়বে এবার। এমন প্রতিমা গড়বে—যা কেউ কখনও দেখে নি।

মনে মনে পরিকল্পনা ফুটছে। উপবাস ক'রে থাকবে সে, শুচি হয়ে গড়বে মহালক্ষ্মীর প্রতিমা। যোগেশ পালের মত। কিন্তু যোগেশ পালের প্রতিমার নকল নয়। গড়বে সে নতুন করে। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত শতদল পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘাঙ্গী দেবী মূর্তি—ওই মেয়েটির মত আকার অবয়ব, ওরই মত মুখের আদল কিন্তু ও নয়, তাতে অপরূপ সুষমা—অপার্থিব! মাটীতে নাই, মনে আছে। যত রূপ তার মনে আছে।

সে রূপের সমুদ্র তার অন্তরে উথলে উথলে উঠেছে। জীবনের আকাশে আজ অমাবস্যার অবসান হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। ঝলমল করছে সব—ঝলমল করছে।

সেই প্রতিমা নিয়ে সে যাবে—বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের সেই গলিতে। অমল হয়তো থাকবে। তাকে চিনবে; চিনুক। সে কাউকে কোন উত্তর না দিয়ে ডাকবে—মলিনা—মা! মাগো!

এখন শুধু সে কাঁদবে। হে ভগবান! হে ঈশ্বর! হে পিতামহ! হে পিতা!